জীবন স্বপ্ন

গজেন্দ্রকুমার মিত্র

প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

নূতন সংস্করণ
আষাঢ়, ১৩৫৭

প্রকাশক :
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশ ভবন
১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

মুদ্রক :
শ্রীগৌরহরি মাইতি
বাণী-মুদ্রণ
৯এ, মনমোহন বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ :
শ্রীঅজিত গুপ্ত

মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ প.

উৎসর্গ

পরম পূজনীয়

কবিশেখর শ্রীকালিদাস রায়ের

করকমলে—

এই লেখকের—

ভাড়াটে বাড়ী
মনে ছিল আশা
স্ত্রিয়াশ্চরিত্রম্
রাত্রির তপস্যা
কলকাতার কাছেই
উপকণ্ঠে
পৌষ ফাগুনের পালা
জ্যোতিষী
কঠিন মায়া
কেতকী-বন
সোহাগপুরা
নারী ও নিয়তি
জন্মেছি এই দেশে
দু'টি
রাত্রির সীমানা
সমারোহ
জায়া নয়, দয়িতা
রক্তকমল
আবছায়া
কোলাহল
স্মরণীয় দিন
নববধূ
মালাচন্দন
প্রেরণা
মিলনান্ত
পুরুষ ও রমণী
রজনীগন্ধা
প্রভাত-সূর্য
বহ্নিবন্যা
আল্পনা লিপি
দহন ও দীপ্তি
তিন সঙ্গিনী
নবজন্ম
দেহ দেউল
সুপ্তিসাগর
বাহির-বিশ্ব
পৃথিবীর ইতিহাস

কৈফিয়ৎ

বছর কয়েক আগে 'কাছে আছে যারা' নামে আমার একটি উপন্যাস বেরোয়। প্রকাশিত হবার বেশ কিছুদিন পরে হঠাৎ বইটি রাজ-রোষে পড়ল, অশ্লীলতার অপরাধে পুলিশ বইগুলি আটক করলেন—লেখক ও প্রকাশককেও হাজির হতে হল তাঁদের দরবারে। অবশেষে—সম্ভবতঃ অশ্লীলতা করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল না এই বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে তাঁরা বইগুলি ছাড়লেন, প্রকাশক ও লেখককেও রেহাই দিলেন। কিন্তু একটি শর্ত ছিল তাঁদের—রচনার বহু স্থান বদলাতে হল। তাঁদের নির্দেশমত বদলাতে গিয়ে নিজেরও বহু স্থানে মাজা-ঘষা ও পুনর্লিখনের ইচ্ছা হল। বর্তমান গ্রন্থটি সেই ইচ্ছারই ফলাফল। রূপান্তরের সঙ্গে নামান্তরের ইচ্ছা হওয়াও স্বাভাবিক—সুতরাং নামটিরও বদল করে দিলাম। বিশেষতঃ বর্তমান নামটিই গ্রন্থের বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে বেশী উপযোগী হয়েছে বলে মনে করি। এই নাম-বদলে কোন অপরাধ হয়ে থাকলে পাঠকরা ক্ষমা করবেন। ইতি—

গ্রন্থকার

রেল লাইন পেরিয়ে রায়পাড়ার বড় চওড়া রাস্তাটা ধরে চলতে প্রথমই যে ছুটো ষোল ফুট রাস্তা ডাইনে বাঁয়ে বেরিয়ে গেছে, তারই বাঁ দিকেরটা হ'ল বাঁড়ুয্যে পাড়ার গলি। আর এ গলির যেটুকু বৈচিত্র্য তা ঐ মোড়ের মাথাতেই। ও রাস্তায় পড়েই ডান দিকে দেখা যাবে পর পর বাঁড়ুয্যেদের তিনখানি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী—সেকালের ভাষায় যাকে বলে প্রাসাদোপম অট্টালিকা, আব তারই ঠিক উল্‌টো দিকে তেমনি বিরাট তিনটি তেঁতুল গাছ ও দুটি বাঁশঝাড়ের মধ্যে জরাজীর্ণ হেলে পড়া কয়েকটি চালা ঘরের ছোট্ট একটি বস্তি। এ জমিটা ঘোষেদের, এখানে এখন যা জমির দাম তাতে এই জমি বেচলে মোটা টাকা পেতেন তাঁরা—কিন্তু অন্য পথে তাঁদের লক্ষ্মীর আনাগোনা অব্যাহত, তাই জমি বেচবার কথা মনেও পড়ে না। কেউ কেউ বলে যে আসলে এটা ঐ বাঁড়ুয্যেদেব তিনতলা বাড়ীগুলোকে দমিয়ে রাখবার ফন্দী। নইলে এই বাঁশঝাড় আর তেঁতুল গাছ কেটে ফল-ফুলের বাগান ব বেশ! অন্তত। কিন্তু লোকে ত কত কীই বলে। দু হুই

সে যা-ই হোক, ঐ তিনটি তেঁতুল গাছ আজও অক্ষয় হয়ে আছে, সেটাই বড় কথা। আছে শুধু নয়—শাখাপ্রশাখায় নিত্য বর্ধিত হচ্ছে। আর সেই সঙ্গে তার প্রশ্রয়-লালিত অন্ধকারও বাড়ছে দিন দিন। বাঁশ আব তেঁতুলের সেই বিপুল ছায়া তার ঠাণ্ডা স্যাঁৎসেঁতে হাওয়া প্রসারিত কবেছে বাঁড়ুয্যেদের তিনতলা বাড়ীগুলোর মধ্যে পর্যন্ত। ওদের নিচের তলাগুলোর ত কথাই নেই, বেলা চারটে না বাজতেই রাত ঘনিয়ে আসে সেখানে—তেতলাতেও আজকাল সে অন্ধকার তার হাত বাড়িয়েছে। এই দিকটাই পশ্চিম। পড়ন্ত রোদ ওদের কাছে গল্প-কথা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

পথের ও পারেই যদি এই অবস্থা হয় ত এই অন্ধকারের খাস তালুকের প্রজা যারা, এই চালাঘরগুলোর অধিবাসীদের অবস্থাটা অনুমান করুন। দিনের আলো কখনই স্পষ্ট হয়ে ফোটেনা এদের ঘরে—রোদ পেতে গেলে ঘরের বাইরে আসতে হয়। তাও মেলে কদাচিৎ, সারাদিনের একটি

বিশেষ সময় অল্প কিছুক্ষণের জন্য হয়ত তেঁতুলের ঝিলিমিলি পাতার ফাঁক দিয়ে, বাতাসে আন্দোলিত বাঁশঝাড়ের মাথা পেরিয়ে আসে সেই ভাঙ্গা রোদ। তার ফলে ঘরগুলো বারোমাসই স্যাঁৎস্যাঁৎ করে, শীতে অসহ্য ঠাণ্ডা, গরমে অসহ গুমোট। চৈত্রের উদ্দাম বাতাস স-রবে বাঁশবন আন্দোলিত করতে থাকে যখন, ঘরে বসে ঘামতে ঘামতে তার শব্দটুকু মাত্র পায় এরা। বাতাস নামে না এদের কাছে—কখনই নামে না। আলো বাতাস রোদ—ভগবানের দেওয়া এই তিনটি জিনিস যা আজও মানুষকে দাম দিয়ে কিনতে হয় না, সরকার যার ওপর আজও খাজনা বসাতে পারেনি—সেই তিনটি জিনিসও আস্বাদ করতে গেলে এদের ঘর ছেড়ে, ঘোষেদের সীমানা পেরিয়ে, গলির মোড় পার হয়ে একেবারে রায়পাড়ার বড় চওড়া রাস্তাটায় এসে উঠতে হয়। গলির মোড়েও আলো ঢোকে সসঙ্কোচে, দ্বিপ্রহরের নিস্তব্ধ অবসরে। কারণ পুবে বাঁড়ুয্যেদের তিনতলা প্রাসাদ, পশ্চিমে ঘোষেদের বাঁশ-ঝাড়। বাঁড়ুয্যেরা কোন প্রতিকার করতে পারেন না—আপসোস করেন 'র গজরান আর দাঁতে দাঁত ঘষেন; এই কালেও কলকাতার উপকণ্ঠে 'নি জমি যে মানুষ এমনভাবে ফেলে রাখতে পারে—তারা শুধু মূর্খ নয়, । চৌরঙ্গী থেকে মাত্র চার মাইলের মধ্যে এমন জঙ্গল আছে—তা চোখে 'খও বিশ্বাস করা শক্ত।

এরা রাগ করেন, আপসোস করেন, গজরান। কিন্তু যে ক'টি প্রাণী ঘোষেদের প্রজা হয়ে ঐ চালাঘরে বাস করে—তারা কিছু বলে না। একটি কথাও না। এসব কথা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। কারণ তারা জানে যে তারা নিরুপায়। তাদের যা আয় তাতে এর চেয়ে ভাল আশ্রয় পাওয়া সম্ভব নয়। এর চেয়ে আলো বাতাস রোদের অধিকার দাবি করার কথা তাদের কল্পনার অতীত। আর এতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে তারা। এরই মধ্যে তাদের প্রাত্যহিক জীবন সহজভাবেই বয়ে যায়। ঐ আলোতেই আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চুল বাঁধে চাঁপা—কানাইয়ের স্ত্রী চাঁপা। সামনের তেতলা বাড়ীগুলোতেও যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে—তখনও এই ঘরে দাঁড়িয়ে বিনা আলোতেই প্রসাধন করে সে। যেমন আজও করছে।

চাঁপা ওর দিকে পেছন ফিরেই আছে অবশ্য, তবু কানুর কোন অসুবিধা হয় না। চাঁপার প্রতিটি ভঙ্গী ও চেনে—হাত পা নাড়ার সব ক-টি রেখাই

ওর পরিচিত। ও-পাশের চেরা-বাঁশের কুলুঙ্গীতে রাখা টিনের কৌটোটা থেকে সস্তা দামের পাউডার নিয়ে সে মুখে বুলোচ্ছে, অভ্যস্ত দ্রুত হস্তে, ওর কাছ থেকে গোপন রাখার প্রাণপণ চেষ্টায়। এই পাউডারটা কিনেছে সে এই মাত্র সেদিন, ঠেলাগাড়ী ক'রে যারা বেচ্‌তে আসে—"যা লেবে লাও পাঁচ আনা!" —তাদের কাছ থেকে। কাগজের প্যাকেটে ছিল, চাঁপা একটা বার্লির ছোট কৌটোতে ঢেলে রেখেছে।

এই পাউডারটা মাখলে ওকে যে কী বীভৎস দেখায়, তা ও একটুও বুঝতে পারে না, আশ্চর্য! এমনি ওর যা চেহারা তা কালো রঙের সঙ্গে একরকম চলে, কিন্তু পাউডারের ছাব্‌ড়া ছাব্‌ড়া দাগে সাদা-কালোয় বিশ্রী দেখায়। ওর জন্যেই কষ্ট হয় কানুর। অথচ চাঁপাকে সে কথা বোঝাতে পারে না কিছুতেই. চাঁপার বিশ্বাস জোরে জোরে ছোব্‌ড়া দিয়ে সা[জগা]য়ে মুখে একটু পাউডার বুলোলে ওকে সুন্দরই দেখায়! এ শুধু আজ নয়, -দখে। যখন কানু সুস্থ ছিল, যখন সে প্রচুর টাকা রোজগার করত. তখনও—. ওদে হ'ত ওদের। চাঁপার বিশ্বাস পয়সা খরচ ক'রে পাউডার কিনে দিতে -দ্য বলেই কানুর আপত্তি। আবার এক এক সময় অনুযোগও করত, 'তুমি আমাকে দেখতে পারো না তাই, যাকে সোন্দর ছ্যাখ, তার সবই সোন্দর। বেশ, বেশ! আমি না হয় কুচ্ছিত আছি, কুচ্ছিতই থাকব। পাউডারে বেশি কুচ্ছিত হই হবো, আমার মুখ কাউকে দেখতে হবে না। দেখো না, চোখ বুজে থেকো!'

কানু যে কোন উত্তর দিত তা নয়, উত্তরটা মনে মনে কল্পনা ক'রে নিয়েই চাঁপা পর পর প্রত্যুত্তরগুলো দিয়ে যেত।

চাঁপা খুব দ্রুত হাতে কাজ সেরে, আব্‌ছা অন্ধকারে আন্দাজে আন্দাজে চুলটা ঠিক ক'রে নিলে, তারপর মাথার কাপড়টা একটু টেনে ও পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাবার উপক্রম করতেই কানু ব'লে উঠল, 'এত সন্ধ্যেয় আবার কোথায় যাওয়া হচ্ছে, তাই শুনি!'

বার বার প্রতিজ্ঞা করেছে সে ইতিপূর্বে যে, এ সব আলোচনা আর করবে না। আজও করেছে। বার বারই করেছে। কিন্তু তবু সে আর থাকতে পারলে না। অসহ্য ক্রোধে ওর কপালের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে, দুটো রগের কাছে দপ্‌দপ্‌ করছে। অসহায়, নিষ্ফল বলেই বোধ হয় রাগটা এত অসহ্য, এত কষ্টকর।

চাঁপা অস্ফুট কণ্ঠে কি একটা গালাগাল দিয়ে উঠ্‌ল। তারপর দোরের কাছে দাঁড়িয়ে বেশ প্রশান্ত কণ্ঠেই উত্তর দিলে, 'কাজ আছে।'

'কাজ ত সারা হয়ে গেল—আবার কি কাজ ?

এবার যেন বোমার মতো ফেটে পড়ল চাঁপা। চাপা অথচ হিংস্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'কী কাজ তা জান না ? গ্যাকা ! কাল রেশন নেবার দিন, সে টাকা আসবে কোথা থেকে ? মাইনে যা পেয়েছিলুম তা ত দশ দিনেই শেষ হয়ে গেছে ; কিসে কত লাগে তার হিসেব রাখো না ? কাপড় একখানা না হলেই নয়—বাইরে বেরোতে হয় এখন, লজ্জাসরম রাখি কি ক'রে ?···যাচ্ছি কি আমি শখ ক'রে—না বাইরে গিয়ে হাত পাততে ভাল লাগে ! দুবেলা নিজেই বা গিলবে কি যদি না বেরোই ? ··বলে ভাত দেবার ভাতার নয় নাক কাটবার গোঁসাই ! নিজে ত কি করতে কী ক'রে চিরকালের মতো ঘরে এসে বসলে—তা না অফিস থেকে একটা টাকা—না অন্য কোন রোজগারের বন্দো ! আবার বাক্যি দেখ না ! রাতদিন ড্যাব ড্যাব ক'রে চেয়ে থাকবে,' ওর কি করছি আর কোথায় যাচ্ছি—তার সতেরো রকম কৈফিয়ৎ !

আরও বহুক্ষণ গজগজ করে চাঁপা, যেন তার এতদিনকার সমস্ত আক্রোশ মিটিয়ে নিতে চায়, তারপর মাথার কাপড়টা আর একবার টেনে দিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

কানু জানে ও কোথায় যাচ্ছে।

এই বাঁড়ুয্যেপাড়ার শেষ প্রান্তেই রমণীবাবু থাকেন। ভদ্রলোকের স্ত্রী মারা গেছেন বহুকাল, বিয়ে-থা আর করেন নি। ছেলে ছিল একটি, বারো-মাসই তাকে বোর্ডিং-এ ফেলে রেখেছেন। নিজে রান্না ক'রে খান আর অফিস করেন। বেশ মোটা মাইনে। ইচ্ছে করলে অন্য কোন স্থায়ী ব্যবস্থাও করতে পারতেন কিন্তু সেদিকে ঝোঁক নেই। এমনি বন্ধুবান্ধবের সঙ্গেও বিশেষ মেশেন না। স্থানীয় বস্তিতেই তাঁর যাতায়াত বেশি। সেখানকার বাসিন্দা ঝি-চাকরদের প্রায়ই তিনি প্রয়োজনের সময় অর্থ সাহায্য ক'রে থাকেন। সেই ইতিহাস অনেকেরই জানা আছে, তাঁর করুণা উদ্রেক করাটাও নাকি খুব কঠিন নয়।

চাঁপাও ওঁর সেই দয়া পেয়ে থাকে, মধ্যে মধ্যে। বহু দুঃখেই চাঁপাকে ওঁর কাছে হাত পাততে হয় তা কানু জানে ! সেই জন্যই অন্য সময় যখন মাথা ঠাণ্ডা থাকে তখন বার বার সঙ্কল্প করে যে আর কখনও এ নিয়ে ওকে কিছু বলবে না। এ অর্থ সাহায্যের ঋণ কিসে শোধ হয় তা কানু অনুমান করতেও সাহস করে না; সামান্য সন্দেহের ইঙ্গিতেও যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে। তবে সন্দেহ থেকে অব্যাহতি পাবারই বা উপায় কি ? চাঁপা রমণীবাবুর কাছে যেদিনই যায়—সন্ধ্যার পর। অবশ্য মুখে বলে যে, 'সময় কখন আর আমার ?

দু-বাড়ীর কাজ করব, তোমার কুঁড়ে-পাথরের ব্যবস্থা করব, নাওয়াবো, ধোওয়াবো—তাতেই ত দিন কাবার। মানুষের কাছে গিয়েই ত শুধু আর হাত পেতে টাকা নেওয়া যায় না, অফিস থেকে এসে লোকটা একা বসে রান্না করে—একটু হাতে হাতে যোগাড় ক'রে দিই, নইলে চলবে কেন? এক একদিন রান্নাও ক'রে দিই, তাতে খুশী হয়।'

কিন্তু যখনই ওঁর কাছে সে যায় তখনই একটু বিশেষ প্রসাধন করে চাঁপা। তা ছাড়া ওর এতদিনের জীবন—জীবন সম্বন্ধে যা শিখিয়েছে, তাতে ক'রে কোন পুরুষ কোন স্ত্রীলোককে নিঃস্বার্থভাবে অর্থ সাহায্য করে, এটা বিশ্বাস করা কঠিন বৈকি!

অথচ কীই-বা বলবার আছে তার? সে পঙ্গু, সে অসহায়—একটা পয়সাও রোজগার করতে পারে না। চাঁপা শুধু যে তাকে রোজগার ক'রে খাওয়ায় তা নয়, আবার সারা দিনরাতের সমস্ত প্রয়োজনেও দেখে। সে যদি ওকে ছেড়ে চলে যায় তাহ'লেই ব৷ কি বলবার আছে কানুর? ওদের ঘরে এমন ঘটনা বিরলও নয়। বিশেষ ক'রে কানু ওকে কোনদিনই ভালবাসতে পারে নি, ওদের দুজনের মনের মিল চিরকাল দুজনের কাছে দুরাশাই রয়ে গেল। বেচারী না পেয়েছে কোনদিন দুটো মিষ্টি কথা—না পেয়েছে ইহকালের এমন কোন সুখ স্বাচ্ছন্দ্য!

আর আজ?

আজ ত আর কোন প্রত্যাশাই নেই ওর কাছে। পা দুটো কাটা গেছে হাঁটুরও ওপর থেকে, শির-দাঁড়ায় এমন আঘাত লেগেছে যে বসতেও পারে না বেশীক্ষণ, নইলে না হয় বিড়ি পাকিয়েও দু পয়সা রোজগার করতে পারত। সে কাজ একেবারে ওর অজানাও নয়। এককালে করেছে। কিন্তু বসতেই পারে না যে!

চাঁপা, তাকে সে যেমন চোখেই দেখুক, তার স্ত্রী। তার স্ত্রীকে সে কোন দিন অপরের বাড়ী বাসন-মাজার কাজ করতে দেবে এ চিন্তাও ছিল একদিন অসহ্য। কিন্তু আজ তাই করতে হচ্ছে। দুবাড়ী কাজ করে সে, এক জায়গায় আট টাকা আর এক জায়গায় সাত টাকা মাইনে। কানুর সেবাযত্ন ক'রে রান্না-বান্না সেরে এর চেয়ে বেশী কাজ আর করা সম্ভব নয়। অথচ এই পনেরো টাকায় কীই বা হয়? হপ্তার রেশনই লাগে ওদের তিনটাকার ওপর। তা ছাড়াও ত খরচ আছে রকমারি। নুন তেল মশলা, কাঠ, কয়লা, চা, চিনি, কাপড়, জামা আরও কত কি; ঘরটা প্রায় পড়ে যেতে বসেছে, তাও

সারানো হচ্ছে না—খাজনা বাকি প্রায় দু বছরের। ঘোষ বাবুরা শুধু অনুগ্রহ ক'রেই উচ্ছেদের নালিশ করেন নি! এক্ষেত্রে যদি বাঁচবার জন্য, আর বিশেষ ক'রে স্বামীকেই বাঁচাবার জন্য চাঁপা আজ কোন খারাপ কাজই ক'রে বসে ত তার বরং কৃতজ্ঞ থাকাই উচিত। রাগ করার কোন অধিকার নেই অন্তত, এটা ঠিক!

বাইরের বড় রাস্তাতেও সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল। খোলা দোরটা দিয়ে রাস্তার আলোর আভাস এসে পড়েছে। দিনের চেয়ে রাত ভাল—এ হিসেবে। পথের আলোটা আড়াল করতে পারে না মাথার গাছগুলো।……দূরে বড়রাস্তা দিয়ে একপাল ছেলেমেয়ে হৈ-হৈ ক'রে চলে গেল। কোথায় কারা যেন ঝগড়া করছে—তারই একটা একটানা শব্দ। শাঁখ বাজার আওয়াজ থেমে গেছে অনেকক্ষণ। তাদের পিছনের বস্তিও ঘরে-ফিরে-আসা শ্রমিকদের কোলাহলে আবার মুখর হয়ে উঠেছে।

তার ঘরে আর সন্ধ্যার আলো জ্বলে না কোনদিনই।

তেলের পয়সা নেই অত। শুধু রান্না আর খাওয়ার জন্য তেলের লম্পটা জ্বলে কিছুক্ষণ। তার পর সমস্তক্ষণ এমনি অন্ধকার আর এমনি অসহায় ও আশাহীন প্রতীক্ষা।

কিসের প্রতীক্ষা তা কানু জানে না। জীবনে আর কোন আশা ওর নেই মৃত্যু ছাড়া। তবু যেন কিসের জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। ওর সমস্ত সজাগ ইন্দ্রিয় যেন দিনরাত কিসের একটা অপেক্ষা করে। সেই অপেক্ষাই যেন ওর জীবন। অন্যমনস্ক মন শুধু কোন্ দূরের পথে কান পেতে থাকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। অথচ ও ভাবেও না কিছু, ভাবা ছেড়ে দিয়েছে। কিছুর জন্য যে অপেক্ষা করছে ও—তাও জানে না।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে হাতের উল্টো পিঠে কপালের ঘাম মুছে কানু অতিকষ্টে উঠে বসল। হাতড়ে হাতড়ে বিছানার নিচে থেকে সাঁড়াশিটা বার করল, ভাল মজবুত ইস্পাতের সাঁড়াশি। এটার অনেক মূল্য। এর জন্যই তার পা দুটো গেছে এবং এর জন্যই কোন ক্ষতিপূরণ পায় নি। তবু এটা তার বড় প্রিয়।

মন যখন একেবারে ভেঙে পড়ে, যখন হতাশা আর তিক্ততায় একেবারে ভরে ওঠে, তখনই একবার ক'রে এটা ও বার ক'রে দেখে।

ললিতা বৌদিকে এটা পৌছে দেওয়া গেলনা কিছুতেই। আর কোনদিনই এটা তাঁকে পাঠানো সম্ভব হবে না। এটার পেছনে এত ইতিহাস পুঞ্জীভূত হয়ে উঠেছে যে, আজ এটা ললিতা বৌদির কাছে পৌছতে গেলে সমস্ত ঘটনাটার একটা কুৎসিত কদর্থ হয়ে যাবে—সে গ্লানি, সে পাক হয়ত কিছুটা ললিতাকেও লাগবে।

না, না কাজ নেই তাতে। কানু শিউরে উঠে ভাবে মনে মনে। তার অদৃষ্টে যা ছিল তা ত হয়েছেই—তাঁর যেন কোন আঘাত না লাগে। কো বাদ বিড়ম্বনা না তাঁর জীবনকে দুর্বহ ক'রে তোলে। .ন থাকা

সস্নেহে সযত্নে হাত বুলোয় কানু সাঁড়াশিটায়। বুকে চেপে ধরে পর ওর এক বার। এটার প্রতি তার সবচেয়ে ঘৃণা হবার কথা, কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তা হয় না। দিনরাত্রি বিছানার নিচে সে রেখে দেয় এটাকে। চাঁপার সহস্র গঞ্জনাতেও সে এটা কাছ-ছাড়া করতে রাজি হয় নি।

এমনি ক'রে অন্ধকার গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে ওঠে। মাটির ওপর ছেঁড়া চ্যাটাইয়ে সামান্য বিছানা স্যাঁৎ স্যাঁৎ করে। বর্ষায় চারিদিক ভিজে উঠেছে, বিছানার উপর দিয়ে অসংখ্য ব্যাঙ্, কেঁচো কেন্নুই চলে বেড়াচ্ছে অনবরত—অথচ উপায়ই বা কি?

তক্তাপোশ একটা আছে কিন্তু তার ওপর শুলে চলে না। কে ওকে নাড়া-চাড়া করে দিনরাত? চাঁপার কাজ নয় তাকে ওঠানো বা নামানো। এইখানেই ওকে পড়ে থাকতে হয় তাই। সাপ বা বিছে আজও যে কেন ওকে কামড়ায়নি সেই ভেবেই কানুর অবাক্ লাগে! অবশ্য অবাকই লাগে শুধু, ভয় নেই ওর একটুও। মরতে ওর ভয় করে না, কোন দৈহিক কষ্টেও না। এ জীবন শেষ ক'রে দিন ভগবান, ওই শুধু ওর কামনা।

মালিকদের দোষেই ওর পা-দুটো গেল, অথচ কারখানার মালিকদের কাছ থেকে কোন ক্ষতিপূরণ পেলে না। তাঁরা প্রমাণ ক'রে দিলেন যে চুরি করতে গিয়েই ওর পা গেছে—এ ক্ষতির জন্য তাঁরা দায়ী হতে পারেন না। শুধু তাই নয়, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডের টাকাটাও পুরো পেলে না সে, দয়া ক'রে শুধু তার জমানো টাকাটাই ফেরৎ দিয়েছিলেন তাঁরা: ওর কাজের সময় পেরিয়ে যাবারও আধ-ঘণ্টা পরে দুর্ঘটনা হয়েছে। এতক্ষণ সে কারখানার মধ্যে থাকে কেন? মন্দ মতলব যে ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল ঐ সাঁড়াশিটা থেকে।

সত্যিই ত, ছুটির আধঘণ্টা পরে পর্যন্ত ও কারখানার মধ্যে থাকে কেন?

কীই বা বলবার আছে ওর, কাকেই বা বলবে।

একথা ওর কাউকে বলার নয়, চিরকাল মনেই থাকবে শুধু। ওর কেবল ভয় হয় কোনদিন প্রলাপের ঘোরে না বলে ফেলে।

চুরি ও করেছিল ঠিকই, এই সামান্য একটু ইস্পাত, কারখানায় প্রত্যহ যা চুরি ও নষ্ট হয়, তার কয়েকশ' ভাগের একভাগ মাত্র। এটুকু ক্ষতি কিছুই না কোম্পানীর।

তবু, এ কথাটা সে কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারল না যে কেন সে এটা নিতে চেয়েছিল, সামান্য একটা সাঁড়াশি, বাজারে যার আজও তিন-চার আনার বেশি দাম নয়!

আলোচাপাও তাকে বহুদিন প্রশ্ন করেছে, 'এ কী দুর্মতি হ'ল তোমার? আমি ত সাঁড়াশি চাইনি কোন দিন তোমার কাছে?'

এ সাঁড়াশি যে কেন সে তৈরি করছিল, কার জন্য—সে কথা আর কোনদিনই কেউ জানতে পারবে না। ওর অন্তরের মণিকোঠার মণি হ'ল এই সত্যটি, ওর দেহের সঙ্গেই একদিন চিতার আগুনে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে যাবে। কেউ জানতে পারবে না আর।

কোনদিনই না।

২

তবু এর একটা ইতিহাস আছে বৈকি!

কিন্তু তার আগে বোধ হয় কানুর কথাও কিছু বলা দরকার।

অধিকাংশ মানুষের জীবনেই এমন কতকগুলি ফলবান্ মুহূর্ত আসে যার স্মৃতি তার সারা জীবনটাকে আশা ভরসার রসদ জুগিয়ে যায়; বিপদে আপদে যে মুহূর্তগুলিকে সে আঁকড়ে ধরতে পারে। কিন্তু এমন মানুষও ঢের আছে যাদের জীবনে তেমন মুহূর্ত একটাও আসে না! তাদের জীবনের অর্থ না তাদের কাছে, না অপরের কাছে—কোথাও নেই। তারা কেন জন্মেছে, কেন বড় হয়েছে, কেনই বা সমাজের খানিকটা খাদ্য ও স্থান জোড়া ক'রে ছিল এতদিন, তা যেমন আর পাঁচ জনেরও জানা নেই, তেমনি তাদেরও না। অদৃষ্টদেবতার মূঢ় ভারবাহী পশু তারা—অদৃষ্টকে ধিক্কার দিতে বা তাঁকে দায়ী করতেও পারে না, শুধু বিহ্বল দৃষ্টিতে তাদের জীবনের গণ্ডীর বাইরেকার বিপুল জগৎটার দিকে তাকিয়ে থাকে আর নিজেদের জীবনের অর্থহীনতাকে মেনে নেয়। তাদের অকিঞ্চিৎকরতার জন্য কাউকেই তারা দায়ী করে না—

এমন কি ভগবানকেও না। বিলাপ হয়ত করে মধ্যে মধ্যে, কিন্তু সে আরও তুচ্ছ কারণে, জীবনের গভীরতর ব্যর্থতার জন্য নয়।

কানাই এই শ্রেণীরই জীব। ওর এই অন্ধকার, স্যাঁৎসেঁতে, প্রায়-রাস্তার-সঙ্গে-মিশে-থাকা ঘরের মেঝেতে ছেঁড়া মাদুরের ওপর শুয়ে এমনি ক'রেই বিহ্বল দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে, বাইরের বিপুল জীবন-স্রোতের দিকে। এই জীবনপ্রবাহের মধ্যে শুধু যেন তারই কোন স্থান নেই। আর বাকি সকলকার সুখ-দুঃখের ঘাত-প্রতিঘাতে চঞ্চল যে জীবন তা তাকে বাদ দিয়েই চিরকাল চলেছে, আজও অনায়াসে চলছে। এর মধ্যে ওর স্থান থাকা উচিত ছিল কিনা তা' কানাই-এর জানা নেই। সমাজের ওপর ওর কোনো দাবি আছে বা ওর মত লোকের কোন দাবি থাকা সম্ভব, তা যেন ভাবতেও পারে না। নিজের অবস্থাকে ও প্রথম থেকেই মেনে নিয়েছে, কারণ এর যে কোন প্রতিবাদ করা যায় তা-ই বা ও কেমন ক'রে জানবে? দুঃখ পেয়েছে কিন্তু আশা-ভঙ্গের বেদনা কোন দিন অনুভব করেনি। কারণ আশা ওর ছিলই না। ওর এবং পৃথিবীর বাকি মানুষগুলোর জীবনে যে একটা বড় তফাৎ আছে তা প্রথম থেকেই সহজে মেনে নিয়ে ও নিশ্চিন্ত হয়েছে। প্রতিবাদ করতে শেখেনি কোন দিন, কাউকে ধিক্কার দিতেও শেখেনি। মনে মনেও না। ভগবানকে ত নয়ই। জীবনের এই বিচিত্রতার মধ্যে, আনন্দ-সমারোহের মধ্যে ওর কোন স্থান নেই, স্থান থাকা সম্ভব নয়—এইটেই স্বাভাবিক,—এইটেই উচিত। ও বঞ্চিত, তা হোক্—কোন ঈর্ষা নেই তার জন্য। নিখিলের আনন্দ-যজ্ঞে ওর যে নিমন্ত্রণ এলো না কোনদিনই, এ অভাব-বোধটা পর্যন্ত ওর নেই।

সেটা থাকতে পারত যদি তেমন একটি দিনেরও স্মৃতি ওর থাকত। ওর জীবনের যে ক-টি বৎসর ধরে কালের একটা বিশেষ অংশ চিহ্নিত হয়ে আছে—তার মধ্যে এমন একটি দিনও ওর নেই।

অন্তত ওর জ্ঞান বা অনুভূতির মধ্যে ত নেই-ই।

ওর বাবা নাকি চাষী-গৃহস্থ ছিল—সেটা শোনা কথা; অস্পষ্ট মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যেন কার মুখে শুনেছে। ও জ্ঞান হয়ে দেখেছিল ওর মাকে ঝি-গিরি করতে। কুন্তী ঝি পাঁচটা বাড়ী ঠিকে-ঝিয়ের কাজ করত, অর্থাৎ পাঁচ বাড়ীর জল তুলে, বাটনা বেটে, ঘর মুছে, বাসন মেজে, মাছ কুটে, উনান ধরিয়ে পেত মোট বারোটি টাকা। তাতে একখানা ঘরের বারো আনা ভাড়া দিয়ে দুই মায়েপোয়ের কোন মতে গ্রাসাচ্ছাদনই চলত, তার বেশি কিছু

নয়। তবু কুন্তী ওর ছ বছর বয়স হ'তেই ওকে দেবেন মাষ্টারের পাঠশালা বল প্রাইমারী ইস্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছিল। নিজে না খেয়েও আট ত মাইনে যুগিয়ে যেত মাসে মাসেই—কিন্তু তখন কানাই আর পাঁচটা ছে. চাহ মেয়ের মতই লেখাপড়া শেখার কোন উপকারিতা বুঝতে পারেনি। সুতরাং ফাঁকি দেবার চেষ্টা করেছে যৎপরোনাস্তি, তার জন্য মার খেয়েও নিরস্ত হয়নি। কোনমতে বাংলা অক্ষর পরিচয়টার বাইরে ওর মা ওকে এক পা-ও নিয়ে যেতে পারেনি। এক বছর পরে হতাশ হয়ে ইস্কুল ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে সে। শুধু শুধু মাইনে গুনে লাভ কি?

এর পর দু-তিনটে বছর ওর কেটেছে হৈ-হৈ ক'রে, ডাং-গুলি খেলে, পরের গাছে পেয়ারা ও কাঁচা তেঁতুল চুরি ক'রে এবং মায়ের ওপর তম্বী ক'রে! বেচারী কুন্তী, একটি মাত্র ছেলে নিয়ে বিধবা হয়েছিল ব'লে কিছুতেই প্রাণে-ধরে ওকে শাসন করতে পারত না, আর কেউ শাসন করতে এলেও বিরক্ত হ'ত। ফলে দশ এগারো বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেকে সে বসিয়ে খাইয়েছে, কাপড়-জামা যুগিয়েছে এবং সহস্র আবদার অত্যাচার সয়েছে। কিন্তু তারপর আর পারলে না। পেটের মাপ বাড়ে, আয়টা বাড়ে না তদনুপাতে। অগত্যা আর একটা বাড়ীর কাজ নিয়ে শুরু করলে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যেতে, হাল্কা হাল্কা কাজগুলো ওকে দিয়ে করাত, ফাই-ফরমাশের কাজ। যাতে কায়িক পরিশ্রম বিশেষ নেই, অথচ সময়ের খরচা আছে। প্রথম প্রথম কানাই দস্তুরমত বিদ্রোহ করেছিল এর বিরুদ্ধে ছেলেমেয়েরা সাধারণত যেমন স্বার্থপর হয় কানাইও তেমনিই ছিল। মা রোজগার ক'রে এনে খাওয়াবে এবং সে বসে খাবে ও ঘুড়ি ওড়াবে—এইটেই যেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। তারপর বিস্তর কান্নাকাটি অভিযোগের পর, ক্রমে অবশ্যম্ভাবীকেই মেনে নিতে হ'ল। শান্তভাবে অথচ যতটা সম্ভব কাজ এড়াবার চেষ্টা ক'রে সে কাজের হুকুমগুলো তামিল করতে লাগল।

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ একদিন কুন্তী মারা গেল। একেবারে অতর্কিতভাবে!

জ্বর আসবার পর তিন দিন পর্যন্ত জ্বর নিয়েই সে কাজ ক'রে এসেছে এবং ওকে ভাত রেঁধে দিয়েছে। চার দিনের দিন আর উঠতে পারল না, বাড়ীউলীকে চারটি চাল ফুটিয়ে দিতে বললে কানাইয়ের জ । পাঁচদিনের দিন হঠাৎ কথা বন্ধ হয়ে গেল। তখন ওরা ভয় পেলে। কানাই পাড়ার হোমিওপাথিক ডাক্তার নালু মুখুজ্যের কাছে কান্নাকাটি ক'রে তাকে ডেকে

বস্তি, ছুটো তিনি দেখেই বললেন, 'শক্ত টাইপের নিমোনিয়া, ভাল ডাক্তার আবার রং-চটা এপর বস্তির লোকজনের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে টাকার যোগাড় চোপড়। ; ডাকতে গেল কানাই। সে আর এক বিভ্রাট, ডাক্তাররা কেউ কানাই ি চান না। যদি বা একজন এলেন শেষ পর্যন্ত, রোগীর অবস্থা দেখে আর ওষুধ দিতে চাইলেন না। পরের দিনই কুন্তী মারা গেল।

এ সব কথাগুলো ওর ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা মনে পড়ে আজ। অনেই ছবিই স্মৃতির খাতায় অস্পষ্ট হয়ে মুছে এসেছে। জীবনের পরবর্তী অধ্যায়ের ইতিহাস অতদিন আগের ইতিহাসকে যেন ধুয়ে মুছে একাকার ক'রে দিয়েছে।

তবু চেষ্টা ক'রে ক'রে কানাই মনে করে কথাগুলো।

অনেক কথা আর ঠিক মনে নেই—শুধু আব্‌ছা ধারণা আছে। অনেক ছবি সম্পূর্ণ অবাস্তব কল্পনার ওপর ভিত্তি ক'রে মনে চিরস্থায়ী রঙে আঁকা হয়ে গেছে। সে সব আজ আর যাচাই ক'রে দেখা সম্ভব নয়। যা আছে-মনে, ঠিক যেমন ভাবে আছে—তাই ওর কাছে আজ সত্য।

মা মারা যাওয়ার দুঃখটা খুব একান্তভাবে অনুভব করতে পারেনি কানাই। সংসার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কম থাকাটাই তার প্রধান কারণ। ঠিক কী ঘটল, কতখানি হারাল—এমন কি সত্যি-সত্যিই একেবারে হারাল কিনা—এ বোঝবার বয়স ওর নয়। এই প্রথম মৃত্যু দেখল—সেটাও একটা কারণ। মৃত্যু সম্বন্ধে এর আগে কোন ধারণা নেই, যার ওপর ভিত্তি ক'রে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের ছবিটা ভাবতে পারে। তাছাড়া, ঘটনাটা এত অতর্কিতে ঘটল যে ভাল ক'রে কিছু ভাববার অবসরও পেলে না।

আর, জীবন-সমস্যাটাই যে তখন ব হ'য়ে উঠেছে।

আহার এবং বাসস্থানের যে কোনদিন ওর অভাব হবে অথবা বর্তমানেই সে অভাবটা ওর সামনে এসে মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছে—এটা ও বুঝতে পারে না কিছুতেই। তবু আর তাকে অস্বীকার করা গেল না। দেশে কেউ নেই, এক জ্যাঠা আছে, ওদের কোন খোঁজ-খবর রাখত না সে কোনদিনই—আজও রাখতে রাজী হ'ল না। এ দায় নেয় কে? বিশেষ ক'রে সে-ই নাকি কানাইয়ের বাপের কিছু জমি ফাঁকি দিয়ে ভোগ করত সুতরাং ভবিষ্যতের কুমীরকে খাল কেটে নিয়ে যাওয়াটা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করলে না। সাপকে দুধকলা দিয়ে বড় করার প্রয়োজনটা কি?

মামা একজন ছিল বটে, তা সে নিজেই খেতে পায় না। আত্মীয়ের খবর জানা নেই—খোঁজ করবেই বা কে? সকলে পরের জন্য নষ্ট করার মত সময় কৈ তাদের?

ওর ঘর খুঁজে, মায়ের ভাঙ্গা তোরঙ্গ আর কাঁথার নিচে থেকে। সুতরাং ছিল মোট চল্লিশ-বিয়াল্লিশ টাকা। সেটা মড়া পোড়াতে আর শ্রাদ্ধ হ'তেই খরচ হয়ে গেল। বাড়ীউলীরই সবচেয়ে বিপদ—সে ফেলতে পারে না। কোথায় কার হাতে দেবে সে? অথচ তাড়িয়ে দিতেও চক্ষুলজ্জায় বাধে। এখন কেউ দায় ঘাড়ে নিতে না চাইলেও—তখন সবাই নিন্দা করবে।

তবু তাকেই দু-চার-দিন ঠাঁই দিতে হয়। ভাতও দুবেলা দিতে হয়। একটা মায়াও ওর ওপর পড়ে গিয়েছিল বৈকি! ঐ-ত দুধের ছেলে, কী-ই বা বয়স ওর, এতটুকু দেখেছে ওকে সে! এই ত সেদিনের কথা, যখন বাড়ীউলীর এ-ঘরে ওরা এসেছে, তখনও কানাই দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

বস্তির দুচার-জন হিতাকাঙ্ক্ষী পরামর্শ দেয়, 'ওর মায়ের কাজগুলো বজায় ক'রে দাও না!'

বাড়ীউলী মোক্ষদা বলে, 'পাগল! ঐ এক ফোঁটা ছেলে কখনও এতগুলো ঠিকে কাজ করতে পারে! তারপর খেটেখুটে এসে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বে, তখন ওকে ভাতজলই বা দেবে কে? ও কি আর রাঁধতে পারবে? আমিই বা কতদিন ওকে যোগাব? আমারও ত নিজের ঘর-কন্না আছে।'

তা বটে!...তবে? সবাই প্রশ্ন করে।

মোক্ষদা বলে, 'এমনি একটা রাতদিনের কাজ কোথাও দেখতে হবে, যেখানে কাজ কম, ভারী কাজ কিছু করতে হবে না, ফাই ফরমাশ খাটবে শুধু—এমন কাজ। দেখি, খুঁজছি ত!'

মোক্ষদার গরজ বেশী বলে খুঁজতে খুঁজতে সে একটা কাজ পেয়েও গেল: রায়-পাড়ার অম্বিকে চক্রবর্তীর বাড়ী. লোকজন খুব বেশী নয়—একটা ঠিকে ঝি-ও আছে। খাওয়া পরা একটাকা মাইনে দেবে, টিকে থাকলে আরও বেশী। এমন কাজ টপ্ ক'রে পাওয়া যায় না।

অগত্যা কানাইকে প্রস্তুত হ'তে হয়। আর এখানে বসে খাবার কোন অজুহাত নেই। খেটেই তাকে খেতে হবে যখন, তখন দেরি ক'রেই বা লাভ কি।

মোক্ষদা বলে, 'তোর জিনিসপত্তর গুলো কি হবে রে?'

জিনিস-পত্তর অর্থাৎ একটা ভাঙ্গা তোরঙ্গ, একটা কেরোসিন কাঠের

বাঁধি, দুটো-একটা থালা বাসন—তার মধ্যে পেতল-কাঁসাও আছে, আবার রং-চটা কলাইয়ের বাসনও আছে—আর এক-আধখানা কাপড়-চোপড়।

কানাই মিনতি ক'রে বলে, 'ওগুলো এখন যেমন ক'রে হোক রেখে দাও মাসী। আমি কোথা কোথা নিয়ে ঘুরব? কেমন মনিব তা জানি না, কতদিন টিক্‌ব তারও ঠিক নেই, মিছিমিছি—'

মোক্ষদা উদাসীনভাবে বলে, 'আচ্ছা। থাক্—তবে আমি বেঁচে থাকতে থাকতে নিয়ে যাস বাবা। এ আবার একটা দায়। মরে গেলে ছেলেমেয়েরা যদি গরমাস্থি যায়?'

৩

নতুন বাড়ীতে কাজে ঢুকে নতুন জীবন-যাত্রা শুরু হয় কানাইয়ের। বলতে গেলে ওর জীবন-যাত্রা এইখান থেকেই শুরু।

এইবার জগৎটার দিকে প্রথম ভাল ক'রে তাকায় ও, বোঝবার চেষ্টা করে। যেন একটা বিরাট সুপ্তি থেকে জেগে উঠে নিজের অস্তিত্ব আর পারিপার্শ্বিককে চেতনার মধ্যে আন্‌তে চায়।

অম্বিকাপদ চক্রবর্তী বা অম্বিকে চক্রবর্তীর সংসার সত্যিই ছোট। তিনি, তাঁর স্ত্রী, তিনটি ছেলে, দুটি মেয়ে, একটি পুত্রবধূ। এতদিন ঠিকে-ঝিয়েতেই চলত, সম্প্রতি অম্বিকে চক্রবর্তীর অফিসে একটা পদোন্নতি হওয়ায় মাইনে এসে দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড়শ'তে। তার ওপর ছেলেও টাকা চল্লিশ-পঞ্চাশ দিচ্ছে সংসারে—অর্থাৎ এবার তিনি একটা রাতদিনের লোক রাখবার বিলাস চরিতার্থ করতে পারেন।

কিন্তু পয়সা হ'লেও অম্বিকে চক্রবর্তী হিসেবী লোক। মাসখানেক দেখেই, অর্থাৎ কানাইকে একটু সইয়ে নিয়ে, ঠিকে-ঝিটিকে ছাড়িয়ে দিলেন। ঠিক সোজাসুজি ছাড়ালেন না—এমন খিটিমিটি শুরু করলেন যাতে সে-ই ছেড়ে চলে যায়।

অতঃপর কানাইয়ের ঘাড়েই পড়ল সব কাজ। জায়গাটা কলকাতা শহরের উপান্তে হ'লেও তখনও বাড়ী বাড়ী কল আসেনি। রাস্তার কল থেকে ফাঁক-মত দফায় দফায় জল তুলতে হয়। বাসন-মাজা, বাটনা-বাটা, বাজার করা, ঘর ঝাড়া-মোছা, মায় কাপড়-কাচা, কাপড় শুকোনো, বিছানা করা—সব কাজই একে একে ওর ওপর এসে পড়ল।

কানাই একে অনভিজ্ঞ, তায় মায়ের মৃত্যুর পর ও খুব শান্ত হয়ে পড়েছিল। প্রতিবাদ করতে পারত না, করতে ভয়ও করত। এটা ও বুঝেছিল যে, আশ্রয় আজ তার কোথাও নেই, একটা দিন কোথাও গিয়ে দাঁড়াবার মত জায়গাও নেই। সুতরাং নীরবে ও সব সহ্য করে, বীরের মত নিঃশব্দে সব কাজই করবার চেষ্টা করে। অবশ্য খুব যে সহ্য করছে ও—এটা বুঝতে পারত না, এই একটা সুবিধা; ওর ধারণা যে, এত কাজই করতে হয় সবাইকে, নইলে ওরা রাখবে কেন? শুধু মাঝে মাঝে খাটতে খাটতে যখন ওর হাতের পাল্‌কা দুটো অবশ হয়ে আসে, কোমরটা টন্‌ টন্‌ করতে থাকে, তখন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ও কিছুতেই চাপতে পারে না—আর কে জানে কেন, সেই সব সময় ওর মায়ের কথা মনে প'ড়ে চোখে জল এসে যায়।

অম্বিকাবাবুর স্ত্রী অবশ্য কাজ আদায় ক'রে নিতেও জানতেন! ভদ্রমহিলার মুখটি ছিল ভারি মিষ্টি। যখনই কোন কাজের ফরমাস করতেন তখনই বলতেন 'এটা ক'রে দিবি বাবা?' 'ওটা একটু কর্ না বাবা।' কিংবা—'হ্যা বাবা, অমুকটা করতে পারবি না?' এ ছাড়া নতুন হাফপ্যান্ট দিয়ে, চিরুণী কিনে দিয়ে, চান করবার সময় কাপড়-কাচা সাবান ব্যবহার করবার অনুমতি দিয়ে পাড়াতে খুব নামও কিনে নিয়েছিলেন। সবাই বলাবলি করত, 'আহা সাবিত্রী আমাদের চাকর আর ছেলেতে কিছু আলাদা ক'রে দেখে না।'

বেশী কাজেও কানাইয়ের আপত্তি ছিল না, সারাদিন ধরে খেটে খেটে সব কাজই সে ঠিক করে তুলে দিতে পারত—তার আপত্তি শুধু এ বাড়ীর মানুষগুলোয়। একমাত্র গিন্নীকে ছাড়া আর কাউকে ওর পছন্দ হ'ত না। গৃহিণীর মিষ্ট-কণ্ঠের মধ্যে কী আছে তা বোঝা ওর পক্ষে তখন সম্ভব নয়—ও তখন মিষ্টি কথাতেই খুশি; আসল খোদ মনিবকেই ওর একদম পছন্দ হ'ত না। কৃপণ স্বভাবের খিট্‌খিটে মানুষ, একটু যেন মেয়েলি স্বভাবেরও। ঘর-কন্নার খুঁটিনাটি সব কিছুর খবর তাঁর জানা চাই, তুচ্ছাতি-তুচ্ছ কাজের হিসাব নেবেন তিনি। সব ব্যাপারেই মাথা গলান আর খিট খিট করেন। এজন্য বাড়ীর লোকেরাও তাঁকে দেখতে পারত না, প্রকাশ্যেই বিদ্রোহ করত। কিন্তু চাকরের ত সে অধিকার নেই, ওকে সবই মেনে নিতে হ'ত চুপটি করে। এর ওপর আবার তাঁর ছিল সর্বদা কেমন একটা সন্দিগ্ধ ভাব, ওর ওপরে একটা নিঃশব্দ সতর্কতার দৃষ্টি রাখবার চেষ্টা। কানাই বড়

অস্বস্তি বোধ করত তাতে। কর্তা যতক্ষণ বাড়ী থাকতেন, ততক্ষণই কেবল ওর মনে হ'ত তাঁর সপিল সন্দেহটা সমস্ত সময় ওকে অনুসরণ করছে। তাঁর ভাব দেখে মনে হ'ত, সদাসর্বদা তিনি যেন একটা বিরাট সর্বনাশ থেকে সংসারকে আগলে নিয়ে বেড়াচ্ছেন।

ছেলে তিনটি ত তিন রত্ন। ছোট ছেলে সন্টু ইস্কুলে পড়ে—কানাইয়ের চেয়ে সামান্য কিছু বড় অথচ তার জুলুমটাই ছিল সব চেয়ে বেশি। সমবয়সী একটি ছেলের উপর নির্বিবাদে অত্যাচার চালাবার মধ্যে কোথায় একটা আত্মতৃপ্তি আছে, নিজের অকিঞ্চিৎকরতাটা কেমন ক'রে যেন ঢেকে যায় ওতে। নিজে সে ছোট, বাড়ীর সকল লোকই চিরকাল তার ওপর দিয়ে বেশী বয়সের সুবিধাটা নিয়েছে, সেই সমস্ত ফাই-ফরমাশ খাটার এবং সমস্ত শাসন মেনে নেওয়ার প্রতিশোধটা নিতে চায় সন্টু কানাইয়ের ওপর দিয়ে। মারধোর, খুনসুটি, অকারণ ফরমাশ, মিছে ক'রে বকুনি খাওয়ানো এসব এক-একদিন চরমে পৌছত যখন, তখন কানাই কেঁদে ফেল্‌ত। ওর সেই চোখের জলটা না দেখা পর্যন্ত সন্টুর যেন তৃপ্তি হ'ত না। কোন-কোন দিন তার মাথায় খুন চড়ে যেত—কানাইয়ের চোখের জল বেরোবার দেরি হ'লে নিষ্ঠুর হিসাবের সঙ্গে একটার পর একটা অত্যাচার চালিয়ে যেত, একটা আর-একটার চেয়ে বেশী কষ্টদায়ক। ক্রমেই মাত্রা বাড়ত—যতক্ষণ না ওর চোখে জল আসে।

মেজোছেলে বলাই সব চেয়ে অদ্ভুত জীব। সে কলেজে পড়ে কিন্তু কলেজের পড়াটা যেন তার অতিরিক্ত। ছাত্রাবস্থা তার অসহ্য বলে মনে হয়—অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেটাকে অর্থ উপার্জনের দায়িত্ব এড়াবার যন্ত্ররূপে সহ্য করে,—এই পর্যন্ত। খেলাধুলোতেও মন নেই। কেমন একটু ভেতরবুঁদে, যেন ঘরকুণো। ওর মা বলেন, বলাইয়ের মনের কথা যে টেনে বার করবে—সে এখনও জন্মায়নি।

বড় নিমাই রীতিমত শৌখীন ধরণের মানুষ। সে সংসারের কোন কাজে নেই, সকাল সাড়ে-আটটায় ঘুম থেকে উঠেই দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে অফিস যায়। সেই সময়টাতে তাকে সব জিনিস মুখে-মুখে জোগাতে হবে। স্টোভে চা ক'রে দিতে হ'ত কানাইকেই—এ ছাড়া দাড়ি কামাবার জল, আয়না সব গুছিয়ে দিতে হ'ত সেই মুহূর্তে। একটু এদিক ওদিক হ'লেই বকুনির অন্ত থাকত না। সুবিধার মধ্যে সে অফিস থেকে এসেই ক্লাবে চলে যেত, তার ঝঞ্ঝাটটা ছিল কম। তার বৌটি আবার যেমন অকর্মণ্য

তেমনি মিথ্যাবাদী। নিজের অকাজের বোঝা এমন অম্লানবদনে কানাইয়ের ঘাড়ে চাপিয়ে দিত যে, কানাই সময়ে সময়ে অবাক হয়ে গিয়ে প্রতিবাদ করতেও ভুলে যেত। অবশ্য প্রতিবাদ করলেও কোন কাজ হত যে—তা নয়।

মেয়ে দু'টির মধ্যে শচী বিবাহযোগ্যা—শান্ত, মিষ্ট মেয়েটি, একটু চাপা ধরণের; আর ছোট বুলু নিতান্তই ছোট, আদরে আর আবদারে এমন ভাবেই মানুষ হচ্ছে যে, তাকে সামলানো শক্ত। তবু এই দুটিই সব চেয়ে কম দুঃখের কারণ ছিল কানাইয়ের।

এরই মধ্যে, এবং এদের মধ্যে দিন কাটে। যখন খুব অসহ্য বোধ হয়, যখন কান্না থাকে না, শুধু মনে হয় নিঃশ্বাস-রোধ হয়ে আসছে—তখন ছুটে গিয়ে এক একবার বাইরে দাঁড়ায়। বাইরের হাওয়ায়, ফাঁকা জায়গার প্রসারতায় যেন একটা সান্ত্বনা পায় কানাই। ওর মধ্যে কোন কবি-প্রকৃতি নেই, সে সম্বন্ধে ওর কোন সজাগ চেতনাও নেই, তবু শহরতলীর সামান্য দু-একটা গাছপালার সবুজ সৌন্দর্যে, অম্বিকাবাবুর বাড়ীর খিড়কীর স্বল্পায়তন পুকুরটায়, আর তার চারিদিককার নারকেল ও সুপারি গাছগুলোয় কী যেন এক নিবিড় শান্তি আছে। মনের গোপন ক্ষতগুলোর ওপর যেন কি একটা স্নিগ্ধ প্রলেপ মাখিয়ে দেয় সে শান্তি। পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে ওপারের নীল আকাশটার দিকে তাকিয়ে থাকে মধ্যে মধ্যে, যতক্ষণ না নির্মল আকাশের উজ্জ্বল দীপ্তিতে দৃষ্টি ঝল্‌সে যায়। সেই অগাধ অসীম নীল আকাশের মধ্যে যেন কি অপরিসীম গভীর আশ্বাস আছে। মিনিটকতক এই ভাবে সেদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস যখন কিছুতেই চাপতে পারে না, তখন ওর চমক ভাঙে। তখন আবার গিয়ে কাজে লাগে।

আর একটা সান্ত্বনাও ওর আছে, অন্যত্র। ওদের এই গলি বেরিয়ে গিয়ে ও-পাশে যে বড় রাস্তায় মিশেছে, সেই মোড়ে একটা গাছতলায় একটু বেশি বয়সের ছেলেরা প্রায়ই বসে আড্ডা দেয়। তাদের কথা ও সব বোঝে না—ইস্কুল কলেজের কথা, খেলার মাঠের গল্প, রাজনীতি, দেশবিদেশের খবর, আরও কত কি!—সে সব কথা ওর বোঝবার কথাও নয়, শুধু শব্দগুলোর

ধ্বনি কান্থ দিয়ে একটা বৃহত্তর পৃথিবী, একটা মহত্তর জীবনের আভাস পায় কল্পনা ক'রে ও, মনে মনে। বিরাট একটা জীবন-স্রোত চলেছে, ওকে বাদ দিয়ে একটা—সে জীবনের মধ্যে ওর কোন ঠাঁই নেই, তবু তা আছে। এদের ঐ হাস্পিটালটার মধ্যে ব্যাকুল হয়ে খোঁজে সে সেই জীবনের কিছু চিহ্ন কিংবা আভাস বা সেই জীবনের আনন্দ-স্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করতে চায় সে অন্তত একটুও।...এ ছাড়া আর একটি আনন্দ-অনুভূতির উৎস ওর আছে। সে হচ্ছে রেডিও। রেডিওতে যখন খবর বলে তখন যেখানেই থাক্ ছুটে গিয়ে দাঁড়ায় যন্ত্রটার সামনে। কত দেশের নাম, কত মানুষের নাম, কত কি বিচিত্র সংবাদ ব'লে যায়, তার কিছুই সে বোঝে না, তবু তাকে কি যেন এক অমোঘ আকর্ষণে টানে তা। কী যে সে একটা অনুভূতি হয় ওর তা ও ঠিক বোঝে না। হয়ত সেই অর্থ-না-বোঝা কল-কোলাহলের মধ্যে কান পেতে থাকে মনে মনে সে মহাজীবনের আনন্দ কোলাহলের দিকেই, আর অজ্ঞাত কোন্ কারণে এই অনুভূতি থেকে সান্ত্বনা ও আশ্বাস খুঁজে পায় নিজের এই অকিঞ্চিৎকর জীবনের।

প্রথম প্রথম ওর দিন এখানে যেন কাটত না। কি ক'রে যে বেঁচে আছে সে তাই এক একদিন ভাবত। আজও সে কথা ভাবে। তবু ত পরবর্তী নানা ঘটনা, নানা অনুভূতি—বিচিত্র সব জীবন-সংঘাতের মধ্যে সেদিনের অনেক ছবিই অস্পষ্ট, ঝাপ্সা হয়ে গেছে। সেদিন যে বেদনা অসহ্য ছিল, আজ তা তুচ্ছ, হাস্যকর ব'লে মনে হয়। কিন্তু তবু সেদিনের বেদনা কম সত্য, কম কষ্টদায়ক ছিল না।

এর ভেতর একটা দিনের কথা ওর আজও মনে আছে আশ্চর্যরকম-ভাবে। কিন্তু তাও হয় বৈকি! জীবনের একাকার হয়ে যাওয়া ছবিগুলোর মধ্যে হঠাৎ একজায়গায় হয়ত একটা ছবি কেমন ক'রে অম্লান থেকে যায়। বেশ উজ্জ্বল, বেশ স্পষ্ট। অনেক সময় কোন একটি স্মরণীয় ঘটনাকে উপলক্ষ ক'রে সেটা থাকে, মালীদের পুঁতে দেওয়া কাঠিটাকে অবলম্বন ক'রে পুষ্পিত চন্দ্রমল্লিকা যেমন উজ্জ্বল হয়ে ফুটে ওঠে তেমনি; কখনও বা সম্পূর্ণ অকারণেই সেটা মনে থাকে—রজনীগন্ধার পুষ্পশীর্ষের মত একাকার হয়ে থাকা তৃণপত্রের মধ্যে থেকে সোজা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে ওঠে নিজের স্বতন্ত্রতায়।

অম্বিকে চক্রবর্তীর বাড়ীর যে দিনটার কথা ওর মনে আছে, সেটা এমনি অকারণেই আছে—বিশেষ কোন স্মরণীয় কারণে নেই।

কানু ছবিটাকে সম্পূর্ণ মনে আনবার চেষ্টা করে শুয়ে শুয়েই।

হাঁ, এখনও মনে আছে, হয়ত সব তথ্য ঠিক আনুপূর্বিধ্য নাইগে তবে মোটামুটি একটা আস্ত ছবি গড়ে তোলা যায়! মন প্রতিব

তখনও ভোর হয়নি ভাল ক'রে, সাবিত্রী এসে ডাকলেন, 'ুই-ু'ত কানু, ওঠ্ বাবা। বেলা আর নেই, ঢের বেজে গেল ঘড়িতে। ওঠা । অ কানাই।' কটু।

কানুর এ কণ্ঠস্বর বিশেষ পরিচিত। অবহেলা করার উপায় নেই, যদিচ এমনি শোনায় অত্যন্ত সস্নেহ, মিষ্ট অনুযোগের মতই। সে ধড়মড় ক'রে উঠে বসে, কোনমতে চোখ রগ্‌ড়ে তাকায়। এখনও অন্ধকার রয়েছে চারিদিকে, শুধু পুবদিকটা ফরসা হয়েছে মাত্র—তাও খুব একটুখানি।

কাল খাওয়া-দাওয়া চুকেছে অনেক রাত্রে, নিমাইয়ের কে দু'জন বন্ধু খেয়েছিল, তার ফলে সবাইয়েরই খেতে রাত হয়েছে। তার পর রান্নাঘর ধুয়ে বাসন মেজে শুতে গেছে যখন কানাই, তখন দূরে কলেজের ঘড়িতে ঢং ঢং ক'রে দুটো বেজে গেছে। এ কাজগুলো বরাবরই কানু রাত্রে সেরে রাখে, নইলে সকাল বেলা যেন কাজের দিশে পাওয়া যায় না। কাজেই এখন মনে হচ্ছে যে, সে এইমাত্র শুয়েছে, ভাল ক'রে তার ঘুমই পায়নি এখনও—ঘুম ভাঙা ত পরের কথা।

তবু উঠতে হয়।

সাবিত্রী ওকে ডেকে দিয়েই আবার গিয়ে শুয়ে পড়েছেন। এটাকে উনি বলেন গা-গড়ানো, ঠিক নাকি শোওয়া নয়! কানু উঠে দোরে-চৌকাঠে জল দিয়ে উঠোন ধুয়ে রক ধুয়ে উনানে আঁচ দিয়ে প্রত্যহ ওঁকে আবার ডাকে। কোন কোন দিন ভাল ক'রেই ডাকতে হয়, যদিচ উঠে তিনি বলেন—'আমার ঠিক হুঁশ আছে রে বাবা, আমি তো জেগেই শুয়ে থাকি। শুয়ে শুয়ে একটু ভগবানকে চিন্তা করা—বলি, আর ত ফুরসুৎ হবে না সারাদিনে!'

আজও অভ্যাসমত কানু উঠে দোরে-চৌকাঠে জল দিতে গিয়ে দেখলে কে রাত্রে চৌবাচ্ছার ন্যাকড়াটি খুলে রেখে দিয়েছিল—ফলে সমস্ত জল বেরিয়ে গিয়েছে। বাল্‌তিতে যা সামান্য জল ছিল তা রাত্রে বারবার প্রয়োজন হওয়ায় এখন একেবারেই নিঃশেষিত।

নিশ্চয়ই একাজ সন্টুর, সে ছাড়া এত মাথা খাটিয়ে এত গরজ ক'রে এমন ভাবে অকাজ কে করবে! কানুকে জব্দ করার জন্য প্রতিদিন মাথা ঘামিয়ে সে যে-সব নব-নব উপায় উদ্ভাবন করে, তার কিছু সময় ও মন লেখাপড়ায় দিলে বোধ হয় সে ইস্কুলের পরীক্ষায় প্রথম হ'তে পারত।

কানু ঘুমচোখে অসহায়ভাবে একবার এদিক ওদিক তাকায়।

কলে জল আসেনি এখনও, পুকুর থেকে জল এনে তবে কাজ করতে হবে।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাল্‌তি নিয়ে পুকুরেই যায়।

উনানে আগুন দিতে গিয়ে আর এক বিপত্তি। যে ঝুড়িটা ক'রে ঘুঁটে থাকে রকে, তারই ঠিক ওপরে কাপড় শুকুতে দেবার তার টাঙানো। তাতে কাল কে জলসুদ্ধ ভিজে শাড়ী এনে রেখেছে, তা থেকে জল ঝরে প্রায় সব ঘুঁটেই ভিজে গিয়েছে। কর্তা কিছুতেই বেশি ঘুঁটে কিনবেন না একসঙ্গে, ওতে নাকি ঘর-দোর বড় নোংরা হয়। আসলে একেবারে বেশি পয়সা বার করতে চান না কিছুতেই। এ কাজ কার—তাও কানু জানে। বড় বৌ কোনদিন কাপড় নিংড়োয় না ভাল ক'রে—আর তার ওপর কিছুতেই সামনে রাখে না! যত অসম্ভব স্থানে ওর নজর, রকের এই কোণটায় ঘুঁটে-কয়লার ওপর কাপড়টা এনে জড়ো ক'রে রাখবার কথা আর কেউ ভাবতেই পারত না। কাপড় অবশ্য শুকুতে দেবার ভার কানুরই, কিন্তু এমন অসম্ভব স্থানের কথা সে কি-ক'রে ভাববে? তারটা টাঙ্গাবার সুবিধার জন্যই এত দূর টানা হয়েছিল, আর বর্ষায় যখন ভিজে কাপড়ের সংখ্যা অত্যধিক হয়ে ওঠে তখন কোন কোন দিন এ পর্যন্ত শুকোতে দেওয়া হয়। এখানে জড়ো-করা কাপড় খুঁজে দেখার কথা কারুরই কোন দিন মনে পড়া সম্ভব নয়।

ঘুমের অভাবে শরীর ক্লান্ত, বুদ্ধিও যেন আচ্ছন্ন। কি যে করবে ভেবেই পায় না কানু!

কাঠের টুকরো দু'একটা হাতের কাছে থাকলেও না হয় হ'ত—কিন্তু তাই বা এখানে কোথায়? গিন্নীকে ডাকবে? অসময়ে ডাকলে তিনি উঠে বিরক্ত হয়ে এই সমস্ত অব্যবস্থার জন্য ওকেই দায়ী করবেন—তা ও জানে। অনেকক্ষণ ধরে মাথা চুলকোবার পর ওর মনে পড়ে সিঁড়ির নিচে কতকগুলো ভাঙা ছবির ফ্রেম পড়ে আছে। সেইগুলোই নেবে? ক্ষতি কি!

সিঁড়ির নিচে—ঘর ঠিক নয়—অন্ধকার গর্তের মত খানিকটা স্থান মিস্ত্রীদের কল্যাণে কি-ক'রে রয়ে গেছে। সেইখানেই যত ভাঙা জিনিসপত্র, গিন্নীর ভাষায় 'ডেয়ো-ঢাকনা' ভর্তি করা থাকে। ভাল ক'রে দিনের বেলাই তার মধ্যে নজর চলে না, তায় এই ভোর। গরমের দিন, সাপ-বিছে থাকাও বিচিত্র নয়। কানু কতকটা ভয়ে ভয়ে, সন্তর্পণে সেখানে যায়। অনেক ভাঙাচোরা শিশি-বোতলের তলায় কাঠগুলো চাপা পড়ে গেছে—তোলাও মুস্কিল।

যাই হোক্—হেঁট হয়ে আস্তে আস্তে একটা একটা ক'রে কাঁচ সরাচ্ছে এমন সময় পিঠে একটা ধাক্কা খেয়ে চম্‌কে উঠল। হুম্‌ড়ি খেয়ে কাঁচের ওপরই পড়ত, অতিকষ্টে সাম্‌লে নিয়ে ফিরে দেখলে কর্তা স্বয়ং—'এই, ভোর বেলা এখানে কী রে?…এইখানে বুঝি চুরি-করা পয়সা লুকোনো থাকে?'

কানুর এ সব অভ্যাস হয়ে গেছে শোনা, তবুও ওর মুখ লাল হয়ে ওঠে, কোনমতে আত্মসংবরণ ক'রে বলে, 'ভাঙা কাঠ খুঁজতে এসেছি।'

'ভাঙা কাঠ খুঁজতে এসেছ!' অম্বিকাবাবু হাঃ হাঃ ক'রে অট্টহাসি হেসে ওঠেন, 'এটা মন্দ বলিস্‌নি ত! বলে, ঠিক্‌রে খুঁজতে বামীর দোরগোড়ায়! মাইরি, এত বুদ্ধিও তোর আসে!'

কানু রাগে অভিমানে দিশাহারা হয়ে পড়ে। সে বলে, 'ঘুঁটের ওপর বৌদি ভিজে কাপড় রেখে সব ভিজিয়ে দিয়েছেন—কি দিয়ে আঁচ দেব? সেই জন্যেই ভাঙা কাঠ খুঁজতে এসেছিলুম—ছবির দরুণ ভাঙা কাঠ—'

'অমনি আবার দিলি বৌমার ওপর দোষ চাপিয়ে? বাব্‌বা, তোমার পেটে পেটে শয়তানি! ওগো শুন্‌ছ—'

সাবিত্রী তাড়াতাড়ি চোখ মুছতে মুছতে উঠে এলেন।

'কি গো, কি হয়েছে?'

'এই যে তোমার গুণধর কানাইবাবুর স্বরূপ প্রকাশ পাচ্ছে ক্রমশ। বৌমা নাকি ভিজে কাপড় রেখে সব ঘুঁটে ভিজিয়ে দিয়েছে, তাই ও ভাঙা কাঠ খুঁজতে এই অন্ধকারে কাঁচ ভাঙ্গা ঘাঁটছে! আসলে ঐখানে নিশ্চয় থাকে ওর স্টক্! আমি বলিনি তোমাকে যে, একটু নজর রাখো—'

'আচ্ছা, আচ্ছা, হয়েছে। থামো! আমি দেখছি। কী হয়েছে রে?' কানু তখন ওঁকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে ঘুঁটে আর সেই ভিজে কাপড়-খানা দেখালে। চৌবাচ্চার কথাটাও জানিয়ে দিলে।

সাবিত্রী একটু মৃদু অনুযোগের সুরে বললেন, 'তাও বলি, তোর বাপু বড্ড নালিশ করা স্বভাব। সন্টু র খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, সে রাত্তিরে শুতে যাবার আগে তোমার চৌবাচ্চার ন্যাকড়া খুলে দিতে গেছে! কাপড়টাই বা তুই কি-ক'রে জানলি যে বৌমা ওখানে রেখেছেন?'

অম্বিকাবাবু তখন উপুড় হয়ে নিজেই কাঁচগুলো সরাচ্ছেন, বোধ হয় কানুর গুপ্ত ভাণ্ডারের খোঁজে। সেই অবস্থাতেই বলে উঠলেন, 'ওসব সাজানো, সাজানো—[illegible] ধরা পড়ে ত কিছু একটা বলতে হবে ত?'

'আ[illegible] তুমি কথা ক[illegible]?' মৃদু ধমক্ দেন সাবিত্রী, 'আচ্ছা, যা তুই

কাজে যা! ওগো দাও না, দুচারখানা কাঠ বার ক'রে। দোষ যারই হোক্ ঘুঁটে যখন ভিজেইছে,... আঁচ দিতে ত হবে!'

অম্বিকাবাবু অবশ্য কিছুতেই ছাড়লেন না। কাঠ ক'-খানা বার ক'রে দিয়ে বসে বসে একটি একটি করে সেই সব ভাঙা জিনিসগুলো সরিয়ে সরিয়ে দেখলেন। বলা বাহুল্য, কোথাও কিছু পাওয়া গেল না। তাতে তিনি আরও চটে গিয়ে কানুর একটা বৃহত্তর শয়তানী ধরবার চেষ্টায় সারা সকালটা, মানে যতক্ষণ না তাঁর অফিস বেরোবার সময় হ'ল, ওর ওপর কড়া নজর রেখে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন।

এধারে বৌ ঘুম থেকে উঠতেই সাবিত্রী তাকে ডেকে খুব মিষ্ট এবং তাঁর স্বভাবসিদ্ধ সস্নেহ অনুযোগের স্বরে বললেন, 'হ্যাঁ, বৌমা, তুমি ভিজে কাপড়খানা ঐ কোণে জড়ো ক'রে রেখেছিলে মা?'

হয়ত সত্যিই তার মনে ছিল না, কারণ ভুলে যাওয়াটা রেবার পক্ষে সবচেয়ে সহজ এবং অভ্যস্ত ব্যাপার। সে একেবারে আকাশ থেকে পড়ল, 'কী বলছেন মা! আমি ওখানে কাপড় রাখব কেন?'

'এই যে মা, কাপড়খানা কে বাপু ওখানে রেখেছে, ঠিক ঘুঁটের ঝুড়ির ওপরটিতেই, আর জল পড়ে পড়ে সব ঘুঁটে ভিজে গিয়েছে। কানু বলছিল, এ ঠিক বৌদির কাজ।... আমি বলি, তা হবেও, রেবার যা এক একটা বেয়াড়া বেয়াড়া ভুল।'

'না মা। হ্যাঁরে কানু, তুই কী সাংঘাতিক ছেলে রে, নিজের দোষ দিলি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে। তুই কাল এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছিস্, আমি কলঘর থেকে বেরিয়ে ঘরে যাবার সময় সামনে রেখে বলে গেলুম না? আমি গেলুম অতটা ঘুরে ঐ কোণের মধ্যে কাপড় রাখতে? বাবা, তুই যে দিনকে রাত করতে পারিস রে!'

কানুর তখন চোখে জল এসে গেছে, সেদিকে অপাঙ্গে একবার চেয়ে সাবিত্রী বললেন, 'তা বলে সব দোষটা ও ছেলেমানুষের ঘাড়ে চাপিও না বাছা। অমন বাহারের কাপড় নিংড়োনোটা ত তোমার, অন্য কেউ নিংড়োলে আমার এক ঝুড়ি ঘুঁটে ভিজত না।'

রেবাও অপ্রিয় প্রসঙ্গ এবং শ্বশুরের তরফ থেকে এই কাপড় নিংড়োনোর জন্য প্রায় সারাদিন-ব্যাপী একটা বকুনির ভয়ে কথাটা চেপে গেল, বেশি আর বাড়াবাড়ি করতে সাহস করল না। অম্বিকাবাবু কাউকে একবার বকবার সুযোগ-সুবিধা পেলে সারা দিনে ছাড়েন না।

এধারে ঠিক সেই মুহূর্তটিতেই সন্টু ঘুম ভেঙে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। সাবিত্রী তার দিকে একটু ভ্রূকুটি ক'রে চেয়ে বললেন, 'তুই কাল শোবার আগে চৌবাচ্চার জল বার ক'রে দিয়েছিলি ?'

সন্টুর অধরপ্রান্তে একটু হাসির রেখা বহু চেষ্টাতেও চাপা যায় না ঠিক, কিন্তু পরমুহূর্তেই নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নিয়ে সে বলে, 'সে আবার কি ! কে বললে ?'

সাবিত্রী নিরীহভাবে বলেন, 'ঐ ত কানু সকালে উঠে দেখেছে চৌবাচ্চার ন্যাকড়া খোলা, এক ফোঁটা জল নেই !'

তড়াক্ ক'রে এক লাফ দিয়ে কানুর কাছে পড়েই সন্টু পটাপট্ পটাপট্ চাঁটি লাগাতে শুরু ক'রে দিলে, 'বলেছিস্ তুই ? আমার নাম করেছিস ? কেন করলি ? কেন করলি ? য়্যাঁ, আমাকে দেখেছিস্ তুই খুলতে ? আর কখনও না জেনে বলবি ? য়্যা—?'

কতক্ষণ যে এইভাবে নির্বিচারে চাঁটিবর্ষণ হ'ত তার ঠিক নেই, কিন্তু সাবিত্রীই ধমক্ দিয়ে উঠলেন, 'ও কি হচ্চে ? বাঁদর কোথাকার ! ফের যদি ওর গায়ে হাত তুলবে তুমি ত দেখিয়ে দেব মজা !'

'কেন ও আমার নাম করলে ! কেন করবে ও !'

'বেশ করেছে ! তুমি করোনি ত ও নিজে করতে গেছে ? ' এক এক বালতি ক'রে রাস্তার কল থেকে জল এনে চৌবাচ্চা ভরানো অত সোজা— না ? তোমার নামে দোষ দেবার জন্যে ও অত কষ্টের তোলা জল সব ছেড়ে দিতে গেছে ! না কি আমরা উঠে খুলে দিয়েছি ?'

'তা আমি কি জানি ! বা রে, তুমি কেবল ওকে আদর দেবে। ওর কোন দোষ চোখে দেখতে পাও না ! ফের যদি ও আমার নাম কোনদিন উচ্চারণ করে ত ওকে খুন ক'রে ফেলব। এখনই হয়েছে কি !'

বেচারী কানু !

সেদিনের সে অসহায় অবস্থাটা মনে হ'লে আজও ওর রগের শিরাগুলো দপ্ দপ্ করতে থাকে ! আজ এই দুর্দিনেও তখনকার কথা মনে পড়লে ওর দুঃখই হয়।

কিন্তু সেদিন কি ওর চোখের জল ফেলবারই অবকাশ ছিল ? না, মাথার জ্বালাটায় একটু হাত বুলিয়ে নিতেই পেরেছিল ! তখনই ছুটতে হ'ল বাজারে, তারপর মাছ-কোটা, বাটনা বাটা, জল-তোলা—নিরবচ্ছিন্ন ও নিরন্ত্র কাজের ইতিহাস।

এর ভেতর আবার নিমাইবাবু ঘুম থেকে উঠেই হুকুম করলেন, 'চা দে

কান্থ, আর শোন—ছুটে একবার ধোপার বাড়ী যা দি ক্সে ওর বিতৃষ্ণা যেন জল দিয়েই বেরিয়ে যা—ছুটে যাবি, চান করতে অম্বিকা চক্রবর্তী। চাই।'

ল কানাইয়ের,

সেই ও পাড়ার এক প্রান্তে ধোপার বাড়ী। সাইকেল ক'রে সালুপতা, মিনিট লাগে। তার ওপর পাশাপাশি তিনটে গয়লার খাটাল পেরি. ওর হয়। কাপড় নিয়ে ছুটে আসতে গিয়ে এক জায়গায় পা পিছ্‌লে পড়ে র বেচারী, শার্টটার একটা কোণে একটু কাদাও লেগে গেল। নিমাই সে অপরাধ ক্ষমা করেনি, গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ছুটে এসে পুরস্কার পেলে পর পর গুটি-আষ্টেক চড়—কঠিন কেঠোহাতের চড়। কী ভাগ্যি যে কর্তাই ধমক দিয়ে উঠলেন, তাই, নইলে হয়ত ওখানেও থামত না।

সেদিনকার অনেক খুঁটিনাটি কথা আজ আর মনে নেই—শুধু এইটুকু মনে আছে যে, এর পর বলাই, শচী, রেবা, সাবিত্রী—এদের বিভিন্ন ফরমাশে ওকে পনেরো না ষোল বার দোকানে যেতে হয়েছিল। তার ওপর দুপুরেও একটু বিশ্রামের অবসর মেলেনি, দোরে এক তেঁতুল-ওলার কাছে গৃহিণী সের দশেক তেঁতুল কিনেছিলেন; নিজে শুতে যাবার আগে সেই তেঁতুলের ডালাটা আর বঁটিটা দিয়ে বলে গেলেন—'বসে বসে একটু এই বিচিগুলো কেটে রাখবি বাবা? বেশিক্ষণ লাগবে না। হয়ে গেলে একটু গড়িয়ে নিস্ তুই।'

ওর প্রতি দয়া ক'রে একটা তেঁতুল কেটে দেখিয়েও দিয়ে গেলেন, 'এই, এম্‌নি ক'রে ছাড়াবি, বুঝেছিস কতক্ষণের বা কাজ। কি করব, একটুও ফুরসুৎ পাই না, তাই।'

কিন্তু অনভ্যস্ত হাতে কান্থর বিস্তর সময় লাগে। তেঁতুলগুলো ভাল ক'রে ধরতেই পারে না, কেবল হাত পিছ্‌লে যায়। এম্‌নি স্বাভাবিক অপটুতা ত আছেই, তার ওপর আগের দিনের অনিদ্রা ও শ্রান্তিতে চোখ বুজে আসে, হাত যেন অবশ হয়ে এলিয়ে পড়ে। ফলে গৃহিণী যখন উঠলেন তখন সিকিও কাটা হয়নি। সেদিকে চেয়ে বললেন, 'আ আমার পোড়া কপাল! এখনও যে তোর সিকি তেঁতুল কাটা হয়নি রে! কাটতে কাটতে ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি? না শুয়ে উঠে কাটতে বসেছিস? তাই ত, আমি ভেবেছিলুম কালই ওগুলো তেল মাখিয়ে হাঁড়িতে তুলে রাখব। তা যাক্ গে, ভালই করেছিস একটু শুয়ে—কাল অনেকরাত হয়েছিল শুতে।'

কান্থ জানত না যে ইংরেজীতে একটা কথা আছে, 'আঘাতের পরে আবার

এধারে ঠিক সেইন এমনিই একটা মর্মান্তিক অভিমান বোধ না ক'রে
সাবিত্রী তার দিকেরু কণ্ঠে বলে উঠেছিল, 'আমি একবারও উঠিনি মা,
আগে চৌবাচ্চার ঘু:ম আমার চোখ জ্বালা করছে!'

সণ্টুর একটু অবিশ্বাসের সুর ফুটে উঠল সাবিত্রীর কণ্ঠে। তিনি বললেন,
পরমুহূর্তে নি, তাইতেই ঐটুকু? এই তিন ঘণ্টায়? অবাক্ করেছে মা!
যা এখন ওঠ, উনুনে আঁচ দিয়ে বাসন ক'খানা মেজে আন্‌গে যা এখন।
ও দেখছি আমাকেই করতে হবে।'

যদিচ তারপর চার-পাঁচ দিনের বিশ্রামের আশা বিসর্জন দিয়ে কানুকেই
সেই তেঁতুল উদ্ধার করতে হয়েছিল।

সেদিন ছুটি পেয়েছিল কানু রাত বারোটারও পর। সন্ধ্যার সব কাজ
সারা হবার পর অন্যদিন রাত্রে আহারের আগে ঘণ্টাখানেক অবসর মিল
কিন্তু নিমাইবাবুর ক্লাবে সেদিন বার্ষিক উৎসব, চা দেবার জন্যে তিনি ক'র মধ্যে
সঙ্গে ক'রে নিয়ে গেলেন। চা বিলি ক'রে এবং হেঁট হয়ে কাপ ধুতেয়, এত
টন্ টন্ করতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল থর্‌থর্ ক'রে, তবু সে কান রোগের
ক'রে বলতে পারলে না। ওদের বেলা খাবারও সব ফুরিয়ে গেল—একটা
সিঙ্গাড়া মাত্র জুটেছিল ওদের কপালে। চলে আসবার সময় শুনতে পেলেচ
ক্লাবের সেক্রেটারী জিজ্ঞাসা করছেন নিমাইকে, 'ওকে কত দিতে হবে
নিমাই?'

নিমাই চাপা গলায় প্রতিবাদ ক'রে উঠল, 'কিছু না, এক পয়সাও না।
আমার রাতদিনের চাকর, আমি মাইনে দিচ্ছি, সেখানে কাজ না করে এখানে
করেছে। দিতে আবার কি হবে, ওতে আস্পদ্দা বেড়ে যায়! ও কাজও
করবেন না।'

ফিরে এসে শুধু সাবিত্রীকে প্রশ্ন করেছিল ভয়ে ভয়ে, 'বাসনগুলো জড়ো
ক'রে রাখব মা আজ? কাল খুব ভোরে উঠব না হয়?'

অপ্রসন্ন মুখে সাবিত্রী জবাব দিয়েছেন, 'আবার ঐ গুচ্ছের এটো বাসন
তাংড়ে রাখা! তারপর কে-ই বা তোমাকে ভোরে ডেকে দেবে, রোজই ত
আমাকে উঠে ঘুম ভাঙাতে হয়। তার চেয়ে একটু কষ্ট ক'রে মেজেই রাখ
বাবা!...মোটা বকশিশটা ট্যাকে পুরেছ—এখন কষ্টও একটু করো।
আমাদের আবার অসুবিধেয় ফ্যালো কেন?' শেষের কথাগুলো যেন অর্ধ-
স্বগতোক্তি হিসাবেই বললেন।

নিষ্ফল জেনেই শুধু নয়, নিরতিশয় ক্লান্তির জন্যও কতকটা কানু

এ সংসারে যত দিন যাচ্ছে ততই একটি লোক সম্বন্ধে ওর বিতৃষ্ণা যেন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। সে লোকটি হ'লেন বাড়ীর কর্তা অম্বিকা চক্রবর্তী।

যেটাকে ওর এতদিন শুধুই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি বলে মনে হয়েছিল কানাইয়ের, এখন মনে হয় শুধু সন্দেহ নয়—সে দৃষ্টিতে কেমন একটা নীচ লোলুপতা, কেমন একটা অন্যায়ের ছোঁয়াচ আছে। অম্বিকাবাবুর সংসর্গটা সর্বদা ওর ক্লেদাক্ত বলে মনে হয়, তিনি যখন যেখানে থাকেন সেখানেই চারপাশের আবহাওয়াটা কেমন যেন বিষিয়ে ওঠে। অবশ্য ঠিক এমন ক'রেই যে কানাই ভাবে তা নয়—শুধু অকারণ একটা অস্বস্তি বোধ করে, আর সে অস্বস্তি বেড়েই চলে দিন দিন। বিশেষ ক'রে ওঁর স্বভাবের একটা কদর্য দিক্ আকস্মিকভাবে ওর সামনে উদ্‌ঘাটিত হওয়ায় আরও যেন ওর মনোভাবটা বিরুদ্ধ হয়ে উঠেছে কর্তা সম্বন্ধে—এবং কর্তারও তাই।

সে ঘটনার গুরুত্বটা কানাইয়ের বোঝবার বয়স নয় তখন, সে বুঝতেও পারেনি, শুধু ওদের ব্যবহারে ওর অনুমান করতে বাধেনি যে কর্তার আচরণটা আর যাই হোক্—খুব নির্দোষ নয়।

বাড়ীর কর্তার গতিবিধি বহুদিন থেকেই কানুর আদৌ ভালো লাগত না। কেমন যেন একটু উঁকি-মারা স্বভাব।...সেদিনের কথাটা কানুর চিরকাল মনে থাকবে। ছাড়া-কাপড়গুলো পরে কাচ্‌বে বলে বারান্দার কোণটায় জড়ো ক'রে রাখতে গেছে—হঠাৎ কানুর পায়ের শব্দে যেন চম্‌কে উঠে কর্তা রুদ্ধ বাথরুমের পাশ থেকে দ্রুত সরে গেলেন। তারপর লজ্জায় অনেকক্ষণ তিনি কানুর দিকে তাকাতে পারেন নি—।

অপ্রতিভ কর্তা অন্যত্র সরে গেলেন বটে তবে তাঁর বিদ্বিষ্ট মনোভাবটা আরও যেন বিষাক্ত হয়ে উঠল কানাই সম্বন্ধে। কানাইয়ের সামনে ঘটনাটা ঘটবার সমস্ত দায়িত্ব যেন কানাইয়ের— এবং সেটা তারই অপরাধ। তাঁর সমস্ত লজ্জাটা বিকৃত হয়ে ওর প্রতি বিদ্বেষে পরিণত হ'ল। সেটা—কারণটা তলিয়ে না বুঝেও—কানাইয়ের অনুভব করতে আটকায় না। অথচ কীই বা করে সে? এ চাকরী ছাড়লে আর কোথাও রাতদিনের চাকরী পাবে কিনা তারও ঠিক নেই। সেটা পরখ ক'রে দেখবার ঝুঁকি নিতেও ওর সাহসে কুলোয় না। তার যে একবেলার আশ্রয়ই নেই।

তবু একদিন সে সব বিপদের সম্ভাবনা তুচ্ছ ক'রেও এ আশ্রয় ছেড়ে দিতে প্রস্তুত হয়েছিল। আশ্চর্য এই—সে যাত্রা ওকে বাঁচিয়ে দিলে সন্টুই। ব্যাপারটা অবশ্য এমন কিছু নয়। ইদানীং বাজার করার ভারটা সম্পূর্ণভাবে

ঘাড়ে চেপেছিল কানাইয়ের। আগে বলাই যেত ওর সঙ্গে, কখনও কখনও সন্টুও গিয়েছে কিন্তু এখন আর কেউ যায় না, কানাইকেই বুদ্ধি-বিবেচনা ক'রে আনতে হয়। এর জন্য ওর দুঃখের শেষ ছিল না। বাজার যত সস্তাতেই করুক, গৃহিণী নিত্য একবার ক'রে বিলাপ করেন, 'কী ছিরির বাজার! শুধু শুধু একগাদা পয়সা খরচ হয়, অথচ কোন জিনিস হাতে করতে কুলোয় না। এই ত ক'টা আনাজ, এবেলাই বা কি কুটি আর ওবেলার জন্যেই বা কি রাখি। অথচ শোন, পয়সা এতটি গেছে। তা ওরই বা দোষ কি, ছেলেমানুষ, ওকে ত লোকে ঠকাবেই, তা ছাড়া যদি দু'একটা পয়সা এদিক ওদিক ক'রে ফেলে—কিছু কি বলতে পারি? আমার যে হয়েছে—সেই কথায় বলে না আছে গরু না বয় হাল তার দুঃখ সর্বকাল। বাবুরা একেবারে এলিয়ে ছেড়ে দিয়েছেন, একটু শুধু সঙ্গে গিয়ে মাথা কিনবেন তাও পারেন না। সবই আমার অদেষ্ট।' অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে বোঝাতে চান যে কানাই দু-এক পয়সা ভাঙে তা তিনি জানেন কিন্তু তার জন্য তিনি ওকে দোষ দেন না।

তার ওপর সন্টু আছে। কানাই বাজার ক'রে ফিরলেই সে লাফাতে লাফাতে ছুটে আসবে পড়ার বই ফেলে, 'য়্যা— ঐ তিনটে মুলো চার পয়সা! বলিস কি! দু পয়সা মা, দু পয়সা। প্যাঁজ-কলি কত? দু পয়সা? দ্যুস্! কত পয়সা কামালি কানু, মাইরি, সত্যি ক'রে বল ত।'

অবশ্য এটা করে সে খেলাচ্ছলে—ওকে ক্ষ্যাপাবার জন্যই। সেটা কানাই ইদানীং বুঝতে পেরেছিল ব'লে গায়ে মাখত না। বুঝেছিল যে বাড়ীর অপর লোকেরাও ওর একথা কেউ শোনে না, সন্টুর চালাকি সবাই বুঝে নিয়েছে—নইলে আগে এক একদিন কানাই কেঁদে ফেলেছে এই মিথ্যা দোষারোপে। তাছাড়া এখন আরও গ্রাহ্য করে না এই জন্যে যে, এখন সত্যিই এক একদিন এক পয়সা দুপয়সা ক'রে সে সরায় বাজার থেকে। আলুওলা দস্তুরী দেয় মাসে একদিন—সে চারপয়সা সে জিলিপি খায়। কিন্তু অন্যদিন বাজারের বাইরে তিনটে তেলেভাজা খাবারের দোকান থেকে যখন বেগুনি বা পিঁয়াজের বড়ার সৌরভে বাতাস ভরে ওঠে তখন তার পক্ষে রসনা সংবরণ করা কঠিন হয়ে ওঠে বৈকি? তাই কখন্ সে মনকে বুঝিয়েছে যে যখন চুরি করলেও দুর্নাম এবং না করলেও তাই—তখন সত্যি-সত্যিই চুরি ক'রে সে বদনাম নেওয়াই ভাল।

অবশ্য তাই ব'লে সে রোজ চুরি করে না কিংবা দুপয়সার বেশিও করে না

কোন দিন। তাঁর ওপর কর্তার আক্রমণটা যেদিন অতর্কিতে এসে পড়ল সেদিন সে চুরি করেনি আদবেই। অম্বিকাবাবু কোনদিনই বাজারে যান না, কিন্তু সেদিন কী একটা অছিলায় বাইরে বেরিয়েছিলেন। ঘুরে আসবার সময় হঠাৎ বাজারে ঢুকে অতিরিক্ত এক পোয়া মাছ কিনে একটা কাগজে জড়িয়ে বাড়ী ফিরলেন। সে হাতটা ছিল পিছনে, আগে কেউ দেখতে পায়নি। কানাই তখন বাজার নামিয়ে রেখে মাছ কুটছে, তিনি এসে প্রশ্ন করলেন—খুব সরলভাবেই—'আজ কত ক'রে মাছ কিনেছিস রে কানাই?

কানাই মাথা না তুলেই উত্তর দিলে, 'দশ আনা'।

অকস্মাৎ কাগজের মোড়কটা ধপাস্ ক'রে ওর সামনে ফেলে বললেন, 'সে কি রে, এই ত আমি নিয়ে এলুম আট আনা ক'রে! একেবারে সের-করা দু আনা মারছিস আজকাল?'

কানাই ত স্তম্ভিত, সে যে কী উত্তর দেবে, কী বললে এর যথেষ্ট জোর প্রতিবাদ জানানো হবে তা ভেবে ঠিক করার আগেই অম্বিকাবাবুর স্ত্রী গালে হাত রেখে ঘাড়টা একদিকে অস্বাভাবিক কাত ক'রে বললেন, 'অবাক করেছে মা! এ যে দিনে ডাকাতি! হ্যাঁরে, তোকে কি আমরা দুধকলা দিয়ে কালসাপ পুষছি রে!'

কানাই এবার কি একটা প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল কিন্তু কর্তা দ্রুত এগিয়ে এসে ঠাস্ ক'রে এক চড় বসিয়ে দিলেন ওর গালে, 'হারামজাদা, পাকা চোর হয়ে গেছ?'

এই সময় সন্টুর প্রবেশ। আজই কি একটা কারণে সে ওর এক বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে করতে বাজারের ধারে গিয়ে পড়েছিল, হঠাৎ বাবাকে বাজারে ঢুকতে দেখে কৌতূহলী হয়ে তাঁর পিছনে পিছনে যায়। যদিচ সে নিজেও এইটেকে কানাই-পীড়নের অস্ত্ররূপে ব্যবহার ক'রে এসেছে এতকাল, তবু আজকে বাবার এই অকারণ ষড়যন্ত্রটা ওর কাছে কেমন বিশ্রী লাগল। সে ঘর থেকে ঘটনাটা দেখে অবাকও কম হয় নি—এ কী ব্যাপার ওর বাবার! তেমনি চুপ ক'রেও থাকতে পারলে না কিছুতে, বেরিয়ে এসে বললে, 'সে কি বাবা, তুমি ত দশ আনা দরেই কিনলে। আমি ত স্পষ্ট দেখলুম একটা দোয়ানি আর দুটো পয়সা দিয়ে তুমি এক পো মাছ নিলে।'

আর যাই হোক্, এটার জন্য অম্বিকাবাবু মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি অন্তরকম চেষ্টা সত্ত্বেও একটু অপ্রতিভ হয়ে উঠলেন, ধমক দিতে গিয়ে ধমকের সুরটা ঠিক ফুটল না। তবু উড়িয়ে দেবার ক্ষীণ চেষ্টা ক'রে বললেন,

'যা যা, তুই সব তাইতে কথা কইতে আসিস নি! ফক্কড় ছোঁড়া কোথাকার! তুই কেমন ক'রে জানলি?'

'আমি যে বাজারের ধারে গিয়েছিলুম বাবা, তোমার পিছনেই ছিলুম। তুমি বোধ হয় অনমনস্ক হয়ে পয়সা দিয়েছ। কিন্‌লে ত ভূষণ জেলের কাছ থেকে, আমি স্বচক্ষে দেখলুম!'

অম্বিকাবাবু রাগে দিশাহারা হয়ে প্রচণ্ড এক চড় কষিয়ে দেন সন্টুর গালেই, 'অসভ্য ফাঁকিবাজ ছেলে কোথাকার! সব তাইতে কথার ওপর কথা কইতে আসা! আমি মিথ্যেবাদী—না?…কি করতে যাস্ তুই পড়াশুনো ছেড়ে যত সব অসভ্য বকাটে ছেলেদের সঙ্গে আড্ডা দিতে তাই শুনি?'

সন্টু কিন্তু ঠিক কানাই নয়। সে একটু দূরে সরে গিয়ে সদম্ভে বলতে লাগল চীৎকার ক'রে, 'বা রে. নিজে মিছে কথা বলছে আর আমি সেটা বলে দিলেই দোষ, না? মার একেবারে রাস্তায় পড়ে রয়েছে, যখন তখন মারা আমাকে! দেখিয়ে দেব মজা আমি ফের কোন-দিন মারতে এলে। পাজী. মিথ্যুক কোথাকার!'

'দেখবি—দেখবি বাঁদর?' বলে অম্বিকাবাবু তেড়ে গেলেন। কিন্তু আশ্চর্যের কথা এই যে, আসল চুরির ব্যাপারটা নিয়ে আর তিনি বেশি ঘাটাতে সাহস করলেন না। এমন কি সন্টুকেও তার দুর্বিনয়ের জন্য শাসন না ক'রে বিস্ময়কর ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সরে পড়লেন অন্য একদিকে।

সেদিনই কানাই গৃহিণীর কাছে চাকরি ছেড়ে দেবার প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু তিনি ততক্ষণে আসল ব্যাপারটা আঁচ করেছিলেন, তাছাড়া তিনি বেশ বুঝেছিলেন যে এই মাইনেতে এত কাজ কেউ করবে না, উপরন্তু এর চেয়ে ঢের বেশি চুরি করবে। তিনি কানাইয়ের প্রস্তাবে চোখে অন্ধকার দেখলেন। তাড়াতাড়ি ওর পিঠে মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'ও যে তোর বাপের চেয়ে বড় কানাই, যদি একটা চড় মেরেই থাকে, তাতে অত রাগ করার কি আছে। ছেলেমানুষি করিস নি। যা, আপনার কাজে যা।'

সন্টুরও মনের তারটা সেদিন একটু সহানুভূতির সুরে বাঁধা ছিল, সেও বললে, 'তুই ওসব কথা ছেড়ে দে কানু, বাবাটা ঐ রকম। সবাই জানে বাবা মিছে কথা বলে। মানুষের পেছনে লাগা ওর একটা রোগ।'

গৃহিণী অবশ্য সন্টুকে সস্নেহ ধমক দিয়ে বললেন, 'যা যা! নিজের বাপের সম্বন্ধে বাক্যি হচ্ছে দেখ না! এই সব সভ্যতা শিখছ, উল্লুক কোথাকার!'

কিন্তু তার চেয়ে বেশি প্রতিবাদ তিনিও করতে পারলেন না।

এর পর আরও দু'একবার অম্বিকাবাবু যে ওকে জব্দ করার চেষ্টা করেন নি তা নয় এবং সেগুলোকে সত্য করে তুলে কানাইয়ের লাঞ্ছনার যথেষ্ট কারণ হয়েছিলেন, কিন্তু আবারও একদিন ধরা পড়ে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে ও চেষ্টাটা চালানো ছেড়ে দিলেন। কানাই-ই সাধারণত শুকনো কাপড় তুলে আল্‌নায় গুছিয়ে রাখত বিকেলে, সেদিন ওরই সৌভাগ্যক্রমে শচী তুলেছিল গুছিয়ে। অম্বিকাবাবু তা জানতেন না—তিনি কাপড়টা নিয়ে সবার অলক্ষ্যে একটা খুব ভিজে কাপড়ে খানিকটা অংশ জড়িয়ে দ্রুত হাতের চাপ দিয়ে সামান্য একটু ভিজিয়ে নিলেন, তারপর প্রকাশ্যে কাপড় খানা গৃহিণীর গায়ে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, 'অ্যাখো অ্যাখো, ছোঁড়ার কীর্তি অ্যাখো। ভাহা ভিজে কাপড়খানা তুলে রেখেছে আনলায়। দিন দিন ফাঁকি দেওয়া বাড়াচ্ছে।'

কিন্তু কানাই জবাব দেবার আগেই শচী বলে উঠল, 'সে কি! ও ত আজ কাপড় তোলেনি বাবা, আমি নিজে তুলেছি। কাপড় ত শুকিয়ে গিয়েছিল কখন্। আপনি এখন ওটা হাতে করে বাইরে গিয়েছিলেন, নিশ্চয় সেই সময়ে কী ক'রে ভিজে গিয়েছে।'

'হ্যাঁ', অত্যন্ত চটে গিয়ে বলেন অম্বিকাবাবু, 'তোদের এক কথা! আমি বুড়ো মিন্‌ষে বাইরে গিয়ে ভিজিয়ে আনলুম অথচ আমিই টের পেলুম না। ...তোরা সবাই মিলে আমাকে মিছে কথা বলতেই দেখিস্ দিনরাত!...... এমনি না হ'লে কলিকাল! নিজের ছেলেমেয়ে মুখের ওপর বলে মিথ্যাবাদী!' ইত্যাদি। বকতে বকতেই অ- একটা কাপড় হাতে ক'রে বাথরুমের দিকে চলে গেলেন।

তারপর থেকে তাঁর আক্রমণটা অনেক কমে এল।

৪

একটা জিনিস কানাই এই বয়সেই বুঝতে পেরেছিল যে, বাইরের একটা জগৎ তার কাছে রুদ্ধ হয়ে আছে চিরকাল এবং লেখাপড়া না জানলে সেখানে প্রবেশ করা যায় না। সেটা যে শুধু জ্ঞানের রাজ্য তাই নয়—সমৃদ্ধির ও স্বাচ্ছন্দ্যের রাজ্যও বটে। রেডিওতে যখন বাংলায় খবর বলে তখন সে সম্ভব হ'লেই হাতের কাজ ফেলে উৎকর্ণ হয়ে শোনে এবং প্রাণপণে বোঝবার চেষ্টা করে, কিন্তু সেটা যখন কিছুতেই পারে না, অর্থাৎ বাংলা শব্দও যখন কোন অর্থ

বহন ক'রে ঢোকে না ওর চৈতন্যে, তখন এক একদিন চোখে জল ভরে আসে ওর। যখন বলাই বা নিমাইয়ের বন্ধুরা বাইরের রকে বসে রাজনীতি ও সমাজনীতি নিয়ে আলোচনা করে, তখনও মধ্যে মধ্যে আড়াল থেকে বোঝবার চেষ্টা করে প্রাণপণে, আর সে চেষ্টার ব্যর্থতায় ওর মাথার মধ্যে কেমন ঝিম্ ঝিম্ করে। তবু সেটাই যে সম্পূর্ণ মূল্য নয় লেখাপড়া শেখার, তা এতদিনে স্বচ্ছ হয়ে এসেছে ওর কাছে। লেখাপড়া শেখা মানে অফিসে চাকরী করা কিংবা কোন ভাল কাজ করা—যাতে ভাল কাপড়-জামাজুতো পরে বেড়ানো যায়, যখন তখন চা-জলখাবার সিগারেট খাওয়া যায়, ওর মত বা ওর মার মত লোককে ঝি-চাকর রেখে আরামে বসে থাকা যায়—তাছাড়া সিনেমা-সার্কাস ত বটেই, ফুটবল খেলার মত বাজে জিনিসও পয়সা খরচ ক'রে দেখা যায়।

এইসব সাত-পাঁচ ভেবেই বোধহয় একদিন ও শচীকে ধরে বসল, 'দিদিমণি, আমাকে একটু লেখাপড়া শেখাবে?'

শচী মুখ ভেঙিয়ে বললে, 'হ্যাঁ, আমার খেয়ে দেয়ে কাজ নেই যেন, আমি তোমাকে নিয়ে গাধা পিটতে বসি। যা যা!'

কানাই সঙ্কুচিত হয়ে চুপ ক'রে গেল, সে চেষ্টা ছেড়েই দিলে একেবারে।

কিন্তু হঠাৎ আবার শচীই হপ্তা-দুই পরে কী মনে ক'রে ওকে ডেকে বললে, 'কানু তুই পড়বি সত্যি-সত্যিই? তা না হয় একখানা বই কিনে আনিস প্রথম ভাগ, পড়িয়ে দেব'খন্।'

তারপর কেন কে জানে গলাটা একটু নামিয়ে, এদিক ওদিক চেয়ে বললে, 'কিন্তু তোকে যা বলব সব শুন্‌বি ত? আমি যদি তোকে লেখাপড়া শেখাই তাহ'লে আমি হলুম তোর গুরু, গুরুর কথা শুন্‌তে হয়।'

কানু তৎক্ষণাৎ একেবারে ওর পায়ে হাত দিয়ে বললে, 'যা বলবে তাই শুন্‌ব দিদিমণি। এই তোমাকে ছুঁয়ে বলছি।'

'আচ্ছা যা, একখানা বই কিনে আন্‌গে।' খুব উদারভাবে বললে শচী।

সেইদিনই কানু মুদীর দোকান থেকে দু'পয়সা দিয়ে একখানা প্রথমভাগ কিনে আন্‌লে। কিন্তু পড়বার সময় কখন? দুপুর বেলা ওর যদি-বা একটু অবসর মেলে, শচী তখন ঘুমোয়। সন্ধ্যাবেলা শচীর হয়ত অবসর থাকে, তখন কানুর মরবার ফুরসুৎ নেই। রাত আটটা নাগাদ ওর খানিকটা হাতখালি হয় কিন্তু শচী তখন জমাট উপন্যাস নিয়ে বসে। কাজেই বই কেনবার আটদিন পরেও ওর পড়তে বসা হ'ল না। শেষে অনেক অনুনয়-বিনয় ক'রে

একদিন রাত ন'টার সময় ও প্রথম পাঠ নিলে প্রথম ভাগে। অক্ষর-পরিচয়টাও এতদিনে ভুলে গিয়েছিল, এখন আবার নতুন ক'রে সেইটেই ঝালাতে বসল।

কিন্তু এই সময়টা হ'ল অম্বিকাবাবুর অফিস থেকে ফেরবার সময়। প্রথম দিনই অম্বিকাবাবু এসে দেখে ফেললেন ঘটনাটা। মেয়ের ওপর তেলে-বেগুনে জলে উঠলেন, গৃহিণীর কাছে গিয়ে চাপা গলায় চুপি চুপি কথা বলবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে তম্বি শুরু করলেন, 'অতবড় ধিঙ্গী মেয়ে, সংসারের একটা কুটি ভেঙে দু-খানা করবার চেষ্টা নেই, বসে বসে খাবে আর আমারই অনিষ্ট করবে! যাকে বলে বুকে বসে দাড়ি ওপড়ানো! অমন মেয়েকে নুন্ দিয়ে মারতে পারোনি?'

গৃহিণী হতভম্ব হয়ে বলেন, 'কী হ'ল কি, অমন চেঁচাচ্ছ কেন?'

'চেঁচাচ্ছি কেন?...ঝি চাকরদের একেই কি রকম আস্পর্দ্ধা বেড়ে যাচ্ছে দিন দিন, তার ওপর তাদের লেখাপড়া শেখানো! লেখাপড়া শিখলে আর তোমার বাসন মাজবে? তখন অফিসে চাকরি খুঁজবে না?'

গৃহিণী আশ্বস্ত হয়ে বলেন, 'এই কথা? আমি বলি, না জানি কি! তুমিও যেমন, ও এই বুড়োবয়সে লেখাপড়াও শিখেছে, আর অফিসে চাকরিও করেছে! পাগলামি ঘাড়ে চেপেছে, দিন কতক চেষ্টা করুক্।'

বলাবাহুল্য অম্বিকাবাবু এতে খুব আশ্বাস পেলেন না। তিনি আবার শচীকেও আড়ালে ডেকে সাবধান করতে গেলেন, কিন্তু সেখানে ফল হ'ল উল্‌টো, শচী ধমক দিয়ে উঠল ওঁকেই, 'আপনার বড় ছোট মন বাবা! ও যদি লেখাপড়া শিখে উন্নতি করতে চায় একটু ত আপনার তাতে অত দুশ্চিন্তা কেন? ও ছাড়া কি আর ঝি-চাকর জুটবে না? না কি ও চিরকাল আপনার বাড়ীতেই পেট ভাতায় বাসন মাজবে?'

অম্বিকাপদ বিরক্ত হয়ে বললেন, 'ঐ ত তোদের দোষ, বড্ড তর্ক করিস! যা বলছি তাই শোন্, ওসবে আর দরকার নেই।'

শচী আরো বিরক্ত হয়ে ব'লে উঠল, 'আমি যা ভাল বুঝব তাই করব, আপনার অত কথায় দরকার কি?'

অম্বিকাবাবু গজ্ গজ্ করতে লাগলেন কিছুক্ষণ ধরে কিন্তু আর বিশেষ কোন প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না।

এসব কোন ঘটনাই কানুর অগোচর রইল না এবং এর জন্যে মনে মনে সে শচীর কাছে খুবই কৃতজ্ঞ হ'ল, যদিচ আসল কাজটা যে তাতে খুব বেশি এগোল তা নয়; এর পর আরও তিনদিন শচীর আর অবসরই হ'ল না যে ওকে নিয়ে বসে।

কিন্তু তাই বলে শচী তার গুরুদক্ষিণাটা আদায় করতে বিলম্ব করলে না। প্রথম পাঠ নেবার পরের দিনই চুপি চুপি কানুকে ডেকে বললে, 'এই শোন্, একটা কাজ করতে হবে তোকে।'

'কী দিদিমণি? কানু তখন কৃতজ্ঞতায় সব কিছু করতে রাজী।

'খুব সাবধান কিন্তু, কেউ না জান্‌তে পারে। আমাকে ছুঁয়ে দিব্যি করেছিস্ মনে থাকে যেন, যা বলব তাই শুন্‌বি।...ঐ যে যতীনদের বারাক্ —জানিস্ তুই? লম্বা বড় বাড়ীটা?'

তাদের এ বাড়ীরই সারে প্রকাণ্ড বাড়ীটা, দোতলা বাড়ী, ওপর-নীচে মিলিয়ে দশটা ফ্ল্যাট্। অত্যন্ত শ্রীহীন কদাকার বাড়ী, কোথাও কোন অবসর নেই, এতটুকু ফাঁকা জায়গা রাখেনি বাড়ীওলা। বাড়ীটা দেখে কেমন একটা মজা লাগে কানুর। সে হাসাহাসি করে প্রায়ই।

সুতরাং চেনে সে ভাল ক'রেই।

শচী আরও চুপি চুপি বললে, 'ওর নীচের তলায় এপাশে যে লম্বামত ছোক্‌রা বাবু থাকে, চিনিস্ না?—ঐ যে রে কোঁকড়া কোঁকড়া চুল মাথায়, পাজামা পরে ঘুরে বেড়ায়?'

একটু ভেবে নিয়ে কানাই বললে, 'শশাঙ্ক?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ' খুশী হয়ে বললে শচী, 'চিনিস্ ত তুই দেখছি।'

ভাল ক'রেই চেনে কানাই। কাজ নেই কর্ম নেই, শীত পড়লেই কেবল সারা দুপুর পাশের পোড়ো জমিটায় ক্রিকেট পেটে, আর গরম পড়লেই ফুটবল। মুখ ব্রণর দাগে ভর্তি! দিনরাত সিগারেট খায়—পয়সা এত কোথায় পায় মাঝে মাঝে ভাবে কানু, ওর বাবা ত নিশ্চয়ই খুব বেশি রোজগার করেন না, নইলে আঠারো টাকা ভাড়ার এইটুকু ফ্ল্যাটে থাকবার দরকার কি? ...অতবড় ছেলে না করে লেখাপড়া, না করে পয়সা রোজগারের চেষ্টা। ইদানীং কাজ হয়েছে সারা দুপুর আস্তে আস্তে শিস দিতে দিতে এই গলিতে পায়চারি করা। ওকে দুচোখে দেখতে পারে না কানাই।

শচী বললে, 'ওকে এই চিঠিটা দিবি একসময় চুপি চুপি, বুঝলি? কেউ না টের পায়। আর যদি জবাব দেয় কিছু ত তাও অমনি—'

প্রস্তাবটা আদপে ভাল লাগে না কানুর। একে ত এত লুকোছাপার কি আছে তা ও বোঝে না, তার ওপর ঐ ছেলেটার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করতে ওর খুবই আপত্তি। কিন্তু কী আর করে, শচীর কথা না শুনেও উপায় নেই। চিঠিখানা সে ওর হাফপ্যান্টের পকেটে রেখে দিলে তখনকার মত, নির্জনে শশাঙ্ককে পাবার সুযোগ খুঁজতে লাগল।

অবশ্য সে সুযোগের দেরিও হ'ল না। শশাঙ্ক বোধ হয় চিঠিখানা আশাই করছিল, দুপুরবেলা বাসন নিয়ে পুকুর-ঘাটে যেতেই শিস দিতে দিতে শশাঙ্কও কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এদিক ওদিক চেয়ে পকেট থেকে চিঠিটা বার ক'রে দিতেই সে দাঁত বার ক'রে হেসে বললে, 'জীতা রহো বেটা! একটা সিগারেট খাবি? স্থাখ্, বিড়ি না—একেবার সিগারেট!'

একটা অহেতুক রাগে কানাইয়ের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল। সে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে সংক্ষেপে বললে, 'আমি বিড়ি সিগারেট খাই না।'

শশাঙ্ক সত্যি-সত্যিই একটা সিগারেট বার করেছিল পকেট থেকে, সেটা আবার পকেটে রেখে দিয়ে জিহ্বা ও তালুর সাহায্যে অদ্ভুত একটা আওয়াজ ক'রে মুখে শিস দিতে দিতে চলে গেল। তারপর সমস্ত বাসনমাজা শেষ ক'রে কানাই যখন ঘাট থেকে উঠে এসে বাড়ী ঢুকতে যাবে তখন শশাঙ্ক আশ্চর্য রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পাশ দিয়ে যেতে যেতে একটা কি কাগজ ওর হাফ প্যান্টের পকেটে ঢুকিয়ে দিয়ে মৃদু কণ্ঠে শুধু বলে গেল 'দিয়ে দিস ওকে।'

এর পর থেকে ঘটনাটা প্রায় প্রত্যহই ঘটতে লাগল। দুপুর বেলা সবাই যখন ইস্কুল অফিসে চলে যায়, গৃহিণী নিদ্রা দেন, তখন শচীরও চিঠি দেওয়ার সুবিধা হয়, আর জবাবটাও আসে নির্বিঘ্নে। কানাই একদিন জিজ্ঞাসা করে, 'রোজ রোজ কী এত চিঠি লেখ গা দিদিমণি?'

শচী বলে 'এই···মানে···একটা গল্পের মানে শিখে নিচ্ছি, বুঝলি না? ও খুব পড়াশুনো করে কি না!'

এই বলে সে মুখ টিপে হেসেছিল।

কানাই বলেছিল, 'শিখবে তা এত চুপি চুপি কেন?'

'কেউ জানলে আর বিদ্যেটা শেখা হবে না, বুঝলি না?'

এরপর একদিন—সেদিন গৃহিণী, নিমাইয়ের বৌ এবং বুলু তিনজনেই কোথায় বেড়াতে বেরিয়েছিলেন দুপুর বেলা, শুধু শচীই যায়নি খুব মাথা ধরেছিল বলে—কানাই পুকুরঘাটে আর শশাঙ্ককে দেখতে পেলে না। সেদিন

শচীও চিঠি দেয়নি ওকে। এটা বন্ধ থাকে শুধু রবিবার, কিন্তু রবিবার নয় অথচ চিঠি দেওয়া বন্ধ রইল কেন ভাবতে ভাবতে কানাই উঠে আসছে, এমন সময় দেখলে চোরের মত নিঃশব্দে ও ক্ষিপ্রপদে শশাঙ্ক বেরিয়ে যাচ্ছে তাদেরই বাড়ী থেকে। বুঝলে যে সশরীরে এসেছিল বলেই চিঠির প্রয়োজন হয়নি।

বাড়ী ফিরে বাসনগুলো নামিয়ে রেখে—খানিকটা চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল; তারপর যেন কতকটা চরম সাহসভরেই শচীর ঘরে ঢুকে প্রশ্ন করল, 'শশাঙ্কবাবু আজ বুঝি বাড়ীতে এসেছিল দিদিমণি?…চিঠি দিতে?'

'না রে! এমনিই এসেছিল—দেখা করতে! মানে…আমিই ডেকেছিলুম কি না।' বক্তব্যটা যেন গুছিয়ে বলতে পারে না। দরজার কড়াটা শক্ত ক'রে ধরে ফেলে শচী।

কানাইয়ের এক এক সময় মাথা বেশ খুলে যায়। সে প্রশ্ন করলে, 'তুমি বুঝি মিছে ক'রে মাথা ধরেছে বলে বাড়ী রইলে, ওর সঙ্গে দেখা করবে ব'লে?'

'না রে—মাথা ফেটে যাচ্ছে আমার।…কিন্তু তুই, তুই যেন কাউকে বলিস নি!'

তারপর কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক কোমল ক'রে বললে, 'তোর বইটা নিয়ে আয় কানু, আজ অনেকটা পড়িয়ে দেব!'

কিন্তু এর তিন চারদিন পরেই এক অঘটন। অম্বিকাবাবুর অফিসের ব্র্যাঞ্চ ম্যানেজার মারা যাওয়ায় অফিসে যাওয়া-মাত্র ছুটি হয়েছে, তিনি এদিক ওদিক ঘুরে দু'-একজনের সঙ্গে দেখা ক'রে কিছু বাজারহাট সেরে যখন বাড়ী ফিরেছেন তখন কানু গেছে পুকুর-ঘাটে বাসন মাজতে। তিনি কখন যে নিঃশব্দে এসে বাড়ীতে ঢুকেছেন তা কানুও দেখতে পায়নি, শশাঙ্কও লক্ষ্য করেনি। সে অন্যদিনের মতই কানুর পকেটে চিঠি দিয়েছে, কানুও আপনমনে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে বাসনের গোছা নামিয়ে রেখেই প্যাণ্টের পকেট থেকে চিঠিটা বার ক'রে অভ্যাস মত দিদিমণির ঘরের দিকে পা বাড়িয়ে একেবারে যেমন ঘাড় তুলে চেয়েছে,—চোখোচোখি হয়ে গেল কর্তার সঙ্গে।

কানু এর মধ্যে কোন অপরাধের অস্তিত্ব না জানলেও গোপনতার কথাটা জানত। সে অম্বিকাবাবুকে দেখেই থতমত খেয়ে কাগজটা আবার

পকেটে পুরতে গেল, আর সেইখানেই হ'ল যত গোলমাল। নিমেষে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠে অম্বিকাবাবু বাঘের মত লাফিয়ে পড়লেন ওর ওপর, 'ওটা কি রে? কাগজটা কিসের?'

তবুও হতভম্ব বিহ্বল কানাই ইতস্তত করছিল, অম্বিকাবাবু ছোঁ-মেরে কাগজটা কেড়ে নিলেন। পড়তে পড়তে তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠল, একটু গম্ভীরও হ'ল। এতটা তিনি সত্যিই কল্পনা করেন নি।

চিঠিপড়া শেষ ক'রে অত্যন্ত কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'এ চিঠি কে দিয়েছে?'

কানু একবার অসহায় ভাবে ঘরের দিকে চাইলে। সে আশা করেছিল দিদিমণি বেরিয়ে এসে ওকে রক্ষা করবে কিন্তু সেদিক দিয়ে কোন সাড়াই পাওয়া গেল না।

অম্বিকাবাবু এবার প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে উঠলেন, 'বল বল্‌ছি শিগ্‌গির, হারামজাদা শুয়ারকি বাচ্ছা!'

'শশাঙ্কবাবু।'

'কে শশাঙ্কবাবু?'

'ঐ যে, লম্বা বারাক্ বাড়ীটার এপাশের তলায় যে থাকে।'

'কা'কে লিখেছে!'

কানাই এবার আরও ফাঁপরে পড়ল। সে শচীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, কাউকে বলবে না। অথচ সামনে এই বিপদ।

অম্বিকাবাবু এক নির্মম চড় বসিয়ে দিলেন। পাঁচ আঙুলের দাগ চেপে বসে কানাইয়ের শ্যামবর্ণ মুখেও রক্তরেখা সৃষ্টি করল।

'বল্ শিগ্‌গির হারামজাদা। বল্ বলছি—নইলে সাঁড়াশি দিয়ে জিভ্ টেনে বার করব।'

ভয়ে, বিস্ময়ে এবং বেদনায় কানাইয়ের চোখের জল চলে গিয়েছিল, মুখের কথাও—সে শুধু আঙুল দিয়ে নিঃশব্দে ঘরের দিকটা দেখিয়ে দিলে।

'দিদিমণিকে?'

'হ্যাঁ।' ঘাড় নেড়ে জানালে কানু।

'কতদিন চলছে এসব? ও চিঠি দেয়, তোর দিদিমণি?'

কানুকে আবারও ঘাড় নাড়তে হ'ল।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি যেন ক্ষ্যাপা জন্তুর মত ঝাঁপিয়ে পড়লেন কানাইয়ের ওপর। কিল চড় লাথি ঘুষি কোথায় কিভাবে এবং কতগুলো যে পড়ল সে

হিসাব কেউই দিতে পারবে না। সেই শব্দে গৃহিণীর ঘুম ভেঙে গেল—তিনি আলুথালু ভাবে বাইরে এলেন, 'কি হয়েছে গো, কি হয়েছে, খুন ক'রে ফেলবে নাকি, কি হয়েছে বলই না ছাই! ওরে ও শচী, আয়না বাপু—'

তিনি বিপন্নভাবে অম্বিকাবাবুর হাত ধরে টানাটানি করতে লাগলেন। অগত্যা অম্বিকাবাবু ওকে ছেড়ে দিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'খুন কি, ওকে জ্যান্ত কুকুর দিয়ে খাওয়ালেও ওর উচিত শাস্তি হয় না। এই ছাখো—কীর্তি!'

চিঠিখানা তিনি গৃহিণীর নাকের সামনে মেলে ধরলেন। বিস্মিত হয়ে চিঠিখানা যতটা সম্ভব চোখ থেকে দূরে সরিয়ে ধরে পড়বার চেষ্টা করতে করতে গৃহিণীও লাল হয়ে উঠলেন।

'কী সর্বনাশ, এ চিঠি কে কাকে লিখলে গো?'

'কাকে আবার লিখবে—তোমার গুণবতী মেয়েকে! এই চিঠি-চালাচালি রোজ চলছে, দেখছ না আজকেই লেখা চিঠির উত্তর এটা! সে হারামজাদী গেল কোথায়, আজ যদি জ্যান্তে তার মুখে নুড়ো না জ্বালি ত আমি হারাণ চক্কোত্তির ছেলেই নই।'

'আঃ, কী করো!' শচীর মারই প্রথম সম্বিৎ ফিরে এল, 'এ সব কেলেঙ্কারি নিয়ে কি চেঁচামেচি করে? ছাখো দিকি, ছেলেটার ঠোঁট মুখ কেটে রক্ত পড়ছে।'

'রক্ত পড়ছে। একেবারে যে খুন ক'রে ফেলিনি এই ওর চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি।'

স্ত্রী তখনও বোধ হয় ঝি-চাকরের কথাই ভাবছেন। তিনি বললেন, 'ও ছেলেমানুষ, ও কি আর অত বুঝে করেছে? অত শত কি জানে ও?"

'না, তা জানবে কেন! ন্যাকা! কিছু যদি জানে না ত চিঠিখানা লুকোবার চেষ্টা করছিল কেন?

অকাট্য যুক্তির কাছে গৃহিণীকে হার মানতে হয়। কিন্তু ততক্ষণে শচী চোখ মুছতে মুছতে সদ্য ঘুম ভেঙে ওঠার ভাণ ক'রে এসে দাঁড়িয়েছে। অম্বিকাবাবু লাফ দিয়ে উঠে এসেই ওর চুলের মুঠিটা ধরে বললেন, 'হারামজাদী—এসব কি?'

এক ঝটকায় চুলের গোছাটা ছাড়িয়ে নিয়ে শচী ক্রুদ্ধ অথচ চাপা কণ্ঠে বলে উঠল, 'কি, হয়েছে কি? অমন ক্ষ্যাপা কুকুরের মত ক'রে বেড়াচ্ছেন কেন, ঠিক দুপুর-বেলায়!'

তারপর যখন চিঠিখানা তাকেও দেখানো হ'ল তখন একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললে, 'কে কাকে চিঠি দিয়েছে তা আমি কি জানি।'

'তোকেই ত লিখেছে!'

'সে যদি লেখে ত আমার দোষ কি? আমি যে লিখেছি তার প্রমাণ আছে কিছু?'

ওর এই শান্ত ভঙ্গীতে অম্বিকাবাবু যেন আরও জ্বলে উঠলেন। এবার এক প্রচণ্ড চড় কষিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমার চিঠির উত্তরে ও চিঠি লিখেছে। আমরা যেন কিছু বুঝি না, না? ন্যাকা! কতদিন ধরে চিঠি-চালাচালি চলছে তাই শুনি?'

চড়ের ধাক্কাটা সামলাতে শচীর কিছু সময় লাগল। কিন্তু যখন সামলে নিলে তখন সে-ও হিংস্র হয়ে উঠেছে। চাপা গর্জন ক'রে বলে উঠল, "চাকরের কথায় বিশ্বাস ক'রে আমাকে মারতে এসেছেন—? আমিও কিন্তু সহজে ছেড়ে কথা কইব না তা বলে দিলুম!'

অম্বিকাবাবুর মুখের ওপর যেন কে এক-ঘা চাবুক মারল! সঙ্গে সঙ্গে নিজের বিজয়টা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরে সঙ্কুচিত বাপের মুখের দিকে এক অগ্নি-কটাক্ষ হেনে শচী সগর্বে নিজের ঘরে চলে গেল।

কন্যাকে শাসন করতে না পারলেও কানাইকে শাসন ও তর্জনের কিছুমাত্র ত্রুটি রাখলেন না অম্বিকাবাবু। কানাইয়েরও হয়ত আত্মপক্ষ সমর্থনের কিছু ছিল, কিন্তু প্রহার ও মৌখিক শাসনের প্রচণ্ডতায় এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিল যে সে একটা কথাও বলতে পারলে না। দু-একবার বলবার ক্ষীণ চেষ্টা করলে বটে কিন্তু তাকে কথা বলবার কেউ অবকাশও দিলে না। কানাই আরওঅবাক হয়ে গিয়েছিল শচীর কাণ্ড দেখে। মানুষ যে এমন নির্লজ্জ মিথ্যাকথা বলতে পারে, এমনভাবে নিজের অপরাধের সব দায়িত্ব নিরীহ তৃতীয়-পক্ষের ওপর চাপাতে পারে তা কানুর জানা ছিল না; ওর এই অল্প কয়েক-বৎসরের জীবনে এ অভিজ্ঞতা হবারও কথা নয়। আর তাও ঐটুকু মেয়ে—শচী আর তার চেয়ে ক' বছরেরই বা বড়, এরই মধ্যে এত বুদ্ধি? অত দুঃখের মধ্যেও তারিফ না ক'রে পারল না কানাই। বিশেষত আরও অবাক হয়ে গেল যখন সন্ধ্যার প নিমাই আর বলাই বাড়ী ফিরে আর এক দফা শাসন শুরু করল। বলাই, যার অত করেছে সে, সে-ও আজ এত উঁচু থেকে ওর সঙ্গে কথা কইছে, আশ্চর্য! ওর কীর্তি-কাহিনী শুনলে কর্তা কি বলতেন?

কিন্তু কিছুই শোনানো হ'ল না কানাইয়ের। নীরবে সমস্ত লাঞ্ছনা এবং

মার সহ্য করলে সে। শুধু যখন খুব অসহ্য বোধ হয়েছিল তখন একবার মাকে মনে ক'রে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

নিমাই বললে, 'পুলিশে দাও।' বলাই বললে, 'কান ধরে সমস্ত গ্রাম ঘুরিয়ে আনো, যাতে আর কেউ ওকে চাকর না রাখে।' কিন্তু গৃহিণীই সবাইকে চুপ করিয়ে দিলেন এই কথা স্মরণ করিয়ে যে, এতে ক'রে নিজেদের কেলেঙ্কারীই ঢাক পিটিয়ে বেড়ানো হবে। তাঁদের মেয়ে যে নির্দোষ একথা কি আর কেউ ভাববে? যা গাঁ আর যা পাড়া, তাঁদের দোষ ধরবার জন্যে ত সবাই তৈরী হয়ে বসেই আছে!

তাঁর সতর্কতার আরও একটা বড় কারণ, সামনের বাড়ীর চাটুজ্জে-গিন্নী তাঁদের বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পূর্বে শুনিয়ে শুনিয়েই বলেছেন, 'খবর কে না জানে…নিজেরা একটু সাবধানে থাকলেই হয়।…মিছিমিছি বাচ্চা চাকরকে—।…ছি ছি, এই কি মানুষের ব্যাভার? দুধের বাচ্চাকে চোরের মার মারলে গা, শুধু শুধু—'

চাটুজ্জে-গিন্নীর প্রখর রসনার কথা সবাই জানত বলে শচীর মা প্রতিবাদ করতে সাহস করলেন না, বিশেষত কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে কী সাপ বেরোবে তার ঠিক কি!

যাই হোক—পারিবারিক শাসন-পরিষদে এই সাব্যস্ত হ'ল যে এ রকম চাকর অন্তত আর রাখা সম্ভব নয়! মতটা প্রবল ভাবে প্রকাশ করলেন অম্বিকাবাবুই, বলাই তারপর। নিমাইয়ের অত ইচ্ছা ছিল না, কারণ সে একটু আরামপ্রিয়, এতটা সেবা নতুন চাকরে করবে কি না ঠিক কি? কিন্তু অম্বিকা বাবু তাকে বুঝিয়ে দিলেন চুপি চুপি যে, পাড়ার লোক কতকটা যখন টের পেয়েছেই, তখন একটা কিছু করা দরকার, নইলে সবাই ভাববে যে এসব জেনেশুনেও তাঁরা অপরাধীকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

অগত্যা পরের দিন কানু তার সামান্য দু'একটা জামা ও প্যাণ্টের পুঁটুলি নিয়ে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়াল। এগুলোও কেড়ে রেখে দেবেন বলে অম্বিকাবাবু ভয় দেখিয়েছিলেন; বিশেষ ক'রে যেগুলো তাঁর দেওয়া, সেগুলো রেখে দেওয়ার প্রবল ইচ্ছা ছিল, শুধু স্ত্রীর ধমকে সেটা আর হয়ে উঠল না। তবে মাইনেটা তিনি দিলেন না। মাইনে সামান্য হলেও এই প্রায় দু-বছর সময়ের মধ্যে সে এক মাসের মাইনেও নেয়নি। কিন্তু অম্বিকাবাবু বললেন,

'মাসের মাঝখানে টাকা আমি পাব কোথায়? এ মাসের মাইনে কাটা যাবে নোটিশ দিস্‌নি বলে, আর চার মাসের মাইনে তোর জরিমানা। তার আগে যে বাটিটা হারিয়েছিলি ওবছর জষ্টি মাসে, তার দাম কেটে নেব। বাকী যা থাকে আসছে মাসের দোস্‌রা তেস্‌রা এসে নিয়ে যাস্‌। এখন এই একটা টাকা রাখ —যদি খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধা হয়।'

আর বেরিয়ে আসবার সময় সকলের অলক্ষ্যে শচী এসে আর একটা টাকা ওর হাতে গুঁজে দিয়েছিল।

কিন্তু এসব কোনদিকেই কানাইয়ের লক্ষ্য ছিল না। কিসের জরিমানা, নোটিশ কাকে বলে—সে কিছুই বুঝতে পারলে না, বোঝবার চেষ্টাও করলে না। অমানুষিক প্রহারে তার সর্বাঙ্গ জর্জরিত, জ্বরে তখন গা পুড়ে যাচ্ছে। দৃষ্টি ঝাপ্‌সা জ্বরের ধমকে, বুদ্ধি-বৃত্তিও যেন ঐ সঙ্গে ঝাপ্‌সা, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। কিছুই ভাল ক'রে বুঝতে পারছে না সে। কোথায় যাবে, কোথায় পরবর্তী আশ্রয় খুঁজবে কোনটাই ভেবে দেখেনি। আজ এই মুহূর্তে কোথায় একটুখানি শুয়ে পড়বে তারও ঠিক নেই—অথচ সেইটেই সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। ওর দেহ-মনের এমনই বিহ্বল অবস্থা যে, টাকাটা দিয়ে শচী ওকে কতখানি অপমান করলে তাও সে ভাবতে পারলে না, বাধাও দিলেনা, শুধু আচ্ছন্ন দৃষ্টি মেলে তার দিকে চাইলে মাত্র।

টল্‌তে টল্‌তে এক সময় আবার ওর সেই পুরাতন আশ্রয় মোক্ষদারই বাড়ী এসে হাজির হ'ল। মোক্ষদার আগের মতই স্থান সঙ্কীর্ণ, তবু সে ওরই জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে যেন অপেক্ষা করছিল। একই গ্রাম, কথাটা নানা রকমে পল্লবিত হয়ে কানে এসেছিল মোক্ষদার।

ওকে দেখেই সে বলে উঠল, 'কি করেছিলি রে, ওরা তোকে ধরে অমন মারলে? আমি অত ক'রে বলে টলে দিয়েছিলুম, তা এতকাল ত যাহোক্ টিকেও রইলি, এতদিন পরে এমন ক'রে আমার মুখটা পোড়ালি কেন?'

এতক্ষণের সমস্ত আঘাত যদি বা ওর সয়েছিল, এ অবিচারটা আর সইতে পারলেনা কানু, হাউ হাউ ক'রে কেঁদে উঠল, 'মাসি, তোমার পা ছুঁয়ে বল্‌ছি—আমি কিছু জানতুম না, ওরা বিনাদোষে আমাকে এমন ক'রে মারলে। আমি মরে গিয়েছি মাসি, আমার পিঠ ফেটে গিয়েছে—আমি আর বাঁচব না! মা আমাকে কেন এমন ক'রে ফেলে গেল—আমি কী করেছিলুম!'

সে কান্নার মধ্যে সত্যের এমন নিঃসঙ্কোচ প্রকাশ ছিল যে মোক্ষদার আর সংশয় মাত্র রইল না। সে ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে বললে, 'আহা-হা, দুধের বালককে এমনি ক'রেই মারে রে! সর্বাঙ্গে কালশিরে পড়ে গেছে, দাকড়া দাকড়া হয়ে ফুলে উঠেছে। কি পিচেশ রে, মানুষ না জানোয়ার! নিজের খান্কি মেয়েকে শাসন করতে পারেনি মিন্সে? দাঁড়াও, কাল গিয়ে আমি মারা বার করছি!'

মুখে চু-চু শব্দ ক'রে দুঃখ প্রকাশ করতে করতে ওকে নিজের বিছানাতেই শুইয়ে দিলে মোক্ষদা, তারপর মালিশ করবার জন্য তেল গরম করতে বসল।···

পরের দিন মোক্ষদা সত্য-সত্যই এক সময় অম্বিকাবাবুর বাড়ী গিয়ে হাজির হ'ল। দুঃখের পাঠশালায় পাঠ নেওয়া ওদের, অনেক অভিজ্ঞতায় এইটে শিখেছে যে, গলাবাজী না করলে এ পৃথিবীতে তাদের হক্ কোনদিনই পুরো আদায় হবে না।···তাই সে একেবারেই চক্রবর্তীদের চৌদ্দপুরুষের জন্ম সম্বন্ধে সংশয় প্রকাশ ক'রে বক্তব্য শুরু করলে। তার ঐ রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখে আর বিকট চীৎকারে অম্বিকে চক্রবর্তী ভয় পেয়েই গেলেন। প্রথম প্রথম একটু ধমক্ দেবার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেগতিক দেখে পুরো মাইনে এবং ডাক্তার-খরচা বলে আরও চারটে টাকা দিয়ে সন্ধি করতে বাধ্য হলেন। মোক্ষদা বিজয়গর্বে কানুর জন্য সাগু লেবু মিছরি কিনে বাড়ী ফিরে এল।

কিন্তু কানুকে নিজের বাড়ীতে স্থান দেবার অবস্থা ছিল না ব'লে মোক্ষদা নিজের গরজেই আর একটা চাকরি ঠিক ক'রে ফেললে। এবার একটা মুদির দোকানে। রায়পাড়ার মোড়েই রামলালের পুরাতন ও বিখ্যাত দোকান। মোক্ষদার সঙ্গে চেনাশুনো অনেক কালের, কুন্তীকেও সে চিন্ত। মোক্ষদার কথায় রাজী হয়ে গেল। কাজও ভাল; বাসন-মাজা কাপড়-কাচা নয়, দোকানেই কাজ করতে হবে; দোকানঘর ঝাঁট দেওয়া, ধুনো-গঙ্গাজল দেওয়া, আবার প্রয়োজন মত মাল বেচা—এই সব কাজ। রামলালের বাড়ী খেতে ও থাকতে পাবে, তিনটাকা মাইনে।

কানু একটু সুস্থ হয়েই কাজে লেগে গেল। অম্বিকাবাবুর দরুণ টাকাগুলো সে মোক্ষদার কাছে জমা রাখলে। মোক্ষদা প্রথমটা খুবই আপত্তি

করেছিল কিন্তু কানু যখন অসহায়ভাবে বললে, 'আমি কোথায় রাখব মাসি? যদি চুরি যায়?' তখন আর 'না' বলতে পারলে না।

রামলালের দোকান বড়। বহুকালের দোকান—রামলালের বাবার আমলের। তখন এত বড় ছিল না, রামলালের চেষ্টাতেই এতটা হয়েছে। এ জমিটাও রামলালের খাজনা করা, একহারা ইঁটের গাঁথুনী প্রকাণ্ড টিনের চালাঘরটাও ওদের। অর্থাৎ সম্পত্তি খুব কম নয়। একদিকে চাল-সমান চাল ও আটা-ময়দার বস্তা টাল দেওয়া থাকে। তার সামনে কাঠের মাচার ওপর দুভাগ করা, একদিকে ডাল-তেল-ঘি-চিনি-সুজি-গুড় প্রভৃতি, আর একদিকে বেনেমসলা ও সামান্য মনোহারীর দোকান সাজানো। দুটো কাঠের চৌকি, ভেতরে পয়সা গলিয়ে ফেলবার জায়গা সমেত; তার ওপরই বসে বেচাকেনা হয়। দুটো চৌকির সামনে দুটো কাঁটা ঝোলানো ওপর থেকে, ওজনের জন্য। মসলার কাঁটাটা অপেক্ষাকৃত ছোট। আর একপাশে একটা কাঠের তক্তাপোশে একখানা পুরু রবার ক্লথ পাতা, তাতে একটা হাতবাক্স আর একখানা খেরো-বাঁধানো খাতা নিয়ে বসে থাকে রামলাল সারাদিন। রাত্রে সেখানেই সে শোয়। অন্য কর্মচারী বিজয়, সেও কাছে থাকে। আগে চাবি দেওয়া থাকত রাত্রে, বার-দুই পর পর চুরি হওয়াতে এখানে শোওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। তক্তাপোশের পাশেই ঘুলঘুলির মত একটি জানলা আছে বলে বিশেষ অসুবিধা হয় না গরমের দিনেও।

এ দোকানটা যে এর আগে কানু দেখেনি তা নয়। তবে এত ভাল ক'রে দেখেনি। এখন অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে সে দেখে। কতগুলো বস্তা, কত মণ চাল ওগুলো? মনে মনে একটা হিসাব করার চেষ্টা ক'রে হাল ছেড়ে দেয় কানু। কেমন ক'রে ওজন করে ওরা অনায়াসে—এ যেন ওর কাছে এক সমস্যা। কোন্‌টা ছটাক আর কোন্‌টা কাঁচ্চা কিংবা তোলা, নতুন ক'রে চিন্‌তে চেষ্টা করে সে। কাকে কুতিলা বলে আর কাকে শুট্‌ বলে; ইসবগুল ও ইসবগুল ভূষিতে কি তফাৎ, মনে ক'রে রাখতে সে গলদ্‌ঘর্ম হয়। টিনের গায়ে লেখা আছে বটে নামগুলো একটা ক'রে কাগজের লেবেলে, কিন্তু এমনই বিবর্ণ হয়ে গেছে যে কানুর পক্ষে পড়া দুঃসাধ্য, বিশেষ ক'রে তার যুক্তাক্ষরের পাঠ পর্যন্ত পড়াই এগোয়নি।

তবে একটা সুবিধা এই যে, ঠিক কেনা-বেচার জন্য তাকে রাখাও হয় নি। এটা-ওটা ফরমাশ খাটারই কাজ বেশি। ঘর দোর ঝাঁট দেওয়া, কাঠের বড় বারকোশগুলো (মালপত্র যার ওপর ওজন ক'রে রাখা হয়),

আর পাল্লা বাটখারা সকালে ধুয়ে-মুছে দেওয়া, গুড়ের কলসীর পাশে একটা ছোট বালতি ক'রে জল রাখা; বস্তা থেকে ছোট ধামা ক'রে মাল তুলে এনে সামনের ধামাতে সাজিয়ে রাখা, নানারকমের জিনিস বিক্রেতাদের হাতের কাছে যোগানো—এম্‌নি সব রকমারি কাজ। এর সঙ্গে মনিব ও কর্মচারীদের ফরমাশ-খাটা, চা খাবার এনে দেওয়া, খাবার-জলের ব্যবস্থা করা, রাত্রে দোকানঘর ও তক্তাপোশ পরিষ্কার ক'রে তার ওপর বিছানা বিছিয়ে দেওয়া, এসব ত আছেই। ভারী কাজের অন্য লোক আছে বটে তবু ওর খাটুনিও কম নয়। দোকানের কোণগুলো জঞ্জালে ভর্তি হয়ে আছে, আরশুলা ইঁদুরের রাজত্ব। সেগুলো পরিষ্কার করতে করতে কোমর বেঁকে যায় কানুর, আরশুলা মারতে মারতে হয়রানি। তবু বাড়ীর কাজের চেয়ে মোটামুটি ওর এ কাজ ভালই লাগে।

কিন্তু মানুষগুলোকে কানুর তত পছন্দ হয় না।

সে ছাড়া আরও দুজন কর্মচারী ছিল। এরা পুরনো লোক। তার মধ্যে একজন দেশে গেছে তখন—সে জায়গায় এসেছে রামলালের ভাইপো। আর একটি বিজয়। বছর উনিশ-কুড়ির দোহারা গড়নের ছোক্‌রা, চেহারা চলনসই, কিন্তু তার বেশভূষার পারিপাট্য দেখে কানু অবাক হয়ে যায়। যেমন ঢেউখেলানো টেরি, তেমনি দুহাতের আঙুলে চারটে আঙটি। দোকানের কাজ সেরে যখন সে বাইরে বেরোয় কিংবা বাড়ী যায় তখন তার শার্ট ও জুতোর বাহার দেখেও তাক্ লাগে। দোকানের চাকরীতে এত পয়সা? কে জানে বিজয়দা কত মাইনে পায়—মনে মনে ভাবে কানু—ওরও অত মাইনে কি হবে একদিন তাহ'লে?…এরা ছাড়া একটা হিন্দুস্থানী মুটে আছে। মোট বইবার আশায় সে দোকানের বাইরেই বসে থাকে। এখানে যখন ভারী বস্তা সরাবার বা ওজন করবার প্রয়োজন হয় তখন সে-ই করে। অবশ্য রামলালও যে সব সময় খাতা নিয়ে বসে থাকে তাও নয়, দরকার হ'লে সে-ও দোকানদারী করতে বলে যায়।

এর ভেতর কর্তার ভাইপো ভোঁদাকেই কানুর যা একটু ভাল লাগে। সেও বিজয়েরই সমবয়সী হবে। রং ফরসা, ছিপছিপে—বেশ সুশ্রী চেহারা। তার কথাবার্তাও ভাল, যখন কোন কাজের ফরমাস করে, ভদ্রভাবেই করে—'কানাই, ওটা দে না ভাই' কিংবা 'কানু, এটা দিতে পারবি?' এই ভাবে। বিজয়ের কথাবার্তার ধরণ বড় বিশ্রী। প্রথম থেকেই তার চাল-চলন কানুর খারাপ লাগে। তার ভাবভঙ্গীর মধ্যে কেমন একটা মালিকানা-ভাব আছে! অর্থাৎ দোকানটা যেন তারই এবং কানু যেন তারই চাকর! তা ছাড়া আর

একটা কী ওর ভাবভঙ্গীর মধ্যে আছে—কেমন একটা বিষাক্ত, সর্পিল ভাব, সেটা ঠিক বুঝতে না পারলেও অস্বস্তির কারণ হয়।

সব চেয়ে অদ্ভুত রামলাল নিজে।

ক্ষয়া-ঘষা লোক, একটু হাঁপানির টান আছে। ময়লা গেঞ্জির ওপর কোঁচার খুঁটটি জড়ানো, শীতকালে সেটা আবার মাথাতেও ওঠে—আর মুখে সর্বদা একটা বিড়ি। ওর মুখের ভাব দেখে মনে হয় রাতদিন যেন সে সমস্ত লোকের ওপর বিরক্ত হয়ে আছে। হাসে কদাচিৎ—হাসলেও শুধু খদ্দেরের সামনে। ওরও কথার ধরণটা ভাল নয়, গলার অওয়াজটাই কেমন যেন বিরক্ত আর ঝগড়াটে। পয়সার ওপরে অদ্ভুত মায়া। সমস্ত মন একাগ্র হয়ে থাকে পয়সা রাখবার ও রেজকী ফেরৎ দেবার শব্দে। হিসাব ও টাকা গোনা—এতে যেন ক্লান্তি নেই। খদ্দেররা যখন টাকা হাতে দেয় তখন যে আকুল-আগ্রহে হাত বাড়ায় রামলাল, ওর দৃষ্টিতে যে লোলুপতা ফুটে ওঠে, সেদিকে চেয়ে যেন কানুর কেমন গা শির্-শির্ ক'রে ওঠে।

ওর সঙ্গে প্রথম ব্যবহারটাই যেন কেমন কেমন! সে কথাটা মনে পড়লে ওর আজও হাসি পায়।

মোক্ষদা ওকে সঙ্গে ক'রে এনে যখন দোকানে দিয়ে বলে গেল, 'এই নাও গো, রামলালদাদা, এই রইল! ছেলেমানুষ, মাথার ওপর কেউ নেই! একটু নজর-টজর রেখো বাপু!' তখন ওর চৌকির চার পাশে বিস্তর লোক। রামলাল মুখ তুলে তাকালও না। অথচ মোক্ষদারও দাঁড়াবার অবকাশ নেই—পাঁচ বাড়ীর কাজ তার মাথায়, সুতরাং সে কথাগুলো বলেই চলে গেল।

কানু একধারে দাঁড়িয়েই আছে। অনেকক্ষণ পরে রামলাল একবার ওর দিকে চোখ তুলে তাকাল মাত্র—কিন্তু সেও সম্পূর্ণ অন্যমনস্কভাবে। কী কাজ করবে, ওর এই কাপড়চোপড়ের পুঁটুলিটাই বা কোথায় রাখবে—কিছুই বুঝতে পারলে না কানু। এমন কি, কাজ হ'ল কিনা সেই বিষয়েই দারুণ সংশয় দেখা দিল ওর মনে। মাসী ত বলে চলে গেল—কিন্তু লোকটা কানে সে কথা শুনেছে কিনা তারই বা ঠিক কি? এখনই হয়ত মুখ তুলে বলবে, 'কে তুই, কি চাস?' তারপর নামটা শুনে চিনতেই পারবে না হয়ত—চিনলেও বলবে, 'না না—লোক টোক ত আমাদের দরকার নেই! কে বলেছে লোকের কথা? যা পালা।…আচ্ছা ঝামেলা!'

খদ্দের যারা ছিল অবশেষে তারা সকলেই একে একে চলে গেল কিন্তু তবু রামলাল আর মুখ তুলে তাকায় না. মুখে বিড়ি হাতে কলম—খাতার ওপর

ঘাড় গুঁজে বসে কি লিখছে। কানুর অস্তিত্বই যেন তার জানা নেই। অকস্মাৎ একবার খাতা থেকে মুখ তুলে তাকাল রামলাল ওর দিকে, তারপর ওকে কিছু না বলে বিরক্ত মুখে ভাইপোর দিকে তাকিয়ে বললে, 'এই ভোঁদা—ছোঁড়াটা হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে কেন? কাজকর্ম করুক না!'

ফলে, ভোঁদা কোন জবাব দেবার আগেই বিজয়ের কাছ থেকে এক ধমক, 'এই ছোঁড়া, অমন কাঠের পুতুলের মত দাঁড়িয়ে কেন? এখানে কি তোমাকে রূপ দেখবার জন্যে ডাকা হয়েছে?'

দিশাহারা হয়ে কানু ওর পুঁটুলিটা চৌকির ওপর ফেলে তাড়াতাড়ি বিজয়ের কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

এধারে রামলাল ততক্ষণে হাঁ-হাঁ ক'রে উঠেছে, 'নিয়ে যা, নিয়ে যা। সরা এখুনি। লক্ষ্মীর বাক্সের কাছে তোমার ঐ ময়লা কাপড়ের পুঁটুলি! সরা এখান থেকে।'

কানু আবার ছুটে এসে পুঁট্‌লিটা তুলে নিয়ে ভয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, 'এটা কোথায় রাখবো?'

খিঁচিয়ে উঠল রামলাল, 'আমার মাথায়! ওরে এই ভোঁদা, দে না ওকে বাড়ীতে পাঠিয়ে, ওগুলো রেখে আসুক আর বলে আসুক যে এবেলা থেকে খাবে ওখানে!'

এর পর চার পাঁচ দিন পর্যন্ত রামলাল সোজাসুজি ওকে কোন ফরমাশ করেনি, সর্বদা ভোঁদা কিংবা বিজয়ের মারফৎ করেছে।

মাসখানেক চাক্‌রী করার পর কর্তার আর একটি ব্যাপার দেখে কানু বিস্মিত হ'ল। লক্ষ্য করলে যে বিজয় সম্বন্ধে কর্তার একটা অহেতুক উদারতা আছে, যেন ইচ্ছে ক'রেই সে ওর দিকে চোখ বুজে থাকে। মাইনে অবশ্য বেশি নয়। মাইনে যেদিন হ'ল কানু সেদিন দাঁড়িয়ে সেখানে, তেরো টাকা মাইনে মোটে। তাতেই অত নবাবী? অবশ্য বিজয়ও রামলালের বাড়ী খায় —তাহ'লেও—চলে কি ক'রে? কানুর কাছে এটা রীতিমত সমস্যা হয়ে ওঠে ক্রমশ।

হঠাৎ একদিন বিজয় কর্তার কাছে আবদার ধরলে সে একটা নতুন সাইকেল কিনবে—বেশি নয়, মোটে ত্রিশটি টাকা হ'লেই হবে। কর্তা প্রথমটা ত শিউরে

উঠল, 'তিঁ-রি-শ টা-কা! বলিস্ কি, আমার কি ব্রহ্মোত্তর জমিদারী আছে? না, না, ওসব হবে টবে না।' কিন্তু বিজয়ের পীড়াপীড়িতে শেষ অবধি দিলেও তিনখানা দশটাকার নোট বার ক'রে।

দিয়েই অবশ্য সন্দিগ্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'কিন্তু ত্রিশ টাকাতে নতুন সাইকেল কি ক'রে হবে? শুনেছি ত পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা দাম একটা সাইকেলের!'

'কে বললে আপনাকে? সে ভাল সাইকেল পঞ্চাশ পঞ্চান্ন টাকা। এ অত ভাল নয়। সাইকেল হ'লে কত সুবিধা হবে, বড়বাজারে আপনার মাল গস্ত করতে যাবো যখন, তখন আর ট্রেণ-ভাড়া ট্রাম-ভাড়া কিচ্ছু লাগবে না।'

টাকার কিছুটা অন্তত এ ভাবে উশুল হ'তে পারে—এই সম্ভাবনায় রামলাল খানিকটা সান্ত্বনা পেলে। সাইকেলটা এল পাড়ার এক সাইকেল-মেরামতী দোকানের মারফৎ, তাকে—মানে সে দোকানের মালিক মাখনকে কানু চেনে। একদিন কী একটা কাজে বিজয় তাকে পাঠালে মাখনের দোকানে, বোধ হয় একটা পাম্প আনতে, কানুর কানে গেল রায়পাড়ার বিজনবাবু বলছেন মাখনকে, 'মন্দ নয় রে মাখন সাইকেলটা—কিন্তু যা দাম বলছিস্, একটু কমা না, তাহ'লে নিয়ে নিই!'

মাখন জিভ্ কেটে বললে, 'পাগল, ওতে আমার লাভ কি? আমি কি ও থেকে লাভ করব? এই ত বিজয় নিয়েছে—সেও ঐ পঞ্চান্ন টাকাই দিয়েছে।'

কানু অবাক হয়ে গিয়ে বোকার মত প্রশ্ন ক'রে বসে, 'পঞ্চান্ন টাকা মাখনদা? ...বুকে বললে তিরিশ?'

মাখন ... 'তোর অত কথায় দরকার কি রে ফাজিল ছোঁড়া ... ব্যক্তিগত ...বিদ্বেষ, বা ...একেবারে! কোন কথায় থাকবি না তুই।'

...হট্ করতে লাগল সে। ...শেষে একদিন আর সত্যি-সা... ...একদিন বিজয়...

অগত্যা কানুকে চুপ ক'রে ... বিজয় সম্বন্ধে ওর কৌতূহল আরও বেড়ে যায়। পৃথিবীটা সম্বন্ধে একটু একটু ক'রে ওর চোখ ফুটছিল। এমনি লেখাপড়া যার হয় না—প্রকৃতি তার জন্য নিজে একটা শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। সেটা আপনিই হয়, কতকটা মানুষের অজ্ঞাতসারেই। এর পাঠ লেখা আছে জীবনের খাতায়, প্রতিদিনের ঘটনার আখরে। মানুষ নিজের সমস্ত সজাগ ও সতর্ক ইন্দ্রিয় দিয়ে সে পাঠ গ্রহণ করে।

কানুও তাই কেমন ক'রে আঁচ করতে পারলে যে, বিজয়ের এই সামান্য মাইনে জমিয়ে এত নবাবি করা চলে না, কোথায় একটা ফাঁকি আছে এর ভেতরে। বিশেষত বিজয়ের মা প্রায়ই দোকানে এসে ছেলের কাছ থেকে

খরচার টাকা চেয়ে নিয়ে যায়—তাও কানু লক্ষ্য করে। ওর আরও দুই অপোগণ্ড ভাই আছে—সংসারের খরচ কম নয় ত।

অবশ্য কয়েকদিন চোখটা খুলে রাখতেই কানু ব্যাপারটা বুঝতে পারলে।...

যে কাঠের চৌকিটাতে বসে বেচাকেনা করে বিজয়, পয়সা রাখবার সময় সবগুলো চৌকির ফুটোয় ফেলে না, আড় চোখে এদিক ওদিক তাকিয়ে দুটো একটা সিকি দোয়ানি পাশে ফেলে দেয়। ওর ডান দিকে থাকে তেল, ঘি, নারকেল তেল আর রেড়ির তেলের টিন—ফলে সেখানটা সর্বদাই তেল ও ময়লায় পুরু হয়ে থাকে। পয়সা পড়লে বিশেষ আওয়াজ হয় না। এই ভাবে সারাদিন ধরেই সেখানে জমা হয়। আবার এগুলো সংগ্রহ করার পদ্ধতিও অভিনব। দুপুরবেলা খেতে যাবার সময় তালা দিয়ে যাওয়া হয় দোকানে, খাওয়া শেষ ক'রে সবাই যখন একটু বিশ্রাম করে তখন বিজয় চাবি চেয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে আগেই—ভুরুটা কুঁচকে বলে, 'দুপুর বেলা মেয়েমানুষদের মত ঘুমোনো আমার পছন্দ হয় না। তার চেয়ে যাই, আমি ততক্ষণ মালগুলো সামলে গুছিয়ে ফেলি।'

হয়ত কোন কোনদিন রামলাল বলে, 'তা এ ছোঁড়াটাকে নিয়ে যা না সঙ্গে, ও তবু কতকগুলো হাতের কাছে এগিয়ে দিতে পারবে—'

অর্থাৎ কানুকে। [illegible]

কিন্তু বিজয় উদারভাবে প্রত্যেকদিনই রেহাই দিয়েছে। [illegible] 'না না, ছেলেমানুষ, ভূতের মত খাটে, একটু [illegible]

এই উদারতাতেই কানুর একটি [illegible] হারের সঙ্গে এ উদারতাটা যেন মোটেই মে[illegible]। সত্যিই ভূতের মত খাটে, তখন এ সব কথা একবার [illegible] পর কর্তার আর [illegible] না বিজয়ের মুখে, গালাগালি আর খিঁচুনি শুনতে শুনতেই দিন যায়। এই ত সেদিনই বলেছে ওকে, 'এ ছোঁড়ার মত এতবড় ফাঁকিবাজ আর কুঁড়ে যদি দুটি দেখেছি।' তবে এখন এমন মিষ্ট কথা আসে কেন!

কানু তাই একদিন নিঃশব্দে বিজয়ের পিছু পিছু যায়। বিজয় পাশের দোরের তালা খুলে ভেতরে ঢুকে সামনের ঝাঁপ দুটো খোলবার চেষ্টা না ক'রেই মাচার ওপরে উঠে যায়। ঝাঁপের ফুটো দিয়ে উঁকি মেরে দেখে কানু যে, চৌকিটার ওপর উপুড় হয়ে পয়সাগুলো কুড়োচ্ছে বিজয়। সবগুলো সংগ্রহ ক'রে তাড়াতাড়ি একটা কাগজে মুড়ে পকেটে রেখে, জামাটা

খুলে সেই পিছনের দিকের একটা হুকে টাঙিয়ে রেখে বাইরে আসে সে ঝাঁপ খুলতে।

কানু তখন সাড়া দিয়ে প্রকাশ্যেই এগিয়ে এসেছে।

বিজয় যেন ওকে দেখে থতমত খেয়ে যায়, 'কি রে, তুই এলি কেন এখন হঠাৎ? কতক্ষণ এলি?' শেষের দিকে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে।

কানুও আর কাঁচা নেই। সে কণ্ঠে যথাসম্ভব নিরাসক্তি টেনে এনে বলে, 'এই ত। ঘুম পেল না আজ, তাই ভাবলুম যে, যাই, বিজয়-দা রোজ একা একা খাটে—!'

বিজয় তীব্র দৃষ্টি মেলে ওর মুখের দিকে চেয়ে যেন কথাটার সত্যাসত্য বোঝবার চেষ্টা করে কিন্তু কানুব মুখ দেখে কিছুই বোঝা যায় না।

এর পর কানু পড়ল মহাসমস্যায়। কথাটা কর্তার কানে তোলা উচিত হবে কিনা সে ভেবে পায় না। 'চুকলি' খাওয়াটা যে খুব বদর্য ব্যাপার তা কানু শৈশবেই খেলার সাথীদের কাছ থেকে শুনে আসছে—যখনও ওর ইজের পরার প্রয়োজন হয় নি, তখন থেকে। সেই চুকলি খাবে এতদিন পরে? ওর কি? যাদের চুরি হচ্ছে তারা যদি চোখ বুজে থাকে ত ওর কি গরজ?

তবু কোথায় যেন একটা কাঁটার মত খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে কথাটা। বিবেক নয় হয়ত, হয়ত এটা বিজয়ের প্রতি তার রূঢ় আচরণের জন্যই বিদ্বেষ, কিন্তু কত কথা কানু জান্‌ত না। শুধু বিজয়কে ধরিয়ে দেবার জন্যে মনে মনে ছট্‌ছট্‌ করতে লাগল সে।

অবশেষে একদিন আর সাত্য-সত্যিই থাকতে পারলে না। তার কারণ অবশ্য স্পষ্টতই ব্যক্তিগত বিদ্বেষ, বা কানুর নিজেরই ভাষায়, গায়ের ঝাল! কী একটা কারণে হঠাৎ একদিন বিজয় ওকে বার-কতক 'এই ছোঁড়া', 'এই উ ল্লুক' প্রভৃতি বিশেষণে অভিহিত . রাতে কানু রাগের চোটে মন স্থির ক'রে মাঙ্গলে। দুপুর বেলা ভোঁদাকে আড়ালে ডেকে চুপি চুপি বললে, 'মেজও তা একটা কথা বলব, কাউকে বলবে না বলো?

। শ্রেয় । থা রে?' ভোঁদা প্রশ্ন করে।

অথচ খ বিস্ফারিত করে কানু সংবাদটা দেয়, 'বিজয়দা রোজ এত এত মাইনে, এ করে! আমার নাম ক'রো না মাইরি, তাহ'লে মেরে ফেল্‌বে ও এমন আশ্রয়া

অগত্যা ক'রে জান্‌লি?'

অসম্ভব ব্যাপার সব খুলে বলে। বার বার ওর হাত ধ'রে মিনতি করে, 'হেই

মেজদা, আমার নাম ক'রো না কারুর কাছে, মাইরি, মরে যাবো তাহ'লে।'

বলা বাহুল্য ভোঁদা তখনই সে প্রতিশ্রুতি দেয়, বলে, 'পাগল হয়েছিস্? আমিই হাতে-নাতে ধরব। কাকা যেমন গাড়োল, ওঁকে বুঝিয়ে দেয় যে ঐ আংটিগুলো ওর বাবার ছিল, আর উনি অমনি বোঝেন। ঠিক হয়েছে, আজ ধরব আমি নিজে।'

আরও বলা বাহুল্য যে, কানুর কাছে প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও পরমুহূর্তেই তার কাকার কাছে গিয়ে কথাটা কানুর নাম ক'রেই বলে দেয়!

রামলাল বিজয়কে যতই স্নেহ করুক, টাকা চুরির কথায় ওরও চোখ হিংস্র হয়ে ওঠে। তবু ভোঁদা যখন প্রস্তাব করে তার সঙ্গে যাবার, তখন, কী জানি কি ভেবে রামলাল পিছিয়ে আসে। বলে, 'তুইই যা, বরং তোর দাদাকে সঙ্গে নে। তোরা মারধোর করবি হয়ত, ও আমার ভাল লাগে না।'

ভোঁদার দাদা দোকানে যায় না, জমিজমাই দেখে—তবু চুরিধরার ব্যাপারে সে যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে সঙ্গে চলল। রামলাল ওদের দিকে কুণ্ঠিত ভাবে চেয়ে বসে রইল, না পারল ওদের নিষেধ করতে, না পারল সঙ্গে যেতে। যদিচ এর ভেতরে এত সঙ্কোচ বা কুণ্ঠার কি কারণ থাকতে পারে কানু বুঝতে পারল না।

কানু যে ভাবে পিছু নিয়েছিল সেইভাবে পিছু নিতেই ব্যাপারটা হাতে হাতে ধরা পড়ে গেল। বিজয় প্রথমটা উদ্ধতভাবে অস্বীকার করবার চেষ্টা করেছিল, বোঝাতে চেয়েছিল পয়সা রাখতে গিয়ে ওগুলো আপনিই পড়ে যায় তা বিজয় জানে, তাই মধ্যে মধ্যে তুলে বাক্সতেই রেখে দেয় সে—কিন্তু ছোট-খাটো একটা প্রহারের পালা শেষ হ'তে না হ'তে ওর তেজ মিইয়ে গেল। তার ওপর পকেট হাতড়ে রুমালে বাঁধা এমনি তিন-চার দিনের জমা রেজ্‌গি পাওয়া গেল—প্রায় সাত আট টাকার। তার সঙ্গে পাওয়া গেল পোস্ট-অফিস সেভিংস ব্যাঙ্কের পাস-বই, তাতে তিনশ' টাকার ওপর জমা।

আর এক দফা মার দেওয়ার পর ভোঁদা প্রস্তাব করলে, 'ওকে বেঁধে রাখো। পুলিশে দিতে হবে।'

বিজয় কিন্তু এতে আর ভয় পেলে না, বরং অদ্ভুত একটা জোরের সঙ্গে না বললে, 'দাও না পুলিশে। তবে কাকাকে জিজ্ঞেস করো তার আগে। পুলিশে গেলে আমিও ছেড়ে কথা কইব না।'

আশ্চর্য এই যে রামলালও সত্যি সত্যি ওকে ছেড়েই দিলে শেষ পর্যন্ত।

বললে, 'যাক গে, এতদিনের কর্মচারি, মায়া পড়ে গিয়েছে একটা, ছেড়ে দে ওকে।'

বিজয় যাবার সময় চোখ পাকিয়ে কানুর দিকে তাকিয়ে হিস্ হিস্ ক'রে বলে, 'তোমার এই কাজ! উল্লুক!'

'বেশ করেছি, চোর কোথাকার! ধরিয়ে দিয়েছিই ত! কী করবে করো না।'

গায়ের ঝাল ঝেড়ে চরম সাহসে ভর ক'রে কথাগুলো বলে কানু, বলে হাঁপাতে থাকে।

৬

কানুর ওপর হুকুম হ'ল, সেইদিন থেকে তাকেই দোকানে শুতে হবে মনিবের সঙ্গে। সে অতঃপর বেচাকেনাও করবে—এবং সে জন্যে ওর মাইনে বেড়ে মোট পাঁচটাকা হ'ল। এতদিনের চুরি ধরে দেওয়ার জন্যে নগদ বখ্শিশও পেলে, একটা টাকা।

পদোন্নতিতে খুশী হ'ল বটে কানু, তবে ঐ দোকানে শোবার প্রস্তাবটা ওর ভাল লাগল না। এতটুকু চৌকির ওপর বিছানা পড়ে, মশারিটা আরও ছোট, হাওড়ার হাটের মশারি। সুতরাং মনিবের গা ঘেঁষে শোওয়া ছাড়া উপায় নেই। রামলালের মুখে বিশ্রী বিড়ির গন্ধ, কাছে থেকে কথা কইলে গা বমি-বমি করে কানুর। তার ওপর ঐ শুকনো নোংরা মানুষটা, হাঁপানির মত ঘন ঘন নিঃশ্বাস নেয় আর কেমন এক রকম ক'রে তাকায়। ওর কাছে, ওর গায়ে গা ঠেকিয়ে শুতে হবে? মনে হলেও যেন গা-শিউরে উঠে। তার চেয়ে ওর ছেঁড়া মাদুরের ওপর ছেঁড়া কাঁথায় শোওয়া যে ছিল ঢের ভাল। মশার জন্যে গরমেও তাকে আগাগোড়া মুড়ি দিয়ে শুতে হয়, তবু আজ মনে হচ্ছে সে-ও ছিল শ্রেয়।

অথচ অস্বীকার করবার উপায় নেই। খাওয়া-পরা থাকা এবং পাঁচটাকা মাইনে, এ-বাজারে দিচ্ছে কে? আর কোথাও থেকে অন্য চাকরি খুঁজবে, এমন আশ্রয়ই বা কোথায়?

অগত্যা রাত্রে যতটা সম্ভব দেরি ক'রে, অনেক ইতস্তত ক'রে—কোন অসম্ভব ব্যাপারে শেষকাল অবধি হয়ত মনিবের মত-পরিবর্তন হ'তে পারে

এই আশায় থেকে, এক সময় ঘোরতর অনিচ্ছাসত্ত্বেও শুতে যেতে হয়। কোন মতে বিছানায় ঢুকে মশারিটা গুঁজে নিয়ে এক পাশ ঘেঁষে শুয়ে পড়ে সে।

রামলাল আগেই শুয়ে পড়েছে। বিছানায় শুয়ে শুয়েই বিড়ি টানছিল, নিঃশব্দে আরও খানিকটা টানবার পর মশারির একটা কোণ তুলে পাশের জানলা দিয়ে পোড়া বিড়িটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিয়ে প্রশ্ন করলে, 'এতক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে করছিলি কি?'

কানু কী উত্তর দেবে ভেবে পেলে না। অগত্যা চুপ ক'রেই রইল।

রামলাল পুনশ্চ প্রশ্ন করলে, 'দোর বন্ধ করেছিস্ ত ভালো ক'রে তালা টেনে দেখেছিস?'

'হ্যাঁ।'

'মশারি গুঁজেছিস ত? নইলে মশা ঢুকবে। আমি আবার একটা মশা ঢুকলেও ঘুমোতে পারি না।'

মশারিতে ফুটোর অভাব নেই—এতে যে মশা ঢোকে না, এ কথা বিশ্বাস করা কানুর পক্ষেও শক্ত। তার হাসি পেতে লাগল। তবু প্রাণপণে হাসি দমন ক'রে সে বললে, 'গুঁজেছি।'

এবার রামলাল ওর দিকে পাশ ফিরে শুলো। অর্থাৎ দাঁতের রোগের গন্ধের সঙ্গে বিড়ির গন্ধটা মিশে যে কদর্য গন্ধের সৃষ্টি হয়, সেটা আরও কাছে এল। দাঁতের রোগের খবরটা জানে না কানু, মনে করে বিড়িরই গন্ধ ওটা, সে প্রাণপণে মশারিতে নাকটা গুঁজে বাইরের হাওয়া নেবার চেষ্টা করে। সে হাওয়াও তেল-ঘি-গুড়পচার গন্ধের সঙ্গে আরশুলা ও ইঁদুরের নাদি মেশানো গন্ধে ভারী হয়ে আছে—তবু কানুর মনে হয় যে সে-ও ঢের ভাল।

খানিকটা নিঃশব্দে শুয়ে থাকে দুজনেই। রামলাল যে ঘুমোয়নি কানু তা টের পায়, ওরও ঘুম হয় না। অন্যদিন বিছানায় শোবার তর সয় না, অথচ আজ সে ঘুম যেন কোথায় গেছে! কিন্তু রামলালও জেগে আছে কেন?

একটু পরে রামলাল একটা হাত রাখল ওর গায়ের ওপর। শীর্ণ, শীতল হাত—স্পর্শটাও যেন সর্পিল, ক্লেদাক্ত।

সে স্পর্শে কানু শিউরে উঠে। এতটা ঘনিষ্ঠতা ওর ভাল লাগে না।

কিন্তু হাত সরিয়ে দিতেও ওর সাহসে কুলোয় না।

রামলাল ওর গায়ে আল্‌তো আল্‌তো হাত বুলোতে থাকে—কাঁধে, পিঠে বুকে, পেটে। এ কী বিপদ? ঠাণ্ডা, কর্কশ হাত—এ আদর ওর একটুও ভাল লাগে না।

'অত ঘামছিস কেন, হ্যাঁ রে? আজ ত তত গরম নেই!'

রুক্ষ কণ্ঠস্বর কোমল আর মৃদু করবার চেষ্টায় যেন ভেংচি কাটতে থাকে।

সত্যিই কানু ঘামছিল। গরমের জন্য নয়—রামলালের এই আদরের অস্বস্তিতেই।

রাত নিষুতি, ঘরের মধ্যে দুটি জীবন্ত প্রাণী আছে তা বোঝবার উপায় নেই, শুধু শুনতে পাওয়া যাচ্ছে ভারী নিঃশ্বাসের শব্দ! এলোমেলো অনেক কথাই কানুর মাথায় ভিড় ক'রে আসে—ভেতরে গুমোট গরম, তার ওপর জমাট অন্ধকারে কানু যেন বিভীষিকা দেখে···

রামলালের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে পচা দুর্গন্ধ—দাঁতের ব্যারাম আর বিড়ির গন্ধে মেশা। সাপের মত নিঃশ্বাস—সাপের মতই সরু লিকলিকে হাত। অসহ্য এই সঙ্গ।···হঠাৎ মরীয়া হয়ে এক সময়ে ব'লে ফেলে—'আমি···আমি বাইরে যাবো।'

ক্রুদ্ধ চাপা গলায় রামলাল বলে, 'হ্যাঁ, বাইরে যাবে বৈকি রাত দুপুরে! চুপ ক'রে থাক্ বলছি! বেশী গোলমাল করলে পুলিশে দিতে পারি, জানিস্! রলব চুরি করতে এসেছিলি।'

লোকটার নির্মমতায় কানু অবাক হয়ে যায়—ভয়ে ওর দেহ যেন অবশ হয়ে আসে! সাপের বিষ বুঝি এই ভাবেই মানুষকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে।

এমনি চলে দিনের পর দিন।

রাত্রিটা কানুর কাছে বিভীষিকা হয়ে দাঁড়াল। সারারাত কাজ ক'রেও যদি ঘুমোনোর দায় থেকে অব্যাহতি পায় ত বাঁচে সে! সমস্ত দিন ধরে মনের অবচেতনে একটা আতঙ্ক খচ্ খচ্ করতে থাকে। এদিকে কিন্তু রামলাল বেশ সহজ ভাবেই কথা কইত, তাকাত। বরং ইদানীং কিছু কিছু স্নেহ দেখাবারও চেষ্টা ক'রে। কানু বুদ্ধিমান হ'লে বিজয়ের মত বহু সুবিধা আদায় ক'রে নিতে পারত কিন্তু সে কথা ওর মাথাতেই যায় না।

মাঝে মাঝে ওর মনে হয় যে এ চাকরি ছেড়ে মোক্ষদার কাছে যে টাকা জমেছে তাই নিয়ে কোথাও পালিয়ে যায়, কোন দূর বিদেশে। সাহসে কুলোয় না শেষ পর্যন্ত। এই গ্রাম ছাড়া কোন দেশ আজ পর্যন্ত সে দেখে নি, বিদেশ কাকে বলে তাই জানে না, কোথায় গিয়ে কী বিপদে পড়বে তার ঠিক কি!

এত কাছে কলকাতা, তাও ওর ভাল ধারণা নেই তার রাস্তাঘাটগুলোর; একেবারে এক মাইলের মধ্যে যেটুকু, তাই সে চেনে।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে কানু যখন দোকানের বাইরে রাস্তায় এসে দাঁড়ায় তখন মাঝে মাঝে ভাবে, আচ্ছা এ ট্রেনগুলোয় চেপে চলে গেলে কেমন হয়? কোথায় যাচ্ছে ওরা, কতদূরে? খুবই কাছে যায় নিশ্চয় এ ট্রেনগুলো,—এরা বলে 'লোকাল ট্রেন', দু' তিন ঘণ্টার মধ্যেই ফিরে আসে আবার। তবু সে কতদূর কে জানে? এমনি ত বিনা টিকিটে কত লোক যাচ্ছে। বড়জোর না হয় কান মলে নামিয়ে দেবে গাড়ী থেকে। বাচ্ছা ছেলেদের নাকি কিছুই বলে না শুনেছে সে। যাবে?

যারা মাল নিতে আসে, বাবুরা, কত দেশেরই নাম করে। দিল্লী, আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, বোম্বে, মাদ্রাজ।

শুনে শুনে নামগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে কানুর, সাবধানে শোনে সে মন দিয়ে।

বিলেত ব'লে একটা কি দেশ আছে, সেখানে সাহেবেরা থাকে। সেখানে সবাই সাদা, কালো মানুষকে তারা ঘেন্না করে বড্ড—এ-ও জানে কানু। মিস্তিরদের পাঁচু ওর চেয়ে বয়সে ছোট, সে ঐ সব দেশের কথা জানে ওর চেয়ে বেশি। বলে ভূগোলে লেখা আছে এসব, ভূগোল বই পড়লে সব জানা যায়।

ছেলেবেলায় যদি সে লেখাপড়া শিখত! মার কথা যদি সে শুনত তখন!

শচীর কাছে প্রথমভাগ যেটুকু পড়েছে তারপর আর পড়া এগোয় নি। দ্বিতীয়ভাগ কিনে রেখেছে একটা, মধ্যে মধ্যে ভোঁদার ছোট ভাইকে তোষামোদ করে পড়াবার জন্য, কিন্তু পড়া বেশীদূর এগোয় নি। তার কারণ দুপুরে ও যখন বাড়ী যায় ভোঁদার ভাই থাকে ইস্কুলে। আর ছুটির দিন সে বই নিয়ে বসতে রাজী হয় না কিছুতেই—কারণ ওর বই নিয়ে বসতে দেখলে গুরুজনরা হয়ত তার বই নিয়েও বসতে বলবেন। তাছাড়া ছুটির দিন বাড়ীর সব ছেলেপুলেই বাড়ী থাকে, সে এমন গণ্ডগোল যে, তাতে লেখাপড়া হয় না।

সুতরাং তিন চার পাতার বেশি এগোয় নি।

দোকানদারি করতে করতে বরং দু-একটা নামতা বা সের-ছটাকের হিসাব মুখে মুখে মুখস্থ হয়ে গেছে। টাকা আনার হিসাবটাও মোটামুটি করতে পারে। দাম বুঝে নিয়ে বাকী পয়সা ফেরৎ দিতে আটকায় না। কিন্তু সে এমন কিছু আশার কথা নয়। তাতে ক'রে কোনদিন লেখাপড়া শিখে ইস্কুলে

পড়ে বাবুদের মত অফিসে চাকরি করতে পারবে—এ ভরসা আর ওর নেই। শুধু নটা দশটার সময় যখন চান করে জুতোজামা পরে হাতে হাত-ঘড়ি বেঁধে সিগারেট খেতে খেতে ওরা অফিস যায়, তখন সেদিকে চেয়ে ওর দীর্ঘশ্বাস পড়ে এক একদিন। হাতের কাজে দেরি হয়ে যায়। বকুনি খেতে হয় ভোঁদার কাছে।

এ সবই স্বপ্ন, সত্য শুধু এই চাকরি—আর তার চেয়েও নিষ্ঠুর সত্য মনিব রামলাল।

রামলালের অর্থলোভ যতই থাক্, দৃষ্টি খুব সজাগ বা সতর্ক ছিল না। চুরি সবাই করেছে, আর বহুদিন ধরে—সেটা কানু ও বুঝতে পারে। সম্প্রতি ভোঁদা দোকানে বসেছে বিজয়ের জায়গায়—সেও চুরি করতে আরম্ভ করেছে। কানু তা টের পায়। ঠিক হাতে হাতে নিতে হয়ত দেখে নি কিন্তু ওর ভাবভঙ্গীতে, বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে রোজ হোটেলে বা খাবারের দোকানে খাওয়া এবং রাত নটার শো-তে প্রত্যহ বায়স্কোপ দেখায়—সে টের পায়। রামলালের বাড়ীর কাছে এক বিধবা এসেছেন পশ্চিম থেকে, তাঁর একটি সুন্দরী মেয়ে আছে। মেয়েটির বয়স বেশি, ঠিক কত তা কানু বুঝতে পারে না কিন্তু ওর মনে হয় ভোঁদার চেয়েও তার বয়স বেশি হবে। তারা ভোঁদাদের সজাতি নয়—কায়স্থ। তবু ভোঁদা মাসিমা মাসিমা ক'রে খুব যাতায়াত করে এবং মেয়েটিকে শাড়ী-স্নো-পাউডার প্রভৃতি উপহার যোগায়। কিছুটা প্রকাশ্যে, কিছুটা গোপনে। এসব সংগ্রহ করা এবং অনেক সময় পাঠানোও চলে কানুর মারফৎ। কানুকে ছেলেমানুষ আর বোকা বলেই জানে ভোঁদা। ভোঁদার অনুগতও সে। তা ছাড়া ভোঁদা মিষ্টি ব্যবহারে বশ করেছে ওকে—এ বিশ্বাসও তার আছে।

এত পয়সা আসে কোথা থেকে তা কানু আন্দাজ করতে পারে। এই তিন-চার বছরে পৃথিবী সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হয়েছে ওর, তাতে সহজেই ও অনেক কথা অনুমান ক'রে নেয়। ভোঁদার এই নতুন-পাওয়া মাসিমাটিকেও কানুর খুব সরল মানুষ বলে মনে হয় না, যদিচ তিনি কথা বলেন সর্বদাই অত্যন্ত মিষ্ট কণ্ঠে, এবং করুণভাবে। তিনি তাঁর বিগত ঐশ্বর্যের এবং বর্তমান দারিদ্র্যের অসামঞ্জস্যের কথা সকলকার কাছেই গল্প করেন, এমন কি কানুর কাছেও। তাঁর স্বামী বিদেশে চাকরি করতেন—তখন এসব জঙ্গলের দেশের

নামই শোনেন নি। তিনটে ঝি-চাকর ছিল আড়াইখানা প্রাণীর জন্তে। এমন যে ছিল অদৃষ্টে তা কে জানত! স্বামী হঠাৎ মারা গেলেন বলেই না জ্ঞাতিরাও এমন ক'রে ফাঁকি দিতে সাহস করলে! এখন মেয়েটাকে যে কি ক'রে পার করবেন এই সমস্যা। এখানকার এই ভিটেটা যে ছিল এতদিন, তাই তিনি জানতেন না। অবশ্যি মাথা গুঁজে দাঁড়ানো গেছে—এটা ঠিক। আর এখানে না এলে এমন সব সোনার চাঁদ বোন্‌পোদের কোথায় পেতেন? (এর ভেতর কানুও পড়ে কি? মাঝে মাঝে ভাবে সে) তবু—এ যেন তাঁর বনবাস। ইত্যাদি—

তা হোক্—কিন্তু খুকীর গলায় নতুন সোনার হার আর হাতে চুড়ি হয় কি ক'রে?

গহনা উপহার দেওয়ার ব্যাপারটা ভোঁদা তাকে জান্‌তে দেয়নি বটে, তবে কানুর অনুমান ক'রে নিতে দেরি হয় না। মাসিমা অবশ্য গায়ে পড়েই শোনান যে, তাঁরই যা ছিল ধুলোগুড়ো; তাই ভেঙে মেয়েকে গড়িয়ে দিয়েছেন, দিতেই ত হবে—বরং আরও ঢের দিতে হবে, মায়া ক'রে আর লাভ কি! কিন্তু ও-বাড়ীতে ভোঁদার যত্ন আর কানুর সঙ্গে ভোঁদার অকারণ আরও মিষ্টি ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার কারণটা সে অনুমান ক'রে নিতে পারে সহজেই। আধপোতে আর আধপোতে যেমন একপো হয়—তেমনিই।

এক এক সময় ভাবে রামলালকে সতর্ক ক'রে দেওয়া বোধহয় তার কর্তব্য, কিন্তু রামলালের কথা মনে হ'লে ওর যেন জ্ঞান থাকে না। অদ্ভুত একটা বিদ্বেষে মন ভরে যায়। নিজের মনে মনেই বলে, 'বেশ হচ্ছে, খুব হচ্ছে। ওর ঐ ঠিক হচ্ছে! সর্ব্বস্ব যাক্ ওর। সাহস থাকলে আগুন ধরিয়ে দিতুম ওর দোকানে।'

সে চুপ ক'রেই থাকে।

মাঝে মাঝে মনে হয় ভোঁদা হয়ত ওকেও চুরি করার সুযোগ দেয় ইচ্ছা ক'রেই। লোভও হয় মধ্যে মধ্যে। কিছু পয়সা হাতে পেলে নিজে একটা ছোটখাটো দোকান দিত—ও পাড়ার অবিনাশের মত, তিনশ টাকায় কেমন একটা ছোট্ট মুদিখানার দোকান খুলেছে সে—এ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি পেতো। অবিনাশের সংসার ত চলে যাচ্ছে ঐতেই! কিন্তু শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলোয় না। মার খাবে হয়ত, হয়ত পুলিশে দেবে। এ গ্রামে অনেকেই তাকে চেনে, মনে করবে কুন্তীর ছেলেটা চোর-ছ্যাঁচড় হয়ে গেল। মোক্ষদা মাসি মুখ দেখাতে পারবে না।

না না—দরকার নেই। গতজন্মের পাপে এত কষ্ট পাচ্ছে (এটা কানু মোক্ষদার কাছে বার বার শুনেছে). আবার এ জন্মে পাপ করবে? না, আর না!

কিন্তু কানু না বললেও ব্যাপারটা একটু একটু ক'রে রামলালের কানে ওঠে। চুরিটাও এত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে হিসেবেও সেটা একসময়ে ধরা পড়ে। দীর্ঘকাল ধরে নিয়মিত ভাবে চুরি হয়েছে! লোক পাল্‌টেছে কিন্তু চুরি বন্ধ হয় নি। খুব বড় দোকান ছিল এককালে, বিস্তর লাভ হ'ত—তাই প্রথমে ওসব চুরিতে কিছু এসে-যায় নি। কিন্তু এখন চারিদিকে ছোট-বড় আরও অসংখ্য দোকান হয়েছে, বিক্রী কমেছে অথচ চুরি বেড়েই গিয়েছে। ফলে লাভের চেয়ে চুরির মাত্রা বেশী হয়ে ধীরে ধীরে মূলধন ক্ষয় হতে শুরু হয়েছে। রামলাল ইদানীং যদি নানা কারণে জবুথবু হয়ে না যেত তাহ'লে অনেকদিন আগেই এটা ওর চোখে ধরা পড়ত। টাকার লোভ ছিল, পাওনার হিসাবটা পাই-পয়সা রাখত, নগদ টাকা যেটা হাতে পড়ত সেটাকে আঁকড়ে ধরত প্রাণপণে, কিন্তু আয়-ব্যয়-স্থিতি বোঝবার মত বিদ্যা-বুদ্ধি এবং বয়স কোনটাই ছিল না। এতকাল পরে হঠাৎ এক সময়ে সে আবিষ্কার করল যে, যত মাল ছিল বা থাকত—তার অর্ধেকও আর কিনে দোকান সাজাতে পারে না। এ মালগুলোর টাকা কোথায় গেল?

দিন কতক হৈ-চৈ হ'ল। কানা-ঘুষোও কানে গিয়েছিল কিছু। ভোঁদার দোকানে আসা বন্ধ হয়ে গেল। তা নিয়ে ভোঁদার দাদার সঙ্গে মনো-মালিন্য। সে লোকের কাছে বলে বেড়াতে লাগল যে, এটা আর কিছু নয় দোকানে তার বাবারও যে 'শেয়ার' ছিল, সেটা থেকে তাদের ফাঁকি দেবার মতলব। তখন বিরক্ত হয়ে রামলাল খদ্দের দেখলে। দোকান বিক্রী ক'রে যা টাকা হবে ভাইপোদের অর্ধেক দেবে—আর গ্রামের প্রবীণদের ডেকে অন্য বিষয়ও ভাগ করিয়ে নেবে, এই ঠিক হ'ল। রামলালের নিজের একটি মেয়ে, তার বহুদিন বিয়ে-থা হয়ে গেছে। র বেচে-কিনে তার কাছেই গিয়ে থাকবে।

অর্থাৎ, কানুর এবার সত্যি-সত্যিই রামলালের চাকরিটা গেল। অবশ্য কানুর কোন রকম চুরির অপবাদ না থাকায় রামলাল খুশী হয়ে ওকে বাড়ীতে রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু কানু রাজী হ'ল না। নতুন মনিবের কাছেই কানু করবে দোকানের কাজ, এই ঠিক ছিল, কিন্তু এই সময়ে আর একটা সুযোগ জুটে গেল। মোক্ষদাই দোকানে এসে দেখা ক'রে খবরটা দিলে, 'এই কানু, কলকাতায় কাজ করতে যাবি? মস্তবড় লোকের বাড়ী, বিস্তর লোকজন—খাটুনি কম, মাইনে বেশি। খাওয়া-পরা ছ'টাকা দেবে বলছে, তা ছাড়া দোলে পূজোয় পাব্বুনি বক্‌শিশ— এ ত আছেই! ত্যাখ—'

কলকাতায়? শহরে? ট্রাম বাস্ আলো ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের মধ্যে?

উত্তেজনায় কানুর বুকের রক্ত যেন দ্রুত বইতে থাকে। কলকাতার লোক যেন আলাদা এক রাজ্যের মানুষ, সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের লোক। কত স্বপ্ন দেখেছে সে শহরের! জীবনের যে অর্থ সে ওর মত ক'রে বোঝবার চেষ্টা করেছে তার চরম সফলতা হ'ল শহরের প্রাচুর্যের মধ্যে থাকা।

কে জানে, ভগবান এইবার হয়ত ওর দিকে মুখ তুলে তাকাবেন। শহরে গেলে, সব জানাশুনো চেনাপরিচয় হয়ে গেলে, কত নতুন নতুন সুযোগ মিলবে। স্বাধীনভাবে নতুন কিছু একটা ব্যবসা করাও হয়ত অসম্ভব হবে না। ওর একপয়সাও খরচ নেই বলে মাসির কাছে শ-দুই টাকা জমেছে, স্বাধীনভাবে ব্যবসা করতে পারে ও, ছোটখাটো রকমের। কিন্তু কিছু জানে না বলেই চুপ ক'রে আছে। শহরে গেলে নানাদিকে চোখ ফুটবে। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মনে মনে ভবিষ্যতের কত উজ্জ্বল ছবি দেখে সে।

ও সাগ্রহে বলে, 'যাবো মাসি, তুমি ঠিক ক'রে দাও, আমি এক্ষুনি যাবো।'

মোক্ষদা তবু বলে, 'ত্যাখ ভাল ক'রে ভেবে। তাই করবি, না এখানেই কিছুদিন কাদায় গুণ ফেলে থেকে একটা বেগুনি-ফুলুরির দোকান দিবি? বিয়ে-থা ত করতে হবে, ঘরকন্না পাতা ত চাই। চিরদিন ত আর এমন ক'রে পরের বাড়ী পেট-ভাতায় পড়ে থাকলে চলবে না। অসুখ করলেই তারা তাড়িয়ে দেবে। যাদের বাড়ী-ঘর দোর আছে, কিছু জমি-জায়গা আছে, তাদেরই পরের বাড়ী কাজ করা পোষায়। ভাল ক'রে ভেবে ত্যাখ।'

'না না মাসি, তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এইটে ঠিক ক'রে দাও। বিয়ের এখনও ঢের দেরি। আর কিছু পয়সা জমুক আগে হাতে। ভাল ক'রে একটা দোকান দেব।'

'তবে তাই যা না-হয়। শহরে না গেলে চোখও ফোটে না বলে লোকে।'

তিনচার দিনের মধ্যেই নতুন কাজ ঠিক হয়ে গেল। মোক্ষদার ভগ্নীপতি তাদের পাশের বাড়ী কাজ করে, কাজেই কাজ পেতে কোন অসুবিধা হ'ল না। মোক্ষদাও নিশ্চিন্ত রইল, দেখাশুনো করার লোকের অভাব হবে না।

রামলালের দোকান বিক্রী হয়ে গেছে দিন-দুই আগেই। নতুন মনিবের কাছে আর চাকরি নেয় নি কানু। মাইনেপত্র বুঝে নিয়ে এ দুদিন সে মোক্ষদার বাড়ীতেই ছিল। যাবার দিন দেখা করতে গেল একবার! রামলালের স্ত্রী মানুষ মন্দ নয়, তাছাড়া এতকাল যেখানে খেয়েছে থেকেছে, একটা কৃতজ্ঞতা আছে ত, না বলে যাওয়াটা ঠিক হয় না। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখল হৈ-হৈ। দোকান বিক্রীর টাকা রামলাল জমা দিয়েছিল পোস্ট অফিসে, কিন্তু ভোঁদার দাদা ভোঁদারই পরামর্শে বাড়ীতে রেখেছিল, টাকাটা বেশি সুদে কলকাতার কোন্ ব্যাঙ্কে জমা রাখবে বলে। তা থেকে নাকি পুরো দুটি হাজার টাকা নিয়ে ভোঁদা কোথায় সরে পড়েছে। খবর কেউ জানে না, জানারও নাকি উপায় নেই; কারণ সেই মা'সিমা আর তাঁর খুকী, তাঁরাও এখান থেকে চলে গেছেন কদিন আগে—এইসব কানা-ঘুষোয় বিরক্ত হয়ে। এখানকার লোক যা পাজী, এমন সব কথা রটলে মেয়ের বিয়ে দেবেন কি ক'রে তিনি? এটা তাঁর অংশের ভিটে, স্বামীর পৈতৃক সম্পত্তি। এতকাল পরে এসেছিলেন বাস করবেন বলেই, কিন্তু টিকতে পারলেন না। ভাড়া দিয়ে চলে গেছেন তাঁরা, কোথায় তা কেউ জানে না। ভাড়ার টাকা আদায় করারও ভার কলকাতার একটি অপরিচিত ভদ্রলোকের ওপর। তিনি ঠিকানা বলতে রাজী হন নি।

কানু যখন গেল তখন এই সব নিয়ে গোলমাল কান্নাকাটি শাপ-শাপান্ত চলেছে। সে আর বেশিক্ষণ দাঁড়াল না। রামলালের স্ত্রী আর বৌদিকে প্রণাম ক'রে পালিয়ে এল।

৭

মোক্ষদার ভগ্নীপতির সঙ্গে কানাই যে বাড়ীতে এসে ঢুকল সেটা উত্তর কলকাতার একটা সঙ্কীর্ণতম অঞ্চল। ছোট ছোট সরু গলি, তার দুধারে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বাড়ী। বাড়ীর ফাঁকে ফাঁকেই বড় বড় গুদাম। সে গুদামে কি থাকে সে সম্বন্ধে ওর সঙ্গী সুরেনেরও ভাল রকম জ্ঞান নেই—তবে ঠেলাগাড়ী, মোষের গাড়ী ও গোরুর গাড়ীতে সঙ্কীর্ণ পথ একেবারে বন্ধ এবং

রাস্তার অবস্থা শোচনীয়, কাদায় গর্তে তা প্রায় অচল। সে সব গাড়ীতে নেই এমন মালই নেই—পাট, তুলোর গাঁট, চাল—এই জিনিসই বেশি।

এরই মধ্য দিয়ে কোনমতে পথ ক'রে নিয়ে সুরেন ওকে সঙ্গে ক'রে আরও সরু একটা, বোধ হয় চার হাত চওড়া গলির মধ্যে ঢুকল। তবে যে বাড়ীতে ওরা ঢুকল সেটা এক কালে সত্যিই প্রকাণ্ড বড় ছিল, এখন তারই মধ্যে গোটা-দুই পার্টিশন পড়া সত্ত্বেও তা এককালের অনায়াস-লব্ধ ঐশ্বর্য ও আড়ম্বরের সাক্ষ্য দিচ্ছে। বাড়ীটায় যে ক'টা সিঁড়ি, ক'টা দালান এবং ক'টা মহল তা ছ-মাস পরেও কানু ঠিক করতে পারেনি। মধ্যে মধ্যে ধাঁধা লাগত। কতগুলো যে চোরা কুঠুরী আর সুঁড়ি পথ—মনে করে রাখা সত্যিই শক্ত। সেগুলো আরও দুর্জ্ঞেয় হয়ে উঠেছে পার্টিশন পড়ার ফলে।

কিন্তু সে ঐশ্বর্য এককালেই ছিল, আজ তা স্মৃতিমাত্র।

বিরাট বিরাট ঘর, তার দেওয়াল ডিস্‌টেম্পার করানো হয়েছিল কবে, তার ওপর কে জানে কত-যুগের ধোঁয়া আর ধূলো জমে তা প্রায় মসীবর্ণ ধারণ করেছে, ফলে ঘরে খুব জোর আলো জ্বাললেও খোলে না। সর্বদাই ভেতরটা অন্ধকার ও নিরানন্দ ঠেকে। ভেতরে আসবাবের অভাব নেই, প্রায় প্রতি ঘরই ঠাসা! কিন্তু তাদেরও ঐ অবস্থা। পরিষ্কার করার অভাবে পাথরের টেবিলগুলোর শ্বেত মহিমা বিলুপ্তপ্রায়। ঝাড়ের তেকোণা কাঁচের পল্‌গুলো প্রায় সবই ভেঙ্গে গিয়েছে, আলোর শেডগুলোও মধ্যে মধ্যে ভাঙা। আলমারির কতকগুলো আয়না ভেতরের পারা নোংরা হয়ে যাওয়ায় বিচিত্র প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলে। যেগুলো ভাল আছে, তারও কাঠের অংশের মেহগনি পালিশ তেলে ময়লায় ধোঁওয়ায় একেবারে কালো হয়ে গিয়েছে। খাট পালঙ্কেরও নেই অবস্থা। তার ওপর বিছানাগুলো আরও অদ্ভুত। পুরু গদি ও তোশকে তা আজও তেমনি উঁচু আছে। তবে তার ভেতরের তুলো-গুলো বহু বৎসরের পেষণে জমে ডেলা পাকিয়ে গিয়েছে; যেমন উঁচু-নিচু এবড়ো-খেবড়ো, তেমনি তা প্রায় পাথরের মতই কঠিন। এক একটা এমন বেঢপ উঁচু মাঝখানটায়, কিংবা মাঝখান থেকে বাকী অর্ধেকটা এমন গড়ানো যে মানুষ কি ক'রে তাতে শোয় (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একাধিক মানুষ) তা বহু চেষ্টা ক'রেও বুঝতে পারে না কানু। তার মনে হয় এর চেয়ে ছেঁড়া মাদুর ও ছেঁড়া কাঁথায় শোওয়া ঢের সুবিধা।

বর্তমানে কর্তারা চার ভাই। এঁরা কী সব কাজ-কর্ম করেন। অন্তত এই কথাই শুনেছিল কানু। কাজ-কর্ম কাকে বলে তা সে জানে না। তবে পরে

বুঝেছে যে, নানারকমের ব্যবসা—বিশেষ ক'রে দালালী—বোঝাতেই ওঁরা ঐ শব্দটা ব্যবহার করেন। কর্তাদের যাঁরা ছেলে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বেকার; বড়রা কেউ কেউ সোজাসুজি চাকরিতে ঢুকেছেন। তা নিয়ে বড়-কর্তাদের আক্ষেপের অবধি নেই—এ বংশের ছেলেদেরও চাকরি করতে হ'ল। অথচ না করলে কি উপায় হ'ত তা কেউই বাতলাতে পারেন না। কর্তারা, যাঁরা ব্যবসাবাণিজ্য করেন, তাঁরা যে খুব প্রচুর উপার্জন করেন তা নয়—ছেলেদের মূলধন দিয়ে ব্যবসা ক'রে দিতে পারবেন এমন সঙ্গতিও নেই। এ ধারে অবস্থা তলা-চোঁয়া। বড় কর্তাদের বাবা যিনি, তিনি মরবার সময় কিছু কোম্পানীর কাগজ রেখে গেছেন এই শর্তে যে, এরা যদি একান্নবর্তী হয়ে থাকেন ত সুদটা এঁরা পাবেন নইলে সমস্ত টাকাটা দাতব্য প্রতিষ্ঠানে চলে যাবে। সেই ভয়েই এঁরা আজও এক পরিবারভুক্ত। অবশ্য বাড়ীরও যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে চারটে পার্টিশনও আর সইবে না। তা ছাড়া সেই কোম্পানীর কাগজের সুদ থেকে মোটামুটি সারা পরিবারের ডাল-ভাত তরকারী আহারের ব্যবস্থা এবং এজমালি ঠাকুর-চাকর-ঝি-এর মাইনে চলে যায়। এছাড়া আত্মীয়-স্বজনদের বিবাহ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে যৌতুকাদিও ঐ থেকে চলে। এটা মস্ত লাভ। কাপড় জামা জুতো, শিক্ষার ব্যয়, ছেলেমেয়েদের দুধ—এই যোগাতেই তাঁদের প্রাণান্ত হচ্ছে, এর উপর আর পৈতৃক অর্থের ভরসা ছেড়ে বাইরে যাবার সাহস কারুরই নেই।

বাবুদের কারুর কারুর নিজস্ব চাকরও আছে কিন্তু কানু এল সাধারণ চাকর হয়ে। ঝি আছে, ঠাকুর আছে, কিন্তু তাতে কাজ কুলোয় না—চাকর চাই। এর আগের চাকর বুড়ো হয়ে দেশে গেছে আর ফিরবে না—সেই জায়গায় কানুকে আনা হয়েছে। ছেলে-মানুষ, খাবে কম, মাইনে কম নেবে এবং হয়ত চুরি করবেও কম। ঝি-চাকরের চুরি করাটা এঁরা জানেন এবং সহজেই মেনে নিয়েছেন। তা নিয়ে এদের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করতেও বাধে না, অথচ নিজেরা তার কোন প্রতিকার করতেও প্রস্তুত নন্—সেজন্য কোন প্রয়াস যে করা সম্ভব তাও তাঁদের কল্পনার বাইরে।

কিন্তু কানু এখানে এসে যেন হাঁপিয়ে উঠল। শহরে বড়লোকের বাড়ী চাকরি শুনে যে লোভ নিয়ে সে এসেছিল এ যে তার সঙ্গে কিছুই মেলে না। জানলা থেকে কিংবা বাড়ীর সদর থেকে ট্রাম-বাস্ দেখবে সে সম্ভাবনা মধ্যরাত্রের স্বপ্নের মতই অবাস্তব হয়ে উঠল। কোথায় ট্রাম বাস্? তার শব্দও পাওয়া যায় না। বড় রাস্তা বহুদূর। এই গলি থেকে বেরোলে

আর একটা গলি, তারপর যে বড় রাস্তা সেখানেও ট্রাম বাস্ নেই, আছে ঠেলাগাড়ী, মোটরগাড়ী ও মোষের গাড়ী। মধ্যে মধ্যে দুএকখানা লরি অনধিকার প্রবেশ করে এই মাত্র।

অথচ বাড়ীতেও এই। চতুর্দিকে, ঘরে ঘরে, দালানের কোণে কোণে অন্ধকার জমে আছে পুঞ্জীভূত হয়ে। অন্ধকার আর নিরানন্দ। রাত্রে আলো জ্বাললেও সে অন্ধকার যায় না। আলোগুলো ময়লাজমা কাঁচের শেডের মধ্যে টিম্ টিম্ করে। একফালি আকাশ কোথাও থেকে দেখবার উপায় নেই—না বাড়ীর মধ্য থেকে, না অবসরমত ছুটে বাইরে গেলে! এক একবার ছাদে উঠলে হয়ত দেখা যেতে পারে, কিন্তু তেতালা ভেঙ্গে আকাশ দেখতে যাবার অবসর কোথায়?

ওখানে যখন কাজের ফাঁকে ফাঁকে খুব কষ্ট বোধ হ'ত কিংবা মনিবদের অবিচার বড় বেশি বলে ঠেকত, তখনই ছুটে বাইরে বেরোলে দেখত প্রকৃতি তাঁর জন্য অদ্ভুত সান্ত্বনা নিয়ে, নিবিড় অন্তরঙ্গ সাহচর্য নিয়ে বসে আছে। অবশ্য শহরতলীতে প্রকৃতির এমন কোন আশ্রয় নেই, তবু অম্বিকাবাবুদের বাড়ীর কাছের পুকুরঘাটটা, তার ওপাশে বকুল গাছ, ওদেরই বাড়ীর উঠানে নারকেল গাছ দুটো, সুপারী ও নিমগাছ—শরতের রৌদ্রে কিংবা রাত্রের জ্যোৎস্নায় যখন ঝল্‌মল্ করত, তখন কী এক অপূর্ব আনন্দে ওর মন ভরে যেত, মনে হ'ত যেন ওরা তার কথা বুঝছে, ওদের সঙ্গে ওর কী একটা যোগ আছে মনে মনে। সব চেয়ে রায়-পাড়ার সেই বাঁশবাগানটা—দোকান থেকে রামলালের বাড়ী যেতে দিনের বেলা যেটার মধ্য দিয়ে ওরা প্রায়ই যেত। শুক্‌নো বাঁশপাতার ওপর হেমন্তরাত্রির হিম পড়ে কী অপূর্ব গন্ধ ভাস্‌ত হাওয়ায়, ভোরবেলা খালি পায়ে বাঁশপাতাগুলো মাড়িয়ে যেতে যেতে তারই আঘ্রাণে বুক ভরে যেত যেন। কিছুও যখন না পেত, যে-কোন স্থান থেকে একবার আকাশের দিকে চাইলেই তৃপ্তি! স্বচ্ছ নীল আকাশ, কখনও বা তারই একপ্রান্ত থেকে ঘনিয়ে আসা স্লেটপাথরের মত মেঘের পুঞ্জ, কখনও বা শুক্‌নো মেঘে ছাওয়া বিবর্ণ আকাশ—সবই ওর ভাল লাগত।

তাছাড়া, কত মানুষ সেখানে! রাস্তার মোড়ে মোড়ে ছেলেরা জটলা করত—দেশী-বিলিতি কত কি খবর, কত নাম-না-জানা খেলার কথা টুক্‌রো টুক্‌রো কানে আসতো—কাজের ফাঁকে ফাঁকে, তার সব কথা না বুঝলেও কেমন যেন অন্য একটা রাজ্যে গিয়ে পড়ত সে সময়ে। একটা অবকাশ, একটা উদার

বিস্তৃতি অনুভব করত অন্তরে অন্তরে। মনে হ'ত লেখাপড়া নাই-বা শিখল, তবু লেখাপড়া-জানা লোকেদের যে জগৎ তার সঙ্গে ওরও একটা যোগাযোগ আছে কোথাও। অন্দরের জানলা দিয়ে বাইরের মাঠে তাকাবার মত এদের এই কথাবার্তার মধ্যে কিংবা রেডিওর বাংলা খবরের মধ্যে দিয়ে বাইরের জগৎ এক-এক ঝলক দেখতে পেত।

কিন্তু এখানে সে সব কিছুই নেই।

মনিবরা কেউই সাতটার আগে ওঠেন না। তাঁদের বংশধররা ওঠেন আটটায়। অর্থাৎ চা হ'লে। চা খেয়ে নিজেদের মহলেই খবরের কাগজ নিয়ে বসে থাকেন। তারপর স্নান-আহার সেরে যে-যার কাজে বা অকাজে বেরিয়ে যান। একত্রে বসে আড্ডা দেওয়ার রেওয়াজ নেই কারুর। সদ্ভাবও তেমন নেই। থাকলেও ওপরতলার সে সব মহলে কানুর যাওয়ার প্রয়োজন বা অবকাশ কোথায়? তাহ'লে অন্তত রেডিওটা শুনতে পেত। ওপরের দু' তিনটে ঘরে রেডিও আছে, কিন্তু সেই কারণেই আওয়াজ কমানো থাকে। যে যার রেডিও শুনবে এই ব্যবস্থা। সে আওয়াজ নিচের তলায় এসে পৌঁছয় না।

ওর সমস্ত জীবন অতঃপর সীমাবদ্ধ থাকবে এই ঠাকুর আর ঝিয়ের মধ্যে? বাবুদের কারুর কারুর এক একটা নিজস্ব ঝি চাকর আছে বটে কিন্তু তারাও 'সাজার' ঝি-চাকরের সঙ্গে মেশে না, পাছে মিলিত সংসারের কিছু কাজ করতে হয়। যে যার ঘর বা মহলে সীমাবদ্ধ! কাপড় কাচা, বিছানা করা, দুধ জাল দেওয়া, ছেলেপুলের কাঁথা কাচা, এসব নিয়ে তারাও একদণ্ড ফুরসুৎই পায় না নিচে নামবার। তাছাড়া গিন্নীদেরও ভয় আছে, তাঁদের মাইনে খেয়ে পাছে ওরা সকলের কাজ কিছু ক'রে ফেলে। মধ্যে মধ্যে তারা শুধু দেখা দেয় কানুদের জগতে—একটু গরম জল কিংবা আর কোন জিনিস চাইতে। সকালে চায়ের সময় এক প্রস্থ চা সংসার থেকে দেওয়ার ব্যবস্থা আছে সেইগুলো নিতে আসে যে যার মনিবের জন্য; আর নিজেরা সময় হ'লে খেতে আসে, 'কৈ গো ঠাকুর মশাই, খেতে দেবে নাকি?'

অথচ যে মানদা ঝি আর উড়ে ঠাকুরের মধ্যে অতঃপর ওকে দিন কাটাতে হবে, তাদের যা নমুনা ও প্রথমেই পেয়েছে, তাতে কোথাও আর কোন ভরসা নেই। প্রথম দিনেই ত বুকের রক্ত জল হয়ে গিয়েছিল মানদাকে দেখে। বিস্মিত, হতচকিত কানু স্বরেনের পিছনে পিছনে এসে সবে রান্নামহলের উঠোনে পা দিয়েছে—মানদার সঙ্গে সেই ওর প্রথম সাক্ষাৎ—ঠিক সে সময়টায়

সামনে কেউ ছিল না বলে কতকটা নিশ্চিত হয়ে ও মুখ তুলে বারান্দাগুলো গুনে গুনে দেখছিল পর পর কটা 'তলা' উঠে গেছে, এমন সময় কানে গেল, স্বরেন বিনয় ক'রে বলছে, 'মানদা-দি, এই যে ছেলেটাকে এনেছি, তোমার পায়ের তলায় রেখো—আর একটু শিখিয়ে পড়িয়ে নিও।'

যার পায়ের তলায় থেকে ওকে শিখতে হবে, না জানি সে কেমন মানুষ—অবাক হয়ে ফিরে দেখতে যাবে কানু, তার আগেই মানদা দ্রুত এগিয়ে এসে ডান হাতের তর্জনী দিয়ে ওর চিবুকটা ধরে মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে বললে, 'এই ছোঁড়া, দেখি দেখি—'

তারপর মুহূর্তখানেক ওর দিকে চেয়ে থেকে বিচিত্র একটা মুখভঙ্গী ও অস্ফুট শব্দ ক'রে যেন নাচের ভঙ্গীতে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'অ আমার পোড়া কপাল, এ যে একেবারে গবেট রে স্বরেন! কোথা থেকে এ'কে ধরে নিয়ে এলি! যত রাজ্যের আবর আর জানোয়ারই কি আমার কপালে এসে জুটবে!'

কানুর ত লজ্জায় ও ভয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘাম দেখা দিলে; তবে কি এখানে কাজ হবে না শেষ পর্যন্ত? ওখানের কাজ ছেড়ে দিয়ে এসে এ কি বিপদে পড়ল সে!

কিন্তু স্বরেন দমল না, বরং মুচকি হেসে বললে 'অমন গোবর-গণেশ না হ'লে তোমারই যে অসুবিধে দিদি, চালাক-চতুর কাউকে ধরে নিয়ে এলে সে ত ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেত। এতটা রামরাজত্ব চল্‌ত কি? তার চেয়ে এ'কে মনের মত ক'রে গড়ে নিতে পারবে।'

'থাম্ স্বরেন, আর জ্বালাস নি!' তালু ও জিহ্বার সাহায্যে 'পিচ্' ক'রে একটা শব্দ ক'রে আর একবার কানুর দিকে ঘুরে দাঁড়ায় মানদা, 'ও কত দেখলুম—ওরা সব ছাগলের জাত; খাইয়ে পরিয়ে মানুষ করো, যেমন হাত-পা গজাবে অমনি এসে ঢু মারবে তোমাকেই!'

এই পর্যন্ত বলে মানদা হঠাৎ হেসে উঠল। বিদ্রূপের সে হাসি স্তরে স্তরে উচ্চে উঠে চারিদিক যেন আচ্ছন্ন, অভিভূত ক'রে ফেলল। তারপর হাসি থামতে সে বলল, 'শিখে পড়ে ডানা গজাতে যা দেরি, তারপর কি আর মনে রাখবে? শুধু শুধু ভূতের ব্যাগার খাটা—গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা। চোক-কান ফুটলে তখন আমার পেছনেই আগে লাগবে।'

তারপর অকস্মাৎ কানুর মাথাটা কাঁধটা টিপে দেখে বললে, 'এধারে ত বেশ জোয়ান আছে, খাটতে পারবে বলেই মনে হচ্ছে। দেখিস্ ছোঁড়া খুব

হুশিয়ার, এখানে কাজ করতে হ'লে আমাকে মেনে চলতে হবে। আমার তাঁবে কাজ করতে হবে—আমার মন যুগিয়ে। ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খেতে গেছ, কি আমার নামে চুক্‌লি খেয়েছ ত—ভাল হবে না। এই তোকে নিয়ে পাঁচজন হ'ল। এর আগে চার জনের অন্ন গেছে। আমার সঙ্গে লাগতে গিয়েছিলেন বাবুরা, ভেবেছিলেন যে আমাকে তাড়াবেন—কিন্তু আমি ঠিকই আছি, দেখছিস্ ত? তাঁরাই কোন্ চুলোয় চলে গেলেন! এই মানদা ঝিকে দেখছ এম্‌নি—মানুষ আমি বড় সোজা নই—বলে দিলুম!……খুব সাবধান!'

এই বলে অকারণে কানুর ডান কানটায় মোচড় দিয়ে কাঁধটা হেলিয়ে মানদা রান্নাঘরে চলে গিয়েছিল।

অবশ্য তারপর থেকে মানদা ওর বিশেষ অপরাধ খুঁজে পায় নি, বরং কানু নিজেই শুনেছে—ঠাকুরকে গোপনে বলছে মানদা, 'তা ছোঁড়াটা মোটের ওপর মন্দ না, বোকা-সোকা আছে, অত সব-তাইতে নাক গলাতে আসে না।' তবু ওর সম্বন্ধে কানুর একটা আতঙ্ক কিছুতেই যেন যেতে চায় না।

সে যাই হোক্—কানুর সহনশীলতা ছিল অসাধারণ। এখানকার এই নিশ্বাসরুদ্ধ-করা জীবনও এক সময়ে সহজভাবে মেনে নিলে। সে দরিদ্র, সে লেখাপড়া শেখে নি, তার আত্মীয়স্বজন কেউ নেই—সুতরাং এমনি ক'রেই চিরকাল তাকে পরের দোরে খেটে খেতে হবে। বাড়ী কিংবা মনিব বাছতে গেলে চলবে কেন?

তবু—মানুষগুলোর ওপরে একটা বিতৃষ্ণা থেকেই যায়। মানুষ যে এত অলস হতে পারে তা ইতিপূর্বে ও কখনও দেখে নি। সে দরিদ্রঘরের ছেলে, দেখেছে যাদের তারাও নিম্নমধ্যবিত্ত। তাদের মেয়েরা খেটেই খায়। শচী কিছু করত না—তবু এটা-ওটা ফায়-ফরমাশ কিংবা মায়ের কাজের যোগাড় দেওয়া—এটুকুও অন্তত করত। এ বাড়ীর মেয়েরা তাও করে না। ভোরবেলা উঠে বাথরুমে গিয়ে মুখটা ধুয়ে কাপড় ছেড়ে রেখে আসে। নিজেদের কাপড়ও কাচে না। প্রত্যেকেরই নিজস্ব ঝি বা চাকর আছে—তারা ছেলেমেয়েদের কাজ করে, কাপড় কাচে, বিছানা ঝাড়ে, সব কাজই করে। এমনি ঘর-দোর মোছা বা ধোওয়া কানু কিংবা সাধারণ ঝিয়ের কাজ। মেয়েরা শুধু বারকতক

চা খায়, বাজার থেকে বেগুনি কিংবা ঘুগনি কিংবা চানাচুর আনিয়ে খায়, আর বসে থাকে। কেউ কিছু বোনে, কেউ বই পড়ে, কেউ বা শুধুই বসে থাকে। তার ফলে, প্রত্যেকেরই অম্বলের অসুখ—বদহজম। রাশি রাশি ওষুধ খায় এবং কর্তাদের আড়ালে কুপথ্য চালায়। শরীরও বেঢপ অধিকাংশ মেয়েদের। ওপরের অংশটা অতিমাত্রায় মোটা এবং পা-গুলো কাঠির মত সরু সরু। পল্লীগ্রামের মেয়েদের খাটুনির ফলে শরীরের নিম্নাংশ সুগঠিত হবার সুযোগ পায়। বিলিতী মেমসাহেবরাও নাকি উঁচু গোড়ালির জুতো প'রে আর নেচে সেটা ঠিক রাখে, কিন্তু এখানে সে-সব কোন ব্যবস্থাই নেই। বিনা পরিশ্রমে অতিভোজনের ফলে শরীরে শত রোগ এসে বাসা বেঁধেছে। ছেলেমেয়েগুলোও অস্বাস্থ্যের গুদাম; সকলেরই হজমের গোলমাল, রোগ লেগেই আছে।

পুরুষগুলো আরও অদ্ভুত।

বেশির ভাগই ওঠে সাতটা থেকে আটটার মধ্যে। তারপর বার-দুই চা খেয়ে স্নান সেরে অফিসে বেরোয় কোন মতে। বড় কর্তারা দেরি ক'রে বেরোন যদিচ, তবু সংসারের কোন কাজেই আসেন না। পাড়ার মাতব্বরি আছে, ক্লাব আছে, ইলেক্‌শান্ আছে, দলাদলি আছে—দুটো বৈঠকখানায় চার ভাই তাঁদের দলবল নিয়ে এগারোটা পর্যন্ত ব্যস্ত থাকেন। সেখানেই বারকতক চা পাঠানো হয়, তাঁরা ভেতরে আসেন শুধু বাথরুম সংক্রান্ত ব্যাপারে। তারপর খেয়ে দুপুর নাগাদ অফিসে বেরোন। অফিস থেকে ফেরেন সকলে প্রায় একই সময়ে; ইস্কুল-কলেজের ছেলেরা ফিরে এসেই খেয়ে পাড়ায় বেরোয়। এঁরা এসে কিছুক্ষণ গামছা প'রে ঘোরাঘুরি করবার পর বার-দুই চা এবং আনুষঙ্গিক ব্যাপার সেরে রাত্রি আটটা নাগাদ বেরোন 'বেড়াতে'। এই বেড়াতে বেরোনোর অর্থ কানুর মাথাতে কিছুতেই যায় না। এতরাত্রে কোথায় বেড়ায়? কেউ কেউ ক্লাবে যান। থিয়েটারের ক্লাব আছে, গানবাজনার ক্লাব আছে—সমাজ সেবার ক্লাবও আছে। কেউ কেউ অজ্ঞাত কোন স্থানে যান। কেউ যান বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ী আড্ডা দিতে। কেউ বা কাজেও যান। ফেরেন কিন্তু সকলে একই সময়—রাত এগারোটায় কোনদিন আরও পরে! তারপর তাঁদের খাওয়া, তাঁদের গৃহিণীদের খাওয়া শেষ হ'লে চাকর-ঝি খেয়ে ওঠে রাত একটায়। তখন ঘুমোতে যাবার ছুটি মেলে। প্রথম প্রথম কানুর খুবই কষ্ট হয়েছিল কিন্তু ইদানীং সেও এ বাড়ীর ধারা ধরে ফেলেছে—অর্থাৎ সন্ধ্যারাত্রে কাজকর্ম

সেরে রাত নটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত একটা ঘুম দিয়ে নেয়। আবার বাবুরা বাড়ী ফিরলে নিদ্রিতপুরী যখন জেগে ওঠে তখন সে-ও জেগে কাজকর্মে মন দেয়।

অবশ্য কানুর কাজকর্ম যে খুব বেশি সে-সময় থাকে তা নয়—ঠাকুরের কাজই সে-সময় বেশি; রাত্রিবেলা কেউ নিচে এসে খান না, ঘরে ঘরে খাবার পৌঁছে দিতে হয়। ঝি-চাকররা সে-সব থালা-বাসন পরিষ্কার ক'রে নিচে নেমে এসে নিজেরা খেতে বসে। তবু হাঁক-ডাক করতে হয় খানিকটা —নইলে এ বাড়ীর বাবুরা অসন্তুষ্ট হন। ঝি-চাকররা তাঁদের অজ্ঞাতসারে বিশ্রাম করবে, এটা তাঁদের পছন্দ নয়। এ রকম বহু সঙ্কীর্ণতাই আছে এঁদের। এতবড় বাড়ী,—ভিখারী ভিক্ষা পায় না। মাসে মাত্র আড়াই সের চাল বরাদ্দ। তা থেকে অন্ততঃ পাঁচ পো চাল চুরি যায়—বাকী যা থাকে তা দু-তিন দিন মুষ্টিভিক্ষা দিলেই ফুরিয়ে যায়। আর কেউ পাবে না—কেঁদে মরে গেলেও না। কারণ ওটা সরকারী বরাদ্দর মধ্যে। কো'ন কোন বধূ প্রথম প্রথম এ বাড়ীতে পা দিয়ে গোপনে হয়ত পয়সা দেবার চেষ্টা করেছে এসব ক্ষেত্রে, কিন্তু ফলে তাদের অনেক কথা শুনতে হয়েছে।—'বড়মানুষের মেয়ে, পয়সা দেখাতে এসেছে! আমরা বুঝি আর পয়সা দিতে জানতুম না, ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া' ইত্যাদি। তারপর আর কারুর সে সাহসে কুলোয় না। ক্রমশঃ ব্যাপারটা গা-সওয়া হয়ে গেছে! এখন প্রার্থীদের কান্না তাদের কানেও পৌঁছয় না।

আর একটা নীচতা কানুকে বড্ড পীড়া দেয়, সেটা হচ্ছে তাদের খাওয়ার ব্যবস্থা। বাবুরা এমন কিছু সরু চাল খান না, কম দামের চালই আসে, বাজারও এমন কিছু মূল্যবান করা সম্ভব নয়। তবু দু'রকম রান্নার ব্যবস্থা। শুধু যে ভাত দু'রকম তাই নয়, ডাল. দু'রকম রান্না হ'য়। একটা বিশেষ পাতলা, তাদের জন্যে। চাকরদের চচ্চড়ি মাছ সব আলাদা। এগুলো কম তেলে রান্না হবে, ঠাকুরের ওপর এই নির্দেশ। ঠাকুর যে সব সময় সে নির্দেশ মানত তা নয়, তবু দু'রকম ব্যবস্থা ক'রেই তাঁদের সান্ত্বনা। শচীদের বাড়ী যত অসুবিধাই থাক্, খাওয়ার অসুবিধা কানুর ছিল না; রামলালের বাড়ী খাওয়াটা সাধারণ রকমের হ'লেও সংসারের সঙ্গে সমান ব্যবহার পেত। তাছাড়া বারোমাসে তেরপার্বণ—পিঠেপুলি এটা-ওটা সব গৃহস্থ-বাড়ীতেই তৈরী হয়, এগুলো থেকে সে কখনও বঞ্চিত হয় নি! এখানে সে সব পাটই নেই! ওপর-তলায় কোন কোন ঘরে মধ্যে মধ্যে স্টোভে চপ-কাটলেট

তৈরী হয়, কিন্তু সেই ঘরের ঝি বা চাকর পর্যন্ত পে ৗছে তার বদান্যতা থেমে যায়! কদাচিৎ সাধারণ রান্নাঘরে হয়ত কিছু বিশেষ আয়োজন দেখা যায়, বছরে সে হয়ত একদিন, তাও ঝি-চাকরদের জন্যে কোন বরাদ্দ নেই। বাবুদের ও ছেলেমেয়েদের মাথা-গোনা। মানদা ঝি মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে গলা ছেড়েই বলত, 'ছোটলোক! ছোটলোক! এরা যদি বড়লোক ত ছোট-লোক কে!...চামার! অমন খাওয়ার মুখে আমরা–' ইত্যাদি!

অবশ্য তারা চাকরি ছাড়ত না, কারণ চুরির প্রচুর সুযোগ তাদের হাতে! শুধু কানুরই মধ্যে মধ্যে চোখে জল এসে যেত, মনে হ'ত এর চেয়ে যে কোন গরীব গৃহস্থ-বাড়ী ঢের ভাল ছিল! তার বেশি মাইনেতে কাজ নেই।

এই ধনী-গৃহের মরুভূমে তার ওয়েসিস ছিল দুটি লোক। একটি বড় বাবুর বড় বৌ বীণা, আর একটি মেজবাবুর সেজছেলে অরুণ। এ-বাড়ীর অনেকগুলি অহঙ্কারের মধ্যে একটি হচ্ছে যে, তাঁরা বনেদী বংশের মেয়ে ছাড়া বৌ করেন না। বীণাই নাকি তার একমাত্র ব্যতিক্রম! বড়বাবুর সহপাঠী বন্ধুর মেয়ে, সাধারণ গৃহস্থ ঘরে ওর জন্ম-কর্ম। আগে কেরাণীর মেয়ে বলে অনেকেই এ বাড়ীতে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করেছেন, এখন এখানকারই কোন কোন ছেলে কেরাণীগিরি শুরু করায় সেটা বন্ধ হয়েছে। বীণা মেয়েটি সুশ্রী এবং হাসিখুশি। সে কাজ না ক'রে থাকতে পারে না বলে দুটি ছেলেমেয়ে দেখেও প্রায়ই নিচের মহলে নেমে এসে যেচে কাজকর্ম ক'রে দেয়। বিশেষ ক'রে কুটনো-কোটা কাজটা ত তারই প্রায় একচেটে। শুধু তাই নয়, একমাত্র তারই নিজস্ব ঝি নেই। নিজের ছেলেমেয়েকে সে নিজেই দেখে। তার ঘর-দোরও সর্বদা ঝকঝকে ফিটফাট। তার স্বামীরই সবচেয়ে বেশভূষা পরিষ্কার থাকে। কানুর মনে হয় বীণাই বোধ হয় এ বাড়ীর একমাত্র মেয়েছেলে যে ঝি-চাকরকেও মানুষ বলে মনে করে। ওদের সুখ দুঃখ দেখে, ওদের সঙ্গে হাসি-তামাসা করে, কাজকর্ম ভাগ ক'রে নেয়, সুবিধা-অসুবিধার দিকে দৃষ্টি রাখে!

বিশেষত কানুর প্রতি তার স্নেহটা কিছু বেশি। ওর বয়সী বীণার একটি ভাই আছে, কতকটা ওরই মত নাকি দেখতে—শুধু সে শ্যামবর্ণ নয়, গৌরবর্ণ। তাহোক, তবু মানদা ঝি খুব বেশি খাটিয়ে নেবার ফিকিরে থাকলেই

বীণা অনুযোগ করত, 'ও কি লা মানদা, ছেলেমানুষ আর গোবেচারী বলে ওর ওপরই তোমাদের যত চাপ, না? তুমি একটা কাজ ক'রে নিতে পার না?'

কিংবা—বেশী বেলা হ'লে ঠাকুরের মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে বলত, 'ঠাকুর, খাটাচ্ছ ত ছেলেটাকে ভূতের মত, খেতে দিয়েছ কিছু? কত বেলা হ'ল সে খেয়াল আছে?'

এ বাড়ীর বরাদ্দ ছিল ঝি-চাকদের জন্য বাসি রুটি আর একটু ক'রে গুড়। কানুর বেলা বীণাই বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল, 'বাসি ভাত ত প্রায়ই তোমাদের বাড়িতে থাকে ঠাকুর, একটু জল দিয়ে রেখো। গুড়-তেঁতুল দিয়ে ছেলেটাকে দিও, কিংবা একহাতা চচ্চড়ি। ছেলেমানুষ, ওরা এখন মোষের মত খাবে—তোমার ও একখানা রুটি খেয়ে কি বেলা তিনটে-চারটে পর্যন্ত যুঝতে পারে?'

মানদা সেজন্য ঠাট্টা ক'রে বলত ওকে, 'বড় বৌদির পুষ্যিপুত্তুর!'

বেলা হ'লে বীণা কিছু বলবার আগেই তার দিকে একবার আড়ে চেয়ে নিয়ে হেঁকে বলত, 'দাও গো ঠাকুর মশাই, বড় বৌদির পুষ্যিপুত্তুরকে একথালা পান্তা বেড়ে। দুটো পিঁয়াজ কুঁচিয়ে নে না রে কানু—পান্তাভাতে বেশ লাগবে'খন।' এটা অবশ্য বীণাকে খুশি করার জন্যেই। বীণার কাছে পাওনা-থোওনা এদের হ'ত প্রায়ই। তাছাড়া বীণাই মধ্যে মধ্যে পিঠেপুলি কিংবা পায়স-জাতীয় কিছু করলে এরাও এক এক চামচ পেত।

আর অরুণ—

অরুণেরই এ বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে সামান্য কিছু পাঠে অনুরাগ আছে কিন্তু বেচারী সে সম্বন্ধে আলোচনা করতে পারে এমন লোক নেই। এ বাড়ীর ছেলেদের মধ্যে সে দলছাড়া, গোত্রছাড়া। এরা ওকে বই নিয়ে বসে থাকতে দেখলে হাসে। কাজেই অরুণ বেচারীর মনে একটু দুঃখই ছিল। এখন হঠাৎ কি ক'রে আবিষ্কার করে ফেলেছে সে যে, কানু লেখাপড়া না জানলেও উত্তম শ্রোতা। তাই প্রত্যহ স্নান করতে আসবার সময় কর্মরত কানুকে ডেকে কিংবা, কাজের সময় ওপরে কখনও পেলেই তাকে ডেকে সে শোনাত আজব দুনিয়ার আজব আজব খবর—

'জানিস কানু, এই পৃথিবীতে এমন দেশ আছে যেখানে ছ' মাস রাত আর ছ' মাস দিন? মানে ছ' মাস সূর্য মোটে অস্ত যায় না, আর বাকী ছ' মাস তাঁর পাত্তাই মেলে না।'

কানু হয়ত অবিশ্বাস ক'রে হেসে বলত, 'ধ্যেৎ, কী যে বলে ন'দা তার ঠিক নেই।'

'ঐ ত, কানাইচন্দ্র, দুনিয়া যে কত বড় আর কত তাজ্জব তার ত কোন খবরই রাখলে না, কেবল বাসন মেজে আর ঘর মুছেই জীবনটা কাটালে! আছে আছে, এমন দেশ আছে; তার নাম নরওয়ে। সেখানে যে ছ'মাস সূর্য থাকে না, সে সময় একডেলা বিদ্যুৎ জ্বলে চাঁদের মত। তাকে বলে অরোরা। কেন হয় জানিস? শোন্ তবে—'

এই বলে সে হয়ত বোঝাতে বসল পৃথিবীর বার্ষিক গতি ও আহ্নিক গতির রহস্য। বোঝাবার আগেই হয়ত মা প্রচণ্ড ধমক দিলেন, 'যা যা, ঢের হয়েছে, তোকে আর পণ্ডিতি ফলাতে হবে না। ওর কাজকর্ম নেই? আর তুইও ছোঁড়া দিব্যি হাতের কাজ ফেলে গল্প শুনছিস?…যা, নিজের কাজে যা।'

কিন্তু তাতে অরুণ দমত না। অবার হয়ত আধঘণ্টা পরে ফাঁক পেয়েই ওকে ডেকে বলত, 'এই যে রাত্তিরে আকাশে তারাগুলো দেখিস, ওগুলো কত দূরে আছে তা জানিস? ওর ভেতর একটা থেকে আলো এসে পৌঁছতে দু'হাজার বছর সময় লাগে। অথচ আলো ছোটে এক সেকেণ্ডে—মানে ঘড়ীতে দুবার টক্-টক্ শব্দ হবার মধ্যে—এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল।'

পরক্ষণেই কানুর বিস্ময়-বিস্ফারিত এবং বোঝবার-চেষ্টায় ব্যাকুল চোখের চাহনি দেখে হেসে ফেলে বলত, 'ও হরি, এসব তুই যে কিছুই জানিস না। তোকে বোঝাতে যাওয়াও যা, গোরুকে তামাক খাওয়ানোও তাই।'

আবার ওর মুখে দুঃখ-বেদনার ম্লানছায়া নেমে আসছে দেখে সান্ত্বনা দিয়ে বলত, 'তুই ভাবিস নি কানাই, এখনও সময় আছে। রাত্তিরটা না ঘুমিয়ে দ্বিতীয় ভাগ মুখস্থ কর দেখি। রোজ এক ঘণ্টা অন্তত। এই দেখ্‌না—বোপদেব ছিল তোর মতই বোকা, সাত বছরে ব্যাকরণের একটা পাতাও পড়তে পারে নি, অথচ সেই বোপদেবই একটা গোটা ব্যাকরণ লিখে গেল। কী ক'রে ওঁর এত জ্ঞান হ'ল জানিস? বারো বছর চেষ্টা ক'রেও নাকি লোকটা অ-আ-ক-খ শিখতে পারে নি। তাই গুরু দিয়েছিল তাড়িয়ে। সেই অবস্থায় দেশে ফিরতে ফিরতে এক জায়গায় দেখলেন—পাথর-বাঁধানো কুয়াতলায় মাটির কলসী রেখে রেখে পাথরে গর্ত হয়েছে। ওঁর মনে হ'ল যে মাটির কলসী রেখে রেখে পাথরে যদি দাগ পড়ে, আমার মাথায় লেখাপড়ার দাগ

কাটবে না? যেমন ভাবা অমনি কাজ, চেষ্টা ক'রে ক'রে দিগ্‌গজ পণ্ডিত হয়ে গেলেন।'

দুরাশায় ও হতাশায় কানুর চোখ ছল্ ছল্ ক'রে উঠত। সে অধীর আগ্রহে প্রশ্ন করত, 'আমাকে একটু পড়া বলে দেবে ন'দা?'

বিমর্ষমুখে অরুণ জবাব দিত, 'সে কি আর হবে? মা, বাবা দাদা— দেখলেই খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করবে। না, সে আর হয় না!'

সে যে আর হয় না, তা মনে মনে কেমন ক'রে কানুও বুঝতে পারে! সে আশা আর সে পোষণ করে না। শুধু অন্ধকার কুয়ার মধ্যেকার প্রাণীর মত মধ্যে মধ্যে আলোর জন্যে যখন ওর প্রাণ ছটফট ক'রে ওঠে, তখন কোন এক ফাঁকে সময় ক'রে ছুটে আসে অরুণের কাছেই, 'আচ্ছা ন'দা কংগ্রেস কাকে বলে? সে কি একটা লোক না অনেক লোক? একটা সভা? সেখানে কি হয়?'

কিংবা 'গান্ধী কে? রবি ঠাকুর কে? বই লেখেন? কী বই?' এমনি সব উদ্ভট প্রশ্ন। অরুণও সাধ্যমত ও সময়মত ওর সে সব প্রশ্নের জবাব দিত। এই একটিমাত্র লোককে কানুর মনে হ'ত আত্মীয়—ওর অতল অন্ধকারে-ডুবে-যাওয়া-মন ওকেই মনে করত অবলম্বন। আর সেই সামান্য সহানুভূতির কৃতজ্ঞতায় কানু ন'দার কোন কাজ করতে পারলে যেন বেঁচে যেত। নিজে যেচে অরুণের জুতোয় কালি মাখিয়ে বুরুশ ক'রে দিত। স্নানের সময় শত কাজ ফেলেও অরুণের কাপড় গামছা কলতলায় এনে সাজিয়ে রাখত, অবসর পেলেই খাওয়ার সময় একটা পাখা জোগাড় ক'রে এনে দাঁড়িয়ে বাতাস করত। মেজগিন্নী ইদানীং সেজন্য আড়ালে মুখ টিপে হেসে বলতেন, 'ছেলে আমার বৌ পেয়েছে বিয়ে না ক'রেই। তা বক্তৃতার গুণ আছে বাপু বলতেই হবে! আর ও ছোঁড়াটাও যেহেতু বোকা। অরুণের ঐ সব আবোল-তাবোল বকুনিতে কী রস পায় বল্ দেখি—'

এদিকে কানু মনে মনে করুণার চোখে দেখত এ বাড়ীর বাকী ছেলেদের! ইস্কুল, গাদা গাদা বই, বাড়ীতে পড়াবার জন্যে মাষ্টার—তবু ওদের পড়া হয় না। এরা ত ভদ্রঘরের ছেলে, তার মত ধ'রে জন্মায় নি—তবু কি বুঝতে পারে না পড়ার মর্ম? এর পর কী করবে, কী খাবে? তার ত তবু বাসন-মাজার পথটা খোলা ছিল, এঁদের তো তাও নেই!

এ দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ হচ্ছে অরুণ দাদাবাবু, ন'দা। সত্যি অমন ছেলে একটাও নেই।

অরুণের কথা মনে হ'লে এ অন্ধকূপে চাকরি করার দুঃখ সে প্রায় ভুলতে বসে।

৮

আরও দু'টি মহিলা এ বাড়ীতে ইদানীং কানুকে কিছু স্নেহের চোখে দেখতে শুরু করেছেন, কিন্তু কে জানে কানু তাদের ওপর শ্রদ্ধা রাখতে পারে না। বরং মনে মনে সে যেন কেমন একটা অস্বস্তিই অনুভব করে। ওঁদের এ স্নেহের যেন অর্থ খুঁজে পায় না—কেমন যেন, কী যেন ওঁদের ব্যবহার।

একজন হচ্ছেন ছোট মা অর্থাৎ ছোট গিন্নী। ছোটকর্তার স্ত্রী বনলতা।

ছোটকর্তার বয়স খুব বেশি না, বছর চল্লিশ, সে হিসেবেও বনলতা ছোট। কারণ সত্যেন বাবু কিছু বেশি বয়সেই বিয়ে করেছেন। বনলতার বয়স পঁচিশ ছাব্বিশের বেশি নয়।

বনলতাও এ বাড়ী[illegible]াকদের অবজ্ঞা বরং যেন বিদ্বেষের চোখেই দেখে। তার বাপের বাড়ীতে যে ঐশ্বর্যের মধ্যে সে মানুষ হয়েছে তার পর এখানে এসে থাকা তার পক্ষে কষ্টকর। এরা প্রত্যহ বায়োস্কোপ দেখে না, থিয়েটার দেখে, তাও কদাচিৎ। অন্য কোন আমোদ আহ্লাদের আয়োজন নেই। পুরুষগুলো যেন কেমন,—আড্ডা আর বন্ধুবান্ধব, এই নিয়েই থাকতে ভালবাসে। ঘরে এল ত খবরের কাগজ মুখে ক'রে বসল। কী যে এদের আছে তা সে ঠিক পায় না—কি দেখে যে বাবা করকরে দশহাজার টাকা গুনে দিয়ে এ বাড়ীতে বিয়ে দিলেন তা তিনিই জানেন। এই কথাগুলো প্রায় প্রত্যহই একবার ক'রে বনলতা কারোর না কারোর কাছে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলে। অবশ্য মেজগিন্নীও লোকাভাবে নিজের ঝিকেই দশবার ক'রে শোনান—'ছোটগিন্নীর বড়মানুষি দেখে আর বাঁচি না, ওরা কিছু পয়সা করেছে বটে, তবে এক পুরুষে। তাও ওর বাবা একটা বিলিতী কোম্পানীর বেনিয়ান ছিলেন এই পর্যন্ত! আমরা বটে, সাতপুরুষ নাম বলে যাবো, একডাকে চিনবে লোকে। কতবড় জমিদারের বংশ আমরা, ঠাকুর্দাকে কোম্পানী সুদ্ধু বাঘের মত ভয় করত। কৈ আমরা ত অমন বড়-মানুষি দেখতে পারি না!'

বনলতার দুটি ছেলে হয়ে অল্প বয়সেই মারা গেছে, তারপর বছরতিনেক আর হয় নি। দেহের গঠন ভাল, দেখতেও সুশ্রী। কিন্তু এ-বাড়ীর ধারা—অর্থাৎ মোটা হওয়া—তাকেও বাদ দেয় নি। এখনও তত মোটা হয়নি বটে কিন্তু বছর তিনেক পরেই যে মেজ বা বড় গিন্নীর সঙ্গে পাল্লা দেবে তাতে

কোন সংশয় নেই'। তার ছেলেপুলে নেই, তার ওপর একটি ঝি আছে নিজস্ব, সুতরাং কোনই কাজ নেই। ক্লান্তভাবে চুপ ক'রে বসে থাকা, নয়ত একটা কিছু বোনা কিংবা নভেল পড়া—সবগুলোতেই তার অরুচি ধরে গেছে। আরও মুস্কিল হয়েছে তার, বড় জায়েরা তার চেয়ে অনেক বড়, বড় জাদের পুত্রবধূরা সম্পর্কে ছোট, সুতরাং সে কারুর সঙ্গেই মিশতে বা আড্ডা দিতে পারে না।

এহেন বনলতা কে জানে কেন—প্রায় মাস-আষ্টেক এ বাড়ীতে কাটাবার পর হঠাৎ কানুর ওপর সদয় হয়ে উঠেছে। যখন তখন ডেকে পাঠায়, কেবলই কাজের ছুতো করে, এবং নিজের ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করে। বলে, 'বোস্ না একটু কানু—নিচে গেলেই ত মানদা খাটাবে। আমার ঘরে কাজে এসেছিস, এখানে দেরি হ'লে কেউ কিছু বলতে পারবে না। এ হ'ল হরি ঘোষের গোয়াল—বুঝলি না, এখানে যতটা পারিস সময় চুরি ক'রে নিবি। এখানে কি কেউ আর বলবে. তুই এবার একটু বিশ্রাম কর।"

কিংবা বলে, 'তুই বড্ড বোকা, ইচ্ছে ক'রে মানদার খপ্পরে পড়তে যাস। দু'মিনিট বোস্ না স্থির হয়ে। তুই বোকা বলেই মানদা অমন গাধার মত খাটায় তোকে।'

বিব্রত এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় কানু হয়ত কি করবে ভেবে না পেয়ে, বনলতার অবাধ্য হওয়া উচিত কিনা বুঝতে না পেরে, একটু বসে। তখন বনলতা প্রশ্ন করতে শুরু করে, 'তোর মা কত দিন মারা গেছে রে? এর আগে কোথায় কোথায় কাজ করতিস? তারা কেমন মনিব ছিল? কত টাকা জমিয়েছিস্?'—ইত্যাদি।

এসব প্রশ্ন ইতিপূর্বেই বহুবার করা হয়ে গেছে। তবু যে কেন আবার এই খবরগুলোই ছোটমা জানতে চান তা কানু বোঝে না। এই ক'টা খবর কি আর তাঁর এতবার শুনেও মনে থাকে না? আর তা যদি নাই থাকে ত জিজ্ঞাসা ক'রে জানবার দরকারটা কি?' মনে ক'রে রাখার বৃথা চেষ্টা কেন? একই কথা বার বার ব'লে কানুর আর বলতে ভাল লাগে না, বিরক্তি বোধ হয়। আগে খুব উৎসাহ-সহকারে গল্প করত। যদিচ কেমন ক'রে ওর একটা সহজাত সংস্কারবশে শচীর ইতিহাসটা চেপে যেত বরাবরই।......ইদানীং তাই বনলতা এইসব পুরাতন প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি শুরু করলে কোনমতে এক-আধটা উত্তর দিয়ে বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করত।

বনলতা সেটা লক্ষ্য করেছিল। সে বলত, 'তুই অমন ছট্‌ফট্‌ করিস কেন রে কানু? দু' মিনিট তোর বসতে ইচ্ছে করে না?'

অপ্রতিভ কানুকে তখন বলতে হ'ত অগত্যা, 'নিচে যে বিস্তর কাজ পড়ে রয়েছে ছোটমা!'

ছোটমা তার উত্তরে বলত, 'যে কাজ পড়ে থাকলে চলে তা দশমিনিট বেশি পড়ে থাকলেও কিছু ক্ষতি হবে না। আর যা জরুরী কাজ তা নিশ্চয়ই এতক্ষণ পড়ে নেই, সে কাজ ত কারুর জন্যে বসে থাকে না—কেউ না কেউ সেরেই ফেলেছে।'

কানুকে এর পর আরও দু-দশ মিনিট বসতে হ'ত—তারপর কোন একটা বিশেষ কাজ স্মরণ ক'রে পালাত।

বনলতার আসল কথাটা কানু বুঝতে পারে। বেচারা! ওর গল্প করবার লোক নেই ত কেউ এ বাড়ীতে—কথা কইবার লোকের জন্যে ছটফট করে। কিন্তু কানুর যে কেমন লজ্জা করে, ভয়ও করে একটু একটু, কাজকর্ম ফেলে ওপরের মহলে বসে আড্ডা দিলে কেউ যদি কিছু বলে? তা ছাড়া, ছোটমা কি আর গল্প করবার কথা খুঁজে পান না? সেই এক কথা একশ' বার!

সেটা বনলতাও বোঝে, কিন্তু আর কী কথা কানুর সঙ্গে বলা যায় সে ভেবে পায় না। দু' একদিন অন্য দু'একটা কথাও পাড়ে, 'হ্যাঁরে, মানদা কেমন লোক বলে তোর মনে হয়?' কিংবা 'ঠাকুর খুব চুরি করে, না রে?'

মুশকিল হচ্ছে এই যে, এই সব প্রশ্নেরও সরল জবাব দেওয়া সম্ভব নয়। এত দিনের চাকরির ফলে কানু অন্তত এটা বুঝেছে যে, তাকে যাদের সঙ্গে কাজ করতে হবে তাদের চটিয়ে লাভ নেই। চুক্‌লি খেলে তাদের কোন ক্ষতিও হবে না, মাঝখান থেকে এ কথাটা ওদের কানে উঠলে তার শত্রুবৃদ্ধি! সুতরাং এ সব প্রশ্নের সে কোন জবাব না দিয়ে সলজ্জ হাসি মুখে চুপ ক'রে থাকে।

বনলতাকে তখন অন্য কথা খুঁজতে হয়। ফলে এমন সব কথা এক এক সময় বলে বসে যে কানু তাতে আরও অপ্রস্তুত হয়ে যায়। একদিন হঠাৎ বলে বসল, 'এ বাড়ীর ভাতের গুণ আছে কানু, এই এক বছরে তুই অনেক বেড়ে গিয়েছিস্!'

তারপর বনলতা কানুর হাত ধরে টেনে নিয়ে যায় দেওয়ালের দিকে। নিজে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে পাশে দাঁড়িয়ে বলে—'ইস্, আমার চেয়েও তুই ঢ্যাঙা হয়ে গেছিস্ যে রে!'

লজ্জায় কানুর মাথাটা আরও নুয়ে পড়ে—হঠাৎ দৌড়ে পালিয়ে যায় ঘর ছেড়ে।

তারপর বৈঠকখানার সামনে হ্যাটর্যাকের আয়নাটায় নিজেকে ভাল ক'রে দেখে—সত্যিই সে হঠাৎ যেন খুব বড় আর ঢ্যাঙ্গা হয়ে গেছে। এইটেকেই বাড়ের মুখ বলে বোধ হয়। কিন্তু এ বাড়ীর ভাতের গুণ বললেন কেন ছোট মা? তাঁর কি বিশ্বাস কানু খুব বেশী খায়?

কানু একটু ক্ষুণ্ণই হ'ল!

আর একদিন অমনি বনলতা ওর হাতখানা ধরে হিড় হিড় ক'রে টেনে আয়নার সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে—'কানু তোর দাড়ি গজিয়েছে যে রে! কতই বা বয়স হ'ল তোর—এরই মধ্যে দাড়ি! যা, তোর এবার খরচা বাড়ল—দাড়ী কামাতে হবে!'

লজ্জায় কানুর গা-টা শিব্ শিব্ ক'রে ওঠে। ছোট-মা আস্ত পাগল। কোন জ্ঞানগম্যি নেই যেন। দোরে পর্দা দেওয়া আছে বটে, তবু কেউ যদি দেখে ফেলত! নিশ্চয়ই ওঁকে বদ্ধ পাগল মনে করত। এমন ক'রে কি চাকর-বাকরের গা ছুঁতে আছে! এতে ওঁদের সম্মান থাকে না। আর তাছাড়া এই সব গোঁফদাড়ির কথা শুনলে যে ওর লজ্জা করে! ছি!

তবে চোখও খুব বটে ছোট-মার। কানু আয়নার সামনে অনেকক্ষণ ধরে মুখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখে—একটা শ্যামল রেখা পড়েছে বটে গালে। জুলপির নিচে থেকে চিবুকের প্রান্ত পর্যন্ত, কিন্তু সে এখনও তেমন কিছু স্পষ্ট নয়। অথচ দূর থেকেই ছোট-মা ঠাওর পেলেন? আশ্চর্য!

আর একটি চীজ হচ্ছেন এ বাড়ীর পিসিমণি।

পিসিমণি অর্থাৎ অমলা, বড়বাবুদের বিধবা বোন। সকলের ছোট বোন ইনি, সত্যেনবাবুর চেয়েও বয়সে ঢের ছোট। এখন বোধ হয় ত্রিশ বত্রিশ বছর বয়স হবে। ষোল বছর বয়সে বিধবা হয়ে হাতে কিছু টাকা এবং একটা ভাড়াটে বাড়ীর মালিকানা নিয়ে এ-বাড়ীতে ফিরে এসেছিলেন, সেই থেকে এ-বাড়ীতেই আছেন। তার কারণ, একে তিনি সকলের ছোট আদরের বোন, তায় হাতে নগদ টাকা এবং মাসিক ষাট-সত্তর টাকা আয় আছে। সকলেই তাঁকে খাতির করে, সমীহও করে। সব ভাইয়েরই আশা, একদিন তাঁরই কোন ছেলে ঐ টাকার মালিক হবে।

অমলা দেখতে খুব সুশ্রী নন্, তবে তাঁর রংটা এ-বাড়ীর বাকী সকলেরই মত খুব ফরসা! চওড়া কালাপাড় কাপড় পরেন, হাতে চুড়ি ও গলায় হার আছে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত কানে পান্না-বসানো ফুল ছিল, এমন কি কানুও এসে দেখেছে, সম্প্রতি খুলে রেখেছেন। পান-দোক্তা খান খুব, আর খুব নভেল পড়েন! একটা লাইব্রেরী থেকে ত্ব'খানা ক'রে বই আসে শুধু ওঁরই জন্য।

তাতে অবশ্য কানুর কি? বরং কানুর ওপর তিনি খুবই প্রসন্ন, ইদানীং অকারণেই টাকাটা-সিকেটা অকস্মাৎ ওর হাতে গুজে দেন; কানু অবাক্ হয়ে মুখের দিকে চাইলে বলেন, 'রেখে দে, মিষ্টি খাস।' নিজের ঘরে স্টোভ জ্বেলে কড়াইশুঁটির কচুরি কিংবা সিঙ্গাড়া তৈরী করলে কানুকে ডেকে বলেন, 'আয় কানু, ঘরে এসে বসে ত্বখানা খেয়ে যা দেখি! সাতশ' রাক্ষসীর ঘর—দেখিয়ে দিলে সবাইকে দিতে হয়। তুই বরং তার চেয়ে ত্বখানা এখানেই খেয়ে যা।' এমন কি এক একদিন, কোথাও কিছু নেই, মানদাকে ডেকে ধমক দেন—'তোরা বাপু ছেলেটাকে ভালমানুষ পেয়ে বড্ড খাটাস! কেন, অত কাজ কি ওর করবার কথা?'

তবু অমলাকে কানুর আদৌ ভাল লাগে না। কেমন যেন একটা সন্দিগ্ধ ছোঁক্ছোঁকে ভাব সর্বদা। সবাইকে যেন সন্দেহের চোখে দেখেন—গোয়েন্দা-গিরির চাহনি। নিঃশব্দে হাঁটেন, কান খাড়া ক'রে। লোকের ঘরের পর্দার বাইরে এসে থম্কে দাঁড়ানো তাঁর এক মুদ্রাদোষ। বিশেষত নবিবাহিত ভাইপোদের ঘরের দিকেই ঝোঁকটা যেন বেশি। ধরা পড়ে গেলে হেসে গড়িয়ে পড়েন, ভাইপোদের নিয়ে এমন রসিকতা করেন যেটা পিসীর করা উচিত নয়। বলেন, 'কী করব, ভাইপোরা যদি সমবয়সী হয় ত ঠাট্টা-তামাসা করব না?' কানুর চোখে এটা যেন খারাপ লাগে। ভাইপো-বৌরাও কেউ ওঁকে দেখতে পারে না এই জন্যে। নিজেরা বলাবলি করে 'হলেনই বা সমবয়সী, তবু মা ছেলে সম্পর্ক ত! ওঁর কি আর এ রকম ক'রে আড়ি পাতা উচিত? আর বাসর কি ফুলশয্যা হ'লেও না হয় কথা ছিল, বারোমাস এ কি?'

তাঁর গোয়েন্দাগিরি থেকে কানুও বাদ যায় না।

কতদিন ছোটমার ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেছে পিসিমণিকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকতে। ওকে দেখে কেমন একরকম ভাবে হেসে বলেছেন, 'কী রে —ছোটগিন্নির সঙ্গে এত কিসের গল্প? ছোটমার যে খুব টান দেখি তোর ওপর, তোকে ছাড়তেই চান না!' আবার কোনদিন হয়ত মুখটিপে হেসে বলেছেন, 'বেশ মানুষ, না? মনিব হ'তে হয় ত এমনি।'

কানু একদিন এই প্রশ্নের উত্তরে বলেছিল, 'মনিব আপনারা সবাই-ই ভাল পিসিমণি। শুধু ছোট-মা কেন ?'

'বাঃ! এই যে, বেশ কথা শিখে ফেলেছিস ত! কানু এবার মানুষ হয়ে গেল। আর কি!' এই বলে ওর কাঁধটা ধরে একটা ঝাঁকানি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন।

অথচ উনিও ইদানীং ওকে ঘরে পেলে কথায় কথায় আটকে রাখতেই চান। কোন জিনিস দিতে হয়ত ওপরে গেছে, উনি ঘুরে এমনভাবে দোরের কাছে দাঁড়ালেন যে না সরলে দোর দিয়ে বেরোনো যায় না। বলেন, 'আহা এই গরমে ছুটোছুটি ক'রে ওপরে এসেছিস! দাঁড়া, দাঁড়া, একটু পাখার নিচে দাঁড়িয়ে যা।'

একদিন ত ওকে ধরে জোর ক'রে নিজের গামছাটা দিয়ে ওর মুখ গলা মুছিয়ে দিলেন। কানু তার জন্যে যেন নিজেকেই অপরাধী মনে করে, পালিয়ে আসতে পারলে বাঁচে।

ওঁরা চাকর-বাকরদের মানুষ বলে মনে করেন, তাদের আত্মজনের মতই দেখেন—এটা যদি মনে করতে পারত কানু ত সহজে এবং সকৃতজ্ঞ চিত্তেই সে এই প্রীতির নিদর্শনগুলো গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু সে যত ছেলেমানুষ এবং যত বোকাই হোক্—অন্যান্য অসংখ্য দাসদাসীর ক্ষেত্রে এবং ইতিপূর্বে, আর এখনও অন্য মনিবদের ব্যবহারে, সে দেখেছে যে এঁরা শুধু স্বার্থপর নন, স্বার্থসর্বস্ব। এঁরা ঝি-চাকরদের মানুষ বলে মনে ত করেনই না, বরং তারা যে মাইনে নেয়, সেটাকেও এঁরা শয়তানি বলে মনে করেন, অন্যায় বলে মনে করেন। নিতান্ত বাধ্য হয়েই দেন।

এই ত, এ বাড়ীতে আসবার কিছুদিন পরেই, বড়বাবু স্বয়ং কি কাণ্ডটাই না করলেন! কী একটা সামান্য তুচ্ছ কারণে, কোন-এক অসতর্কতার অজুহাতে ওকে 'হারামজাদা', 'শুয়ার কি বাচ্ছা'—কিছু বলতে বাকী রাখলেন না। কানটা এমন জোরে পাক্ দিয়ে দিলেন যে সন্ধ্যা পর্যন্ত জ্বালা ক'রে ক'রে উঠেছে। এ ঘটনাটা ঘটল সকাল বেলা ন'টা দশটা নাগাদ, আড়াইটের সময় কোথা থেকে ফিরলেন খুব চিন্তিতমুখে, অন্যমনস্কভাবে। তিনি যখন ওপরে উঠবেন কানু তখন নামছে—সিঁড়ির কোণটায় ওঁকে দেখেই কানু সভয়ে সরে যাচ্ছিল, হঠাৎ বড়বাবুই ওকে দেখতে পেয়ে খুব স্নিগ্ধ কণ্ঠে ডাকলেন, 'বাবা কানাই, একবার শুনে যাস্ ত!'

সর্বনাশ! কানুর ত প্রথমটা প্রাণ উড়ে গিয়েছিল, তবু কণ্ঠস্বরটা এত

মিষ্ট ঠেকল যে শেষ পর্যন্ত ভরসা ক'রে ওঁর পিছু পিছু বৈঠকখানা ঘরে গিয়ে পৌছল। তখন সে ঘর নির্জন, সেখানে কারুর থাকবার কথাও নয়! বড়বাবু ওকে একেবারে কাছে ডেকে, কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন, 'হ্যাঁরে কানু, ওবেলা তোকে বড় বেশি বকেছি, না? তা ছাখ, কিছু মনে করিস নি। মনিব পিতার তুল্য, বুঝলি? দোষ দেখলে বকবে, আবার গুণ দেখলে কাছে টেনে নেবে। আর আমারই কি মাথার ঠিক আছে, কখন কি ক'রে ফেলি, নিজেরই হিসেব থাকে না!'

এই পর্যন্ত বলে, গলার স্বরটা একটু নামিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে, তা দেখ, তোর কাছে গোটা-দশেক টাকা হবে? হঠাৎ বড্ড দরকার পড়ে গেছে—আমি এই সন্ধ্যের পর বাড়ী ফিরেই দিয়ে দেব, বুঝলি। কিচ্ছু ভাবিস্‌নি।'

মনিবের টাকা ধার চাওয়া, কানুর অভিজ্ঞতায় এই প্রথম। সে দৌড়ে গেল বীণাবৌদির কাছে—ওঁর কাছেই তার মাইনের টাকা জমা থাকে। বীণাবৌদি অমন অসময়ে ওকে টাকা চাইতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'এমন হঠাৎ অসময়ে—দশ-দশটা টাকা, কী হবে রে?'

'বড়বাবু ধার চাইছেন!' হাঁপাতে হাঁপাতে বলে কানু।

কারণটা শুনে তাঁর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। তিনি বললেন, 'ওরে বোকা, এ বাড়ীর মানুষদের এখনও চিন্‌লি না? ওটা কি আর তুই ফেরৎ পাবি?…যা, তোকে দিতে হবে না, তুই অন্য কাজে যা—'

কানুর কথাটা বিশ্বাস হ'ল না। সে বললে, 'কি যে বলেন বৌদি, বড়বাবু নিজে নিচ্ছেন। তা ছাড়া আমি যে বলে এসেছি, তিনি অপেক্ষা করছেন।'

বীণাবৌদি একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে কতকটা আপন মনেই বললেন, 'এরা মানুষ নয়—চামার! ছিঃ! এমন প্রবৃত্তিও মানুষের হয়!'

তারপর আলমারি খুলে পাঁচটা টাকা ওর হাতে দিয়ে বললেন, 'যা, এইটে এখন দিগে যা। বলিস যে, বীণাবৌদির কাছে টাকা থাকে, তিনি খরচ ক'রে ফেলেছেন।…ওঁর এখন জুয়াখেলার টান—যা দিবি তাই নেবেন।'

'জুয়াখেলা? কিসের জুয়াখেলা বৌদি?'

'ঘোড়দৌড়। আজ যে শনিবার, তা জানিস না?'

কানু অবশ্য পাঁচটা টাকা দিতে বড়বাবু তাই নিলেন, তবে দশটা টাকা না পেয়ে একটু ক্ষুণ্ণ হ'লেন বলেই মনে হ'ল। সেজন্য কানুর কেমন লজ্জা বোধ হ'তে লাগল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল বীণাবৌদির কথাই ঠিক। বড়বাবু বাড়ী

ফিরলেন অনেক রাত্রে, গম্ভীর মুখে। সেদিন ত নয়ই, পরের দিনও কানুর কথা তাঁর মনে পড়ল না। দু' তিন দিন পরে কানুর সঙ্গে চোখোচোখি হ'ল কিন্তু তিনি এমন ভাবে চাইলেন যেন কানুকে তিনি চেনেন না। তাঁর সেই গম্ভীর, রাশভারী মুখের চেহারা দেখে কানু কথা বলা ত দূরে থাক্, কোনমতে যেন সামনে থেকে পালিয়ে বাঁচল। সে টাকা আর তিনি কোনদিনই ফেরৎ দিলেন না, কানুও চাইতে পারলে না। তখন ত নয়ই, পরে চাকরি ছেড়ে চলে আসবার সময়ও পারে নি।

টাকা না দিন্—আর যদি একদিনও বড়বাবু ওকে ডেকে কথা বলতেন, এমন কি একটু স্নিগ্ধ চোখে চাইতেন, তাহ'লেই কানু কৃতার্থ হয়ে যেত। কিন্তু তাঁর চোখে আর কোনদিনই কোন পরিচয় কি স্বীকৃতি দেখা যায় নি। এমন কি, এর পরেও, কোন তুচ্ছ কারণে অতিরিক্ত তিরস্কার করবার সময়ও ওর কাছে তাঁর সামান্য ঋণের কথা মনে পড়ে নি।

শুধু বড়বাবু কেন, এ বাড়ীর অনেক বাবুই শনিবার দিন হ'লে টাকাটা সিকেটা নির্বিচারে ওর কাছ থেকে ধার করেছেন। বীণাবৌদি বল্‌তেন যে, 'শনিবার ঘোড়দৌড়ের দিন, ওদিনটা কোন লজ্জা-ঘেন্না থাকে না ওদের, খুব সাবধান। আর ও টাকা কোনদিনই ফেরৎ পাবি না, মনে রাখিস!'

ঘোড়দৌড়টা যে কি তা কানু জানত না। বীণাবৌদির কাছেই শুনেছে। আশ্চর্য! মাঠে ঘোড়া দৌড়বে, তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে জুয়াখেলা? এর মানে কি? কিন্তু সে যাই হোক্—বীণাবৌদির শত নিষেধেও সে 'না' বলতে পারেনি একেবারে। তিনি ইদানীং টাকা দিতেন না—কানুর নিজের কাছে যা দু' এক টাকা থাকত, কিম্বা বকশিশ পাওয়ার টাকা, সেগুলো সবই চলে যেত ওঁদের খর্পরে। কেউ কেউ একবারের দেনা শোধ না ক'রেও অনায়াসে আবার চাইতেন। কিন্তু পরক্ষণেই আর সে-কথা তাঁদের মনে থাকত না। অন্য ঝি-চাকররা তাগাদা ক'রে আদায় করত, অনেক সময় তার জন্য বাঁকা বাঁকা কথাও শোনাত—কিন্তু কানু সে সব কিছুই পারত না। বরং সে নিজেই যেন চোর হয়ে থাকত এঁদের কাছে। ইদানীং সে বুঝেছে এঁরা এই রকমই—সামান্য একটু স্বীকৃতি কিংবা অন্তত একটু কোমল ব্যবহারও ঋণশোধের পরিবর্তে এঁদের কাছে পাবার আশা থাকে না।

তাই ছোট-মাদের ব্যবহারে কানু তার অশিক্ষিত, সভ্যতার-ছোঁয়াচ-হীন মনে কেমন একটা অস্বস্তি অনুভব করে। ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে বা বোঝাতে না পারলেও, এটা যে অস্বাস্থ্যকর কিছু তা আপনা-আপনিই অনুভব করে।

শুধু বুঝতে পারে না যে সেটা কী।

তাই বীণা-বৌদির কাছে যেমন নিঃসঙ্কোচে নিজের প্রশ্নটাকে দাবী করে, এঁদের কাছে তা কিছুতেই পারে না। এঁদের প্রশ্রয় ভালও লাগে না।

কিন্তু ছেলেমানুষ চিরদিনই ছেলেমানুষ থাকে না।

ন'দার কাছে কানু শুনেছে, কেমন ক'রে প্রথম মানব আদম প্রথম নারী ইভের পরামর্শে জ্ঞান-গাছের ফল খেয়েছিল। ক্রীশ্চানদের পুরাণে নাকি লেখা আছে যে, সেই ফল খেয়ে জ্ঞান আসার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শোক-তাপ-দুঃখ-লজ্জা সব অনুভব করতে শিখল। মানুষ যে অনুভূতিহীন স্বর্গরাজ্যে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করছিল তা থেকে বিচ্যুত হয়ে সে মর্ত্যভূমে এসে পড়ল।

সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল কানুকে পরিবেষণ করলে মানদা ঝি।

মানদা ঝিয়ের বয়স কত তা কানু ঠাওর পায় না, তবে তাকে পিসিমণির বয়সী বলেই মনে হয়। হয়ত কিছু বেশী। দেখতে শুনতে খুব যে ভাল তা নয়, এমনি একটা আলগা শ্রী আছে। ব্যঙ্গ বিদ্রূপে ওর ক্ষুরধার রসনা যদি সদাই ব্যস্ত না থাকত এবং কলহপরায়ণতায় যদি সে অমন ক'রে সবাইকে ছাপিয়ে না যেত, তাহ'লে মানুষটাকে মোটামুটি ভালই বলা চলত। কিন্তু সর্বদা ঝগড়া ক'রে অপর সমস্ত দাসদাসীর উপরে নিজের প্রতিষ্ঠা বজায় রাখতে তার মুখটা যেন চিরকালের মত ঝগড়ার ভঙ্গীতেই বিকৃত হয়ে গিয়েছিল।

এই মানদার সঙ্গে ঠাকুরের কি-একটা যোগাযোগ আছে সেটা কানু মাস কতক যেতেই আবিষ্কার করেছিল। ঠাকুর উড়িষ্যাদেশবাসী, কিন্তু বহুকাল বাংলাদেশে থাকতে থাকতে কথাবার্তা চালচলনে বাঙালীই হয়ে গেছে। গৌরবর্ণ, ছিপছিপে, স্বভাবটিও মিষ্টি।

ঠাকুরও সাধারণ সংসারের, মানদাও তাই। সুতরাং ওর সঙ্গেই এর কাজ। এ দু'জনের অন্তরঙ্গতা অস্বাভাবিকও নয়, অশোভনও নয়। কিন্তু সে অন্তরঙ্গতার ফলে দু'জনের যে-শ্রেণীর রসিকতা বা আলাপ-আলোচনা চলে তার অর্ধেক কথা না বুঝলেও কানু বোঝে যে সেটা শোভন বা সঙ্গত নয়। কতকগুলো কথা কানু ছেলেবেলা থেকেই তার পাড়াতে শুনে এসেছে। তার মানে না বুঝলেও জানে সেগুলো খারাপ কথা। মানে কতকগুলো কথার জানেও সে, মানবদেহের কোন কোন বিকৃত সংজ্ঞা—কিন্তু সেগুলো ভদ্রসমাজে উচ্চারিত হতে তার ক'বছরের অভিজ্ঞতায় অন্তত শোনে নি। যে সমাজে তা ছেলেবেলায় মানুষ, সেখানেও কুন্তী, মোক্ষদা, সুশীলা, এরাও নিতান্ত ঝগড়ার মুখে ছাড়া কখনও তা উচ্চারণ করত না। পরস্পরকে গালাগালি

করবার সময়ই দরকার হ'ত। কিন্তু এরা সেগুলো এ ছোকরা এদের অনায়াসে সহজ কথাবার্তার সঙ্গেই ব্যবহার করে। আর হ'ল কি, সাথে অঙ্গভঙ্গী ও চোখমুখের ভাব প্রকাশ পায়—তাতে অনেক কথা, দারোয়ানরা বহু চেষ্টা ক'রেও মানে বুঝতে পারে নি, তার সম্যক্ অর্থ সবাই সকাল সূর্যোদয়ের মতই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ওধারে মেজ-

এতে কানু যেন মনে মনে আঘাত পায় একটা। সেটা যে কি কোন খবর তা বোঝে না। এমন কিছু ভব্য পরিবেশে সে মানুষ হয় নি বা ঠাকুর-ছেলেবেলা থেকেই কাজে লেগে নিজের আত্মীয়স্বজনকে ছেড়ে আসার ফলে—এবং কাজের চাপে নতুন পরিবেশেও ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে না পেরে, অনেক কথাই জানত না ও। বয়স বাড়লেও মন বুড়ো হয় নি। সহজাত সরলতার অনেকখানিই থেকে গিয়েছিল—যা স্বাভাবিক ভাবে হয়ত থাকত না। জগৎটাকে এমন চোখে সে দেখে নি। তাছাড়া একটা জ্ঞানস্পৃহা, এই সঙ্কীর্ণ অন্ধকূপ থেকে মুক্তি পেয়ে ভদ্রসমাজে স্থান পাবার দুরাশা তাকে অন্য দিকে টেনে রেখেছিল, সে এ পর্যন্ত ভাল ভাল কথার দিকেই কান পেতে রাখত। আর তার নিজের পরিমিত বুদ্ধির ক্ষীণ-শক্তিতে তাদের গ্রহণ করার প্রাণপণ চেষ্টাতেই তার মন ব্যস্ত থাকত। কুয়ায় থাকলেও কুয়ার দিকে চোখ ফেরাবার অবকাশ সে পায় নি, তার চোখ ছিল ঊর্ধ্বে—সূর্যালোকের দিকে। আজ তাই এ-সব কথা যেন নতুন ক'রে তাকে কুয়ার দিকেই দেখিয়ে দিল। না দেখিয়েও উপায় ছিল না—কারণ তার জগৎ, বিশেষ-ক'রে এখানে, এই দুটি লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর কারুর সঙ্গে মেশবার উপায় নেই। ন'দা ত বিদ্যুৎ-চমকের মতই দুর্লভ। এখানে পুকুর-পাড় নেই। এ বাড়ীর বাকী মানুষগুলোর সঙ্গেও মেশা সম্ভব নয়। মনকে উঁচু তারে বেঁধে রাখবে, সে অবকাশ বা অবলম্বন কৈ? বড় রাস্তার ধারে বাড়ী হ'লেও না-হয় দুটো বাইরের লোক দেখা যেত। এখানে আকাশই দেখা যায় না। উঠোনে এসে ওপর দিকে তাকিয়ে দেখলে হয়ত একফালি চোখে পড়ে কিন্তু সে অবসরও কম। মানদা তাকে বাজার করতে দেয় না—ছেলেমানুষ এই অজুহাতে। আসল কথা চুরিটা সে নিজে করতে চায়। ফিরে এসে ঠাকুরের সঙ্গে গল্প করে, 'সাড়ে তিনটে টাকার বাজার গুনে—চারগণ্ডা পয়সাও বাঁচে না।'

সুতরাং উপায় কি?

অনেক কথাই শুনতে ও শিখতে হয় কানুকে। মানুষের সম্ভোগের ও বাসনার সীমারেখা যে কোথাও টানা নেই, সেটা জেনে সে শিউরে ওঠে।

শুধু বুঝতে পারে না যে ·বকটা ও উন্নতির দিকটাই শুধু জেনেছে। আজও তাই বৌদি-বৌদিদ সম্পর্কের ব্যাপারটা সে সম্পূর্ণ জানে না—তবে আবছা এদের কাছে তা কিজের কাছেই যেন লজ্জিত হয় এ সব ইতিহাসে। ··মানুষ কিন্তু ছেলেমানু এই তার প্রথম মনে হয়। ঠাকুর ও মানদা যখন ওর সামনেই ন'দার কাছে ·জেদের মধ্যে অশ্লীল আলোচনা ক'রে হাসাহাসি করে, তখন ইভের পরামর্শে খ-মুখ রাঙা হয়ে ওঠে, কান-দুটো দিয়ে যেন আগুন বেরোতে লেখা আছে।

দুঃখ-লজ্জা·কিন্তু ক্রমশ সবই সয়ে যায়। বরং ইদানীং যেন কিছু কৌতূহলও অনুভব স্বচ্ছ করে। কান পেতে শোনে ইতিহাসগুলো। মানদা বলতেও পারে ভাল। বিশেষ ক'রে পরচর্চায় ও কুৎসাতেই যেন মানদার প্রতিভা খোলে। এ বাড়ীতে আছে সে বহুকাল। তার আগের ইতিহাসও দাসী-পরম্পরায় উত্তরাধিকার সূত্রে সে জেনেছে! ··· রসালো ক'রেই গল্প করে। বলে, 'বড় ঘরের বড় কথা, বললে কাটা যায় মাথা! যত বড় ঘর, তত বড় বড় কেচ্ছা! অমন পিরবিত্তি আমাদের ছোটনোকের ঘরেও নেই বাবু, যতই বলো!'

এই বলে দু হাত নেড়ে মুখে একটা বিকৃত ভঙ্গী ক'রে একটু থামে। হাত বাড়িয়ে একটা পান নিয়ে মুখে পোরে, তারপর তার সঙ্গে খানিকটা দোক্তা গুঁজে দিয়ে আবার শুরু করে, 'এমন সোন্দর সোন্দর বউ ঘরে, তা সেদিকে ত বাবুরা তাকাবে না—বাবুদের রাত এগারোটা অবদি বাইরে কাটানো চাই! বউগুলোর দোষ কি বলো?'

তার গল্প কিন্তু থামে না। শুরু করে এই বাড়ীর বড় বাবুদের ঠাকুর্দা মশাইয়ের আমলের কাহিনী, 'তেনার যখন বয়স কম ছিল, তখন একবার বাঁকড়ো-বিষ্টুপুর থেকে একজন ছোকরামত রাঁধুনী এল; ছেলেটা ভালই ছিল, আর দেখতেও তেমনি সোন্দর, গোড়াতে তার দোষ ছিল না···যত নষ্টের গোড়া ছিলেন ঐ মেজরানী, ঠাকুরটা এড়াবার চেষ্টা করেছিল অনেক—কিন্তু বড়নোকের বাড়ীতে গরীব মানুষের ক্ষ্যামতা আর কতটুকু?···ধমকের ঠ্যালায় বাগ মানলে।···রাজামশাই ছিলেন ভয়ানক কড়া মেজাজের নোক—এধারে খবরও ঠিক তেনার কাছে একদিন পৌছল। তখন এদের বোল-বোলাও খুব, সাতমহল বাড়ী, লোকজন কত—ভোজপুরী দরওয়ানই ছিল সাত-আটটা। ·বড় ঘরের নিয়ম হচ্ছে যে, কুকুরে যদি হাঁড়ি খেয়ে যায় ত কুকুর মারবে কিন্তু হাঁড়ি ফেলবে না! লোক জানাজানি না হয়। এ রকম যে কত এই বাড়ীর উঠোনে পুঁতে রাখা আছে তার ঠিক নেই—মাটি খুঁড়লে আজও

তাদের হাড়গোড় বেরোবে। সে যাই হোক, ঠাকুর-ছোকরা এসবে জানে না, সে ত বেশ মজাতেই আছে। এমন সময় একদিন হ'ল কি, সাঁঝের সময় চোখে চোখে ইসারা হয়ে গেল, ফটকে ফটকে তালা পড়ল, দারোয়ানরা সব তৈরী—বাড়ীর লোকজনদের ওপর হুকুম হয়ে গেছে যে, সবাই সকাল সকাল খেয়ে শুয়ে পড়বে, কোন গোলমাল শুনলেও উঠবে না। ওধারে মেজ-রানীকে ঘরে তালাবন্ধ ক'রে রাখা হয়েছে—কড়া পাহারা, তাঁরও কোন খবর দেবার উপায় নেই। তা দৈবের কল, আসল কথা আমাদের ছোক্‌রা ঠাকুর-মশাইয়ের পেরমাই ফুরোয় নি তাই, 'ফাই-ফরমাস' খাটবার একটা ঝি ছিল—তার হঠাৎ কি দয়া হ'ল—খবরটা সে এক ফাঁকে চুপি চুপি ওকে দিয়ে এল। ঠাকুর ত শুনে ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে নেগেছে। কি করবে, জান বাঁচাবার কোন উপায় নেই। শেষে এক মতলব মাথায় এল। করলে কি, ভাতটা চাপিয়ে পাইখানায় গেল গাড়ু হাতে ক'রে। তখনকার দিনের খাটা-পাইখানা ছিল খুব বড় বড়। ঠাকুরও ছিল রোগা-প্যাঁকা—কোনমতে সেই ফোঁকর দিয়ে গলে নিচে পড়ল, ময়লায় মাখামাখি, সর্বাঙ্গ ছ'ড়ে-কুটে অস্থির! তারপর মেথর খাটবার দোর দিয়ে এক ছুটে গঙ্গা। এধারে ভাত পুড়ে উঠতেই খবর হয়েছে, এতক্ষণ পাইখানায় কি করে—দ্যাখো দ্যাখো! আর দ্যাখো, ঠাকুর ত ততক্ষণে পগার পার! অবিশ্যি এরাও ছাড়বার পাত্তর নয়—সঙ্গে সঙ্গে লোক জুটল গঙ্গার পাড়ে, লেঠেল ছিল সব মাইনে-করা, তারা ঘাটে ঘাটে পাহারা দিতে লাগল। ঠাকুর বেচারী খানিকটা সাঁৎরে যেমন পাড়ে উঠতে যাবে, দেখে লেঠেল, আবার খানিকটা গিয়ে উঠতে যায়, দেখে সেখানেও লোক। কতক্ষণ আর সাঁতার দেয়? শেষে বামুনের ছেলে দেখে এক মাঝির দয়া হ'ল, সে নৌকোয় তুলে গঙ্গার পার করে দিলে।'

'এমনি কি একটা কেচ্ছা ওদের?' মানদা পা ছড়িয়ে গল্প করে, 'ঠাকুর্দা মশাই বুড়ো হয়ে অসুখে ভুগছেন যখন, তখনও কোন বেটার বৌ তাঁর ঘরে যেত না।···কারুর আর সে সব জানতে ত বাকী নেই। তারপর কর্তাবাবু মানে আমাদের বড় বাবুর বাবা—তেনার কথা আর নাই বা বললাম। বুড়ো থুথ্‌ড়ে হয়ে চোখে দেখতে পেতেন না, তবু ঘরে শুয়ে মরা হল না। যেখানে যেতেন সেইখানেই পড়ে ভিমি গেলেন। কলেঙ্কারের ভয়ে ছেলেরা মড়াটা কোনমতে ঢেকে-ঢুকে গাড়ী করে বাড়ী নিয়ে এল, তারপর পাঁচজনকে শুনিয়ে হরি-ন্যা দিয়ে বললে, তিনি এইমাত্র ম'লেন। তেনার আবার মাথায় অক্ত-চড়া ক্যাল্‌গিম ছিল কিনা—যে চাকরটা তাঁর সঙ্গে যেত, কেষ্টা, তার ওপর সন্দ

—সাবান

শুধু বুঝতে, গরম ক'রে ফেললেন এমন যে, মাথায় অক্ত চড়ে গেল সাঁ সাঁ ক'রে। তাই তাতেই অক্কা পেলেন শেষ অব্দি। ··· এ-ত আমার স্বাথ্ ভা। তখন এ দেশে আমি সবে এ বাড়ীতে এসেছি।·· আমার মাও এ দিগরে অনেক বড়লোকের বাড়ী কাজ ক'রে গেছে—কা'কে ছেড়ে কাকে ধরবে বলো, ঘর ঘর এই কেচ্ছা।···তবে হ্যাঁ, পয়সার জোর কমে এসেছে বলে এখন বার-টান্ অনেকটা কমেছে বটে, তবে তেম্নি ঘরে ঘরে শুরু হয়েছে শিবের গাজন।'

মানদা বলে যায় সংক্ষেই, বিস্মিত হতভম্ব কানু অবাক হয়ে শোনে। যেন কোন রূঢ় আঘাত লেগে সে জেগে ওঠে। বিষাক্ত স্পর্শে তার সন্ত-জাগ্রত যৌবনও একটু একটু ক'রে সজাগ হয় বটে কিন্তু সেটাতে কোন আনন্দ পায় না সে। ক্লেদাক্ত মন ঘিন্ ঘিন্-ক'রে ওঠে। অথচ ক্রমে তারও লালসা জেগে ওঠে রক্তের মধ্যে। সেটার স্পষ্ট কোন স্বরূপ অনুভব করতে পারে না, শুধু কেমন একটা উন্মনা, উতলা হয়ে ওঠে। ঠাকুর ও মানদাকে আজকাল বসে একান্তে হাসি-তামাসা করতে দেখলেই খিট্ খিট্ করে—অকারণে ঝগড়া বাধায়।

মানদা হেসে ঠাকুরকে বলে, 'দেখেছ ঠাকুর মশাই, ছোঁড়ার পাখ্না গজাচ্ছে ক্রেমশ। কী রকম মুখচোরা ছিল, ভরসা ক'রে মুখ তুলে কথা বল্‌তে পারত না, এখন সে আসছে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে! থাম্ ছোঁড়া থাম্—মুখ ছোটালে এক মিনিট দাঁড়াতে পারবি না। আপনার কাজে যা।'

কানাইও আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করে না।

তবে পাখ্না তার সত্যিই গজায়।

আর একদিন যখন বনলতা সন্ধ্যার আব্ছায়া আঁধারে আবার ওকে দেখতে পেয়ে কাঁধে হাত দিয়ে বলে, 'তোর ঐ খোঁচা খোঁচা দাড়িগুলো কামাতে পারিস না, মাগো, ঘেন্না করে যে!' তখন আগের মত আর লজ্জায় ছুটে পালিয়ে যায় না কানু···বনলতার দিকে কেমন একটা দৃষ্টিতে তাকায়, হয়ত বা নিজে থেকেই একটু এগিয়ে আসে—শিরার মধ্যে যেন রক্তের চাঞ্চল্য অনুভব করে। কিন্তু পর মুহূর্তেই বুকটার মধ্যে কে হাতুড়ি পিট্‌তে থাকে··· ভয়ে পা দুটো অবশ হয়ে আসে, কোন মতে ছুটে পালিয়ে যায়।···

এরই কয়েকদিন পরে, সিঁড়ির নিচের অন্ধকার অপরিসর [illegible] শয্যায় কানুর গাঢ় নিদ্রাও ভেঙ্গে যায়। অসহ্য গরম—গুমোট ভয়ঙ্কর [illegible] গরম

কিন্তু তার ঘুম ভাঙবার শুধুই কি সেই কারণ? প্রথমটা আবছা আলোতে কিছুই বুঝতে পারে না, গাঢ় তন্দ্রার বিহ্বলতা আচ্ছন্ন ক'রে রাখে ওর অনুভূতিকে, কিন্তু তারপরই কিসের একটা আওয়াজে আরও ভাল ক'রে জেগে ওঠে কানু।

একটা ফাঁক দিয়ে রাস্তার গ্যাসের আলো সামনের দেওয়ালে এসে পড়েছে, তার আভায় এমন কিছু ভাল করে দেখা যায় না। তবে মনে হয় তার খুব কাছেই একটা মানুষ। একটা সোনার হার যেন কার গলায় চিক্ চিক্ ক'রে ওঠে সেই ঝাপ্সা আলোতেই। 'কে!' ভয় পেয়ে চমকে ওঠে কানু।

কিন্তু তারপরই চুপ ক'রে যায়।...

পরের দিন শুধু নয়, কয়েকদিনই আর অমলার মুখের দিকে যেন তাকাতে পারলে না কানু। কিন্তু অমলা বেশ সপ্রতিভ। এমন কি ওকে লক্ষ্য ক'রে দু একটা ঠাট্টা-তামাসাও করতে ছাড়লেন না। পাঁচ ছ'দিন পরে কানুর মনের অবস্থাটা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়ে এলে অমলা একদিন ওর হাতে একটা পাঁচটাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, 'ভাল দেখে দুটো জামা করিয়ে নিস্ কানু।' তারপর কণ্ঠস্বরটা আর একটু নিচু ক'রে বললেন, 'ছিট কাপড়টা কিরকম কিনলি, রাত্রে একবার দেখিয়ে যাস্। কেমন?'

কানু সরল বটে কিন্তু কতকগুলো বুদ্ধি মানুষের আপনিই যোগায়। এটা তার আত্মরক্ষার জন্যে ভগবানই বোধকরি মানুষকে দিয়ে দেন।

সে ঘাড় নেড়ে বললে 'আমি অত রাত্তিরে ওপরে এলে কেউ যদি দেখে ত চোর মনে করবে—মার খেতে হবে। সে আমি পারব না।'

এই বলে উত্তরের অপেক্ষামাত্র না ক'রে নেমে এল।...

এর পরে একদিন ওদের ওপরতলার কল গেল খারাপ হয়ে। নিচে থেকে বালতি ক'রে জল তুলতে হ'ল ওপরতলার কলঘরে। সকালে পুরুষদের শেষ হ'লে দুপুরে মেয়েদের পালা।

কানুই জল তুলছিল। দুহাতে দুটো ভর্তি বালতি অবলীলাক্রমে নিয়ে চলেছে সিঁড়ি বেয়ে। বনলতা স্নানের জন্য তৈরী হয়ে কলঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। কানু জল দিয়ে বেরিয়ে আসছে, বনলতা বললে, 'ঘর থেকে সাবানটা দিয়ে যা তো কানু।' বালতি দুটো রেখে সাবান নিয়ে ফিরে এসে দেখে বালতি সেখানে নেই, কলঘরের মধ্যে। তখন আর কিছু ভাববার সময় নেই—সাবানটা রাখতে তাকে ঘরে ঢুকতেই হয়। সাবান রেখে বালতি নিয়ে

বেরিয়ে আসছে, চোখোচোখি হয়ে গেল অমলার সঙ্গে। চাপা তীব্র কণ্ঠে অমলা বললেন, 'এতে বুঝি মার খাবার ভয় থাকে না—না রে ?'

ভয়ে কানু আরও ঘেমে উঠল। কিন্তু অমলার ওষ্ঠে ততক্ষণে অভয়ের হাসি ফুটে উঠেছে।...

কানুর এসব ভাল লাগে না একদম। ওর আজকাল যেন মনে হয় এ কোন্ রাক্ষসীর পুরীতে সে এসে পড়েছে, এখন পালাতে পারলে বাঁচে। এর যেটুকু প্রলোভন তা তার নেই—এ সব তার কিছু ভালও লাগে না। পাপপুণ্য সে জানে না কিন্তু অন্যায় বোঝে।

তার ওপর আরও কিছুদিন যেতে ঠাকুর তার সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল। তার কারণটা কানু কিছুদিন চেষ্টা করেও বুঝতে পারে নি। অকস্মাৎ একদিন ব্যাপারটা ও সন্দেহ করলে। ইদানীং মানদা তার সঙ্গে একটু সদয় ব্যবহার করছে। কাজকর্ম নিজে টেনে ক'রে দেয়, খাওয়ার সময় নজর রেখে খাওয়ায়, ঠাকুরকে ব'লে গোপনে বাবুদের মাছের ভাগ দেওয়ায়।

এটা কোন্ অসতর্ক মুহূর্তে কবে শুরু হয়েছে তা কানু জানেও না। একেবারে প্রথম লক্ষ্য করল ঠাকুরের বিদ্বেষ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠে, যখন সেটাকে ঈর্ষার সূচনা ব'লে বুঝতে পারল।

দিনকতক দেখেই কানু মরীয়া হয়ে উঠল। এবার তাকে পালাতে হবে। এদের বাড়ীর বাতাসে বিষ আর পাপ আছে। এধারে দিনদিন মানদার যত্নটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠছে। সেটা ওর যদি-বা সইত, ঠাকুরের সইল না। সে এসে একদিন বললে, 'ত্মাখ্ ছোঁড়া, যেমন আছিস্ তেমনি থাক্। আঁস্তাকুড়ের কুকুর, নৈবিদ্যিতে লোভ কেন ? খুন ক'রে ফেল্‌ব একদিন—বলে দিচ্ছি।'

কানু যে কানু, নৈবেদ্যের নাম শুনে সে-ও হাসি চাপতে পারল না। কিন্তু সেই সঙ্গে মনও স্থির ক'রে ফেলল্। সে সুরেনকে গিয়ে বলল, 'কাকা, আমি আর চাকরি করব না। এদের বাড়ী অন্য লোক দিন !'

'কেন রে ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে সুরেন।

'না।' দৃঢ় কণ্ঠে বললে কানু, 'আমি আর চাকরিই করব না। হাতে যা টাকা জমেছে বিড়ির দোকান দিতে ত পারব ! স্বাধীনভাবে ব্যবসা করব।'

'মরেছে রে. ছোঁড়ার তেল হয়েছে।' বললে সুরেন, 'মরগে যা, দুঃখু পাবি এর পর। টাকা ক'টা ফুরিয়ে গেলে আবার ঐ কম্মই করতে হবে।'

হয়ত তা হবে। কানুও তা ভেবে দেখেছে। কিন্তু এ পাপপুরী থেকে ত অব্যাহতি পাবে এখন, তাহ'লেই হ'ল।

এবং সে সত্যি-সত্যিই একদিন মানদাকে বিস্মিত ও ঠাকুরকে নিশ্চিত করে টাকা-কড়ি বুঝে নিয়ে চলে এল। ঘটনাটা এত দ্রুত ঘটল যে কেউ ভাল ক'রে জানতেই পারে নি। কানুর ভয় ছিল জানতে পারলে নানা রকম বাধা পাবে, তাই সে একমাসের মাইনে বাদ দিয়েও একদিনের মধ্যেই ছাড় মঞ্জুর করিয়ে দিলে। স্বয়ং মানদা সুরেনকে দিয়ে বলে পাঠাল যে কানু যদি থাকে—সে নিজের মাইনে থেকে আরও দু টাকা ক'রে ওকে দিতে রাজী আছে। কিন্তু কানু এত বড় প্রলোভনেও টলল না।

সে যেন বাঁচল—যেন বেঁচে গেল। পিছনে তার কোন বন্ধুকে, কোন অন্তরঙ্গকে ত ফেলে যেতে হ'ল না! শুধু মুক্তি!

কেবল বীণাবৌদির চোখ ছল-ছল করতে লাগল যাবার সময়। তিনি ওর চিবুক স্পর্শ ক'রে ওকে ছোট ভাইয়ের মতই আশীর্বাদ করলেন, আর বলে দিলেন, 'যদি কখনও কোন দরকার হয়—টাকাকড়ির, ত আমাকে জানাস ঠিক, কোন সঙ্কোচ করিস নি।'

মাইনের টাকা তাঁর কাছেই জমা থাকত—সেগুলো ফেরত দেবার সময় আরও দশটা টাকা বেশী দিয়ে দিলেন তিনি। ওর কোন আপত্তি শুনলেন না।

৯

কানুর সত্যিই অনেক টাকা জমেছিল ইতিমধ্যে। প্রায় তিন-চারশ' টাকা! বিড়ির দোকান দেবার পক্ষে পর্যাপ্ত ত বটেই, এমন কি একটা ছোটখাট মুদির দোকানও দেওয়া যায়। ও-রকম মুদির দোকান এ অঞ্চলে ঢের আছে। কিন্তু মুদির দোকান করতে গেলেই লোক রাখতে হবে। আর লোক রাখলেই চুরি। সে অভিজ্ঞতা ভালই আছে কানুর। সুতরাং বিড়ির দোকান দেওয়াই ঠিক করল। কোন ঝামেলা নেই—নিজের পরিশ্রমই যথেষ্ট। সে মোক্ষদার সঙ্গে পরামর্শ ক'রে নিজে পাঁচসিকে দিয়ে একটা ঘর ভাড়া করল এবং বাজারের কাছে একটা ছোট দোকান-ঘরও ঠিক ক'রে ফেলল।

বিড়ির ব্যবসা সে এর আগে করে নি বটে কিন্তু রামলালের দোকানে যারা বিড়ি যোগাত তাদের সঙ্গে কথা কয়ে, ওর ভেতরের রহস্য এর আগেই কিছু কিছু আয়ত্ত করেছিল। সেও পাইকিরি বিড়ি বেচবে—পাইকিরি এবং খুচরো। এর জন্যও তাকে লোক রাখতে হবে—কারিগর, কিন্তু তারা ওরই

সামনে বসে কাজ করবে ; কাজের হিসাবে টাকা। বেচা ও কেনা, এ কানু নিজে করবে। নগদ টাকা চুরি যাবার ভয় নেই। এক মালমসলা হাত সাফাই করতে পারে কারিগররা, তবে তাও বা কত করবে? কত মসলায় কত হাজার বিড়ি হয় সে হিসেব ত জানাই আছে ওর। আর সে নিজেও অনেকখানি হাতে কলমে করতে পারবে।

অনেকদিন পরে স্বাধীনতার মুখ দেখল কানু। আঃ! তার যেন কী একটা অদ্ভুত আনন্দ হয়। মাটির ঘরে মোক্ষদা উনুন পেতে দিয়ে গেল— সে এখন নিজেই রেঁধে খাবে। দোকানঘর সাজাতে, মাল-মসলা কিনতে কয়েকদিন সময় লাগে, তাছাড়া কারিগর ঠিক করতে হয়। এরই ভেতর একটু একটু ক'রে সে নিজে বিড়ি পাকাতেও শেখে। অপটু হাত ঠিক করতে সময় লাগবে ত।

ইতিমধ্যে সে একদিন পাড়াটা ঘুরে এল। সন্টু ম্যাট্রিক পাশ করেছে, কলেজে পড়ছে। সে হেসে সস্নেহে ওর সঙ্গে অনেক কথা বলল। অম্বিকাবাবুর স্ত্রীকেও প্রণাম ক'রে এল। শচীর বিয়ে হয়ে গেছে, একটি মেয়েও হয়েছে। জামাই রেলের ডাক্তার, পশ্চিমে কোথায় থাকে।

রামলাল মারা গেছে কিছুদিন হ'ল। ভোঁদা ফিরে এসেছে। সে নাকি ফুলের দোকান দিয়েছে কলকাতায়। বিয়ে-থা করবে এইবার, মেয়ে দেখা হচ্ছে। সেই মাসিমা আর তাঁর মেয়ের আর কোন খবর নেই।

এই দেশে সে জন্মেছে—এদেশের এই মধ্যবিত্ত মানুষগুলিকে তার বড় ভাল লাগে। শহরের ওই বড়লোকের বাড়ীতে মানুষের মুখ দেখা যায় না— ওখানে গেলে প্রাণ হাঁফিয়ে মরে। ও ঐশ্বর্যে কানুর দরকার নেই।

তারপর একসময় ভাল দিন দেখে সত্যি-সত্যিই কানু তার কারখানা খুলে ফেলল। এখন সে একটা কারবারের মালিক, আর কারুর হুকুমের চাকর নয়। বাসন মাজা জলতোলা ঘর মোছার কাজ আর সে করবে না।

সবচেয়ে তার বিজয়গর্ব এইখানে যে, সে যে দুজন কারিগর রাখলে তার মধ্যে একজন হ'ল বিজয়! বিজয়ের সে আংটির আর পোশাকের বাহার গেছে। আর কোথাও ভাল চাকরি যোগাড় করতে পারে নি, অথচ বিয়ে করেছিল, তাতে আগেকার জমা-টাকা সব খরচ হয়ে গেছে। তবু সেখানেই বেচারীর দুর্ভাগ্যের শেষ নয়, সে বৌ-ও সম্প্রতি মারা গেছে। এখন সে সর্বস্বান্ত। কানুর কাছে এসে বিনয় ক'রে আর্জি জানায়। কানুরও আর তার ওপর কোন রাগ ছিল না, এককালে সে যে কটু কথা বলত ওকে,

দুর্ব্যবহার করত, ভগবানই ত তাকে তার জন্য শাস্তি দিয়ে দিয়েছেন—আবার কানুর কাছেই চাকরির জন্য উমেদারি করতে হ'ল। চাকরি অবশ্য মাইনের নয়। মজুরি—হাজার-করা মজুরি, যত বিড়ি দৈনিক বাঁধবে গুনে দেখে তার ওপর হিসেব ক'রে মজুরি দেবে কানু। তবু চাকরিই বলতে হবে বৈকি! সুতরাং কানু প্রসন্নমনেই ওকে চাকরি দেয়। শুধু তাই নয়—এখনও সে 'বিজয়দা'ই বলে। চাকরিই না হয় করছে—তাব'লে বয়সে ত আর ছোট হয়ে যায় নি। আর একটি কারিগরকে বিজয়ই জোগাড় ক'রে আনলে—তা[illegible] শালা হয় সম্পর্কে।

কারবার চলে একরকম। বেচাকেনা মন্দ হয় না—তবে তাতে শুধু কানুর দিন চলে যায়। আরও বেশী বেচাকেনা না হ'লে এমন লাভ থাকবে না যাতে টাকা হাতে জমে। অথচ টাকা কিছু জমাও দরকার, নইলে—

মোক্ষদা এসে বলে, 'এইবার একটা মেয়ে দেখি কানু—কি বলিস? রেঁধে ভাত-জল দেবে!'

কানু প্রবল বেগে ঘাড় নাড়ে, 'না না—মাসি, এখন নয়, এখন নয়।'

'সে কি! কেন রে? সতেরো-আঠারো বছর বয়স হ'ল ত, আর কি? আর কবে করবি? হয়ত এক আধ বছর বেশিই হবে, আমি আবার হিসেব ঠাওর পাই না। তাছাড়া নিজে হাত পুড়িয়ে খাবি কতকাল?'

কানু ঠিক ওদের ঘরের বা ওদের জাতের আর-পাঁচজনের মত জড়িয়ে পড়তে চায় না এমন ভাবে—ওর লক্ষ্য আরও উঁচুতে। কিন্তু সে সব কথা মোক্ষদা বুঝবে না। কানু শুধু বলে, 'এখন আমার সঙ্গে যার বিয়ে দেবে মাসি, হয়ত তার এগারো-বারো বছর বয়স—সে আমায় রেঁধে ভাত দিতে পারবে? শুধু শুধু একগাদা টাকা খরচা, ও একটা দায়।...একটু পয়সা-কড়ি করি—ইচ্ছে আছে নিজে একটু জমি বন্দোবস্ত ক'রে নিয়ে ঘর তুলব; তাছাড়া কারবারটা একটু দাঁড়িয়ে যাক। এত তাড়া কিসের?'

কথাগুলো মোক্ষদার খুব ভাল লাগে না। একটু সন্দিগ্ধ-কণ্ঠেই সে বলে, 'দেখিস্, হাতে কাঁচা পয়সা পড়েছে, বয়ে-টয়ে যাসনি যেন।'

'তুমি কি পাগল হয়েছ মাসি!'—[illegible] হো ক'রে হেসে ওঠে কানু।

কানু এরই মধ্যে একটা তক্তপোশ করেছে শোবার জন্য। চ্যাটাইয়ের ওপর শোওয়া ওর পছন্দ নয়। একটা আয়না কিনেছে ভাল দেখে। আর একটা শখ ওর বহুকালের—একখানা ভাল তোয়ালে কিনেছে চৌদ্দ আনা দিয়ে। স্নান ক'রে উঠে বাবুদের মত তোয়ালেতে চুল মুছে তবে চুল

আঁচড়ায়। ভদ্রভাবে জীবনযাপন করা ওর সবচেয়ে বড় লক্ষ্য; কোনমতে বিয়ে ক'রে একপাল রুগ্‌ণ অর্ধনগ্ন শিশু নিয়ে চিরকাল দারিদ্র্যের সঙ্গে যোঝা নয়।

কিন্তু তবু যত দিন যায়, এ যেন আর ভাল লাগে না। বাল্যকাল থেকে কঠোর পরিশ্রম করার ফলে মাংসপেশীগুলো কঠিন এবং সুগঠিত হয়ে উঠেছে। সেগুলো বসে বসে বিড়ি পাকিয়ে যেন অবসন্ন হয়ে পড়ে। এ কী কাজ? হেঁট হয়ে বসে বসে শুধু বিড়ি পাকানো—পিঠ চড় চড় করে এক এক সময়, কুলোটা নামিয়ে রেখে শিরদাঁড়া সোজা করার জন্য বাইরে এসে দাঁড়ায়। ইচ্ছে হয় ছুটে কোথাও চলে যায়, দমাদম্‌ ক'রে কোন ভারী কাজ করে, বাল্‌তি বাল্‌তি জল দিয়ে আসে তেতলায়।

মধ্যে মধ্যে নির্জন ঘরে আয়নার সামনে এসে নিজেকে দেখে। ও অনেকখানি ঢ্যাঙ্গা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে, দেহের গঠনটাও ওর নিজের মন্দ লাগে না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে চেয়ে থাকে নিজের মুখের দিকে, সদ্য-কামানো গালে হাত বুলোয়। খুব বেশিদিন দাড়ি কামাতে আরম্ভ করে নি, গাল এখনও নরমই আছে। বাবুদের দেখাদেখি 'সেফ্‌টি' ক্ষুর কিনেছে কিন্তু অর্ধেকদিনই আর তোড়জোড় ক'রে বসা হয় না। গালটা বাড়িয়ে দেওয়া অনেক সোজা নাপিতের কাছে। রামখেলাওন ওর কাছ থেকে দু'পয়সা করে নেয় মাত্র। এখানে এসে তবে সে দাড়ি কামিয়েছে—ওখানে বনলতা অনেকবার বললেও কামাতে পারে নি, কেমন যেন লজ্জা করত।

সবচেয়ে খারাপ লাগে ওর, রাত দশটা পর্যন্ত বিড়ি পাকিয়ে ফিরে এসে যখন রাঁধতে বসতে হয়। এক একদিন সকালের ভাতেই জল দিয়ে রাখে কিন্তু সে ওর খেতে ভাল লাগে না। তরকারিগুলোও হয়ত খারাপ হয়ে যায়। শুধু নুন দিয়ে দু এক গাল খেয়ে বাকি সব ফেলে দেয়। মোক্ষদাকে বলেছিল, 'মাসি, খরচ দেব—দুটো ভাত দিও।' কিন্তু মোক্ষদা রাজী হয় নি। সে বলে, 'আমরা অর্ধেক দিন রাঁধি, অর্ধেক দিন রাঁধি না, কোনদিন হ'ল মনিববাড়ী থেকেই এক কাঁসি ভাত নিয়ে এলুম। একদিনের ভাত তিন দিনও খাই—সে তোমার পোষাবে না বাছা!'

কথাটা সত্যিই। তবে কানুরও এতকাল রাঁধা-ভাত পেয়ে এখন যেন আর এ সব ভাল লাগে না।

অনেক সময়েই রাত্রে হয় তো খাওয়া হয় না, সামনের দোকান থেকে চারপয়সার মুড়ি আর বেগুনি কিনে খাওয়ার পাট সারে। কোনমতে এক ঘটি

জল খেয়ে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দেয় বিছানার ওপর।…ক[লেই ত কিছু]
ভীড় ক'রে আসে, কতদিনের ছোটখাট ঘটনা। বনলতার ক[াসবি।']
গৌরী, দীর্ঘাঙ্গী বনলতা—আরো অনেকে! মনে মনে বিচার ক[য়দা, তুমি]
না, বনলতাই ভাল! বনলতা ও।.হাতে কাঁধে নানা অছিলায় হাত
যেখানে যেখানে—সেখানগুলো দেখে লক্ষ্য ক'রে ক'রে। যেন সেই স্প[কাল]
অনুভব করতে চায়। হাতের পেশীগুলো ফুলে ওঠে—মন চঞ্চল হয়! কিসের
যেন উন্মাদনা ওর রক্তে—কিসের একটা অস্থিরতা। যাবে নাকি একবার ও
বাড়ীতে? অছিলার অভাব কি? দেখা করতেও যাওয়া উচিত একবার।

আবার রাত্রি প্রভাত হবার সঙ্গে সঙ্গে সে শিউরে ওঠে। এসব কী ভেবেছিল সে কাল? ছি ছি! সে বেঁচেছে, পালিয়ে বেঁচেছে। ও জীবনে ওর দরকার নেই। কুৎসিত পশুর জীবন।

ও-বাড়ীতে দুটি মাত্র মানুষ ছিল, ন'দা আর বীণাবৌদি।

বীণাবৌদির কথা মনে হ'লে আজও একটা স্নিগ্ধ আনন্দে ওর মন পূর্ণ হয়ে যায়। তিনি নমস্যা ওর, তিনি দেবী। সে মনে মনে তাঁকে প্রণাম করে।

কিন্তু তবু ওর রক্তে চিরকালীন পশুই ওঠে জেগে।

এক একদিন রাত্রে শুয়ে কল্পনা করে, কোন এক সন্ধ্যায় দেখা-করার অজুহাতে ও বনলতাদের বাড়ী গেছে। নতুন ছিটের হাফ-শার্টটা ওর পরনে, আর ফুলপাড় ধুতিটা। বনলতার ঘরে গেছে দেখা করতে।

অবশ্য তা হয় না। ও বাড়ী সম্বন্ধে ঘৃণাটাই ওর আন্তরিক; তার সঙ্গে একটা ভয়, কেমন একটা আতঙ্ক, কিসের যেন। না, ও বাতাস আর না।

কানু ছুটে ঘরের বাইরে এসে বসে। জোর ক'রে অন্য কথা ভাবে, মনকে অন্য দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। মা'র কথা মনে করে। কিন্তু মায়ের ছবিটা মনের মধ্যে একেবারেই অস্পষ্ট হয়ে গেছে, চেষ্টা ক'রেও আর আনতে পারে না। শুধু ঝাপ্সা একটা ধারণামাত্র আছে মনের মধ্যে মায়ের সম্বন্ধে। একটা উপস্থিতির আভাসমাত্র।

ও অস্ফুট স্বরে ডাকে আপন মনে: 'মা! মা!'

ছেলেবেলা শুনেছিল, কে যেন বলেছিল মনে নেই, যে, যারা মরে যায়, তারা স্বর্গে গিয়ে এক-একটা তারা হয়। কানু আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে ভাবে তার মাও কি ওদের মধ্যে আছে? ধ্যেৎ, ন'দা বলেছে ওরা এক-একটা গ্রহ, নক্ষত্র। একটা থেকে আর একটার মধ্যে কী ভীষণ দূরত্ব! সেটা ও অনেক

আঁচড়ায়। ভারণা করতে পারে না অবশ্য। মাইলের ধারণা ওর আছে, বিয়ে ক'রে কলকাতা পুলিশের থানাটা এক মাইল, লোকে বলে। এমনি বোঝা নয়।ইল। না, সে ধারণা করা সম্ভব নয়।

কিা আরও বলেছিল, আকাশটা অনন্ত।

কা'অনন্ত—মানে, যার শেষ নেই। কথাটা ভাল ক'রে ভেবেছে কানু, এখনও ভাবে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু কিছুতেই বুঝতে পারে না। প্রাণপণে ধারণা করার চেষ্টা করে, মনের মধ্যে একটা ছবি আঁকতে চায়—কিছুতেই পারে না। আরও, আরও, আরও—তবু তারপর? এই প্রশ্নটাই মনে জাগে।···একটু পরে মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। আর পারে না। হয়ত যারা লেখাপড়া শিখেছে, তারা পারে। তবে সংশয় একটা থেকেই যায় মনের মধ্যে—এ কি সম্ভব সত্যি-সত্যিই?

না, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ভাবে কানু, লেখাপড়া শিখে মানুষ হবার চেষ্টা করাই উচিত সকলের। এ তো পশুর জীবন, এর অর্থ কি?

মনকে জয় করে কানু। বনলতাদের বাড়ী আর যাওয়া হয়ে ওঠে না।

যেটা হয়ে ওঠে সেটা আরও সহজ।

বোধহয় ওর সেই উশ-খুশ ভাব লক্ষ্য ক'রেই বিজয় কথাটা বলে, পাকা লোক সে—'কানু, একদিন আমার সঙ্গে যাবি এক জায়গায়?'

'কোথায় বিজয়দা?' বিস্মিত হয়ে কানু প্রশ্ন করে।

'বেশ ভাল জায়গা। লোকও বড় ভাল। এই একটা মেয়ের বাড়ী। বড় ভাল মেয়ে।'

'মেয়ে? মানে, খান্‌কি-বাড়ী নাকি? সে আমি পারব না। ছি!'

'না না, সেরকম নয় রে। এ একেবারে অন্যরকম! বড্ড অভাবে পড়েই, তাই। দেখলেই বুঝবি। ভদ্দর-ঘরের মেয়ে, তেমন ছোটলোক নয়! আমাকে খুব স্নেহ করে। দু-একটাকা দিতুম আগে, এখন নিজেই খেতে পাই না! —আহা, বড় ভাল মেয়ে।'

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিজয়।

কানুর মনটা নরম হয়ে আসে অচিরে। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'তা—গোটা দুই টাকা বরং তুমি দিয়ে এসো একদিন গিয়ে। কি, না হয় গোটা পাঁচেক টাকাই নিয়ে যেও। আমি আর যাবো না।'

বিজয় তবু পীড়াপীড়ি করে, 'একদিন তুইও চল্ না। গেলেই ত কিছু তোর স্বভাব খারাপ হয়ে যাচ্ছে না। যাবি, গল্প করবি, চলে আসবি।'

কানু দোটানায় প'ড়ে যেন একটু দুর্বল ভাবেই বলে, 'না বিজয়দা, তুমি বোঝ না। ওসব ভাল নয়, পথটাই খারাপ।'

বিজয় আর কিছু বল্‌লে না। কিন্তু একদিন পাঁচটা টাকা চেয়ে নিয়ে সকাল ক'রে চলে গেল। পরের দিন এসে বললে, 'সত্যিই বড় অভাবে পড়েছিল রে। তেমন ত নয়, মানে বাজারের ত নয়। যার তার কাছ থেকে নিতে পারে না। কত জানালে ভগবানের কাছে, যাতে তোর ভাল হয়। বিশেষ ক'রে যেতে বলেছে তোকে একদিন, ব'লে, পেন্নাম ক'রে পায়ের ধুলো নেব। তিনি দেবতা।...তা তুই ত আর যাবি না।' বলে একটা ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে।

কানু চুপ ক'রে থাকে, তবে কথাটা একেবারে মন থেকে যায় না। একটি মেয়ে কৃতজ্ঞতায় তাকে প্রণাম করবে বলে বসে আছে পথ চেয়ে, মনে করতে মন্দ লাগে না।

তাই, দিন কতক পরে সে-ই একদিন যেচে জিজ্ঞাসা করে, 'কৈ তুমি ত আর সেখানে গেলে না বিজয়দা?'

বিজয় বিমর্ষ মুখে বলে, 'না। আমি একা আর কি করতে যাবো। তুই একবার যাস্ ত যাই। গিয়ে দেখে আস্‌বি একবার? যাবি?'

কষ্টদায়ক গ্রীষ্মের অপরাহ্ণ আর সন্ধ্যা। ঘাড় গুঁজে কাজ ক'রে ক'রে ক্লান্ত। রক্তের মধ্যে আর পেশীগুলোয় তেমনি অস্থিরতা।...তাকেই প্রণাম করবে বলে যে মেয়েটি বসে আছে, তার কথা ভাবতে তখন ভালই লাগছিল।

সে চুপ ক'রে আছে দেখে বিজয় সোৎসাহে বললে, 'চল্ যাই একবার।' সে কুলোটা নামিয়ে রেখে উঠে পড়ল এক্ষেত্রে প্রতিবাদ করা বা বাধা দেওয়া উচিত বুঝেও কানু কোন প্রতিবাদ করতে পারলে না, মনে একটা অপরাধীর ভাব নিয়ে, যেন কতকটা নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই, সে চলল বিজয়ের সঙ্গে।

এপাড়া ওপাড়া, বেশী দূর নয়। গলির মধ্যে সংকীর্ণ ও জীর্ণ বাড়ী। বিজয় ঠিকই বলেছে, এটা বেশ্যা-পাড়া নয়, ভদ্রবসতিই চারিদিকে। এ বৃত্তি যদি এ বাড়ীর মেয়ে নিয়ে থাকে ত নিতান্ত বাধ্য হয়েই, অভাবে প'ড়ে। বিজয় যেতে যেতে চুপি চুপি ওকে সেই কথাই বুঝিয়ে বলে। কানুর মনে পড়ে যায়—এদের কথা সে এর আগে রামলালের দোকানে থাকতে ঢের শুনেছে,

কিন্তু তখন অত বুঝতে পারে নি। পরিবারটি বিখ্যাত। এরা সম্ভ্রান্ত বংশের লোক। কিন্তু আজ যে আর সে সম্ভ্রমের কিছু নেই একথা সবাই জানে। অথচ বাইরে এখনও ভদ্রলোক, বংশমর্যাদা ও সম্ভ্রম বজায় রাখার চেষ্টা করেন। ওঁর প্রত্যেকটি মেয়ের ইতিহাস সকলকারই পরিচিত—অথচ ঐ বংশমর্যাদার জন্যই নাকি প্রকাশ্য ভাবে কোন নীচ কাজ করতে পারেন নি। নইলে এমন ভাঙ্গা বাড়ীতে থাকতে হ'ত না।

বিজয় গিয়ে একটু অদ্ভুতভাবে কড়া নাড়তেই মেয়েটি একটা ভাঙ্গা হ্যারিকেন হাতে ক'রে দোর খুলে দিলে। প্রথমটা বিজয়কে দেখে রূঢ়স্বরে কি বলতে যাচ্ছিল ভ্রূকুটি ক'রে, বিজয়ের চোখের ইসারায় অনুসরণ ক'রে কানুকে দেখে স্তব্ধ হয়ে গেল, একটা বিমর্ষ এবং শান্ত আত্মসমর্পণের ভাবও অল্প চেষ্টাতেই ফুটিয়ে তুলল মুখে।

কানু এটা দেখতে পেলেও সামান্য আলোতে ভাল বুঝতে পারল না। সে কুণ্ঠিতভাবে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল। সে ঝিয়ের ছেলে, চাকরের কাজ করেছে এতকাল, এখানে সে বাবু সেজে এসেছে, পয়সাওয়ালা উপকারীর বেশে—সেজন্য সঙ্কোচের অবধি থাকে না ওর, অত্যন্ত ধৃষ্টতা বলে মনে হয় ওর নিজের আচরণটা।

মেয়েটি শ্যামবর্ণের হ'লেও সুশ্রী, যৌবনবতী। দেহের প্রতিটি রেখা যেন পূর্ণ হয়ে উঠেছে, এর চেয়ে বেশী হ'লে মোটা হ'ত—কম হ'লেও খুঁত থাকত। চোখদুটি টানাটানা, ভ্রূ-দুটি ভাল। সে চোখে বিষাদের ছবিটা ফুটেছে ভাল, কানুর মত কিশোর বা তরুণের বুকে সহজেই তা সহানুভূতি জাগায়, আকর্ষণ করে। সামান্য পাউডারের শ্বেতাভার ওপর সযত্ন-রচিত কবরী ভ্রূ ও টিপের কালিমা সুন্দর মানিয়েছে। দেখে চোখের পলকে কানু মুগ্ধ হয়ে গেল। বনলতা যেন বড্ড বড়, অমলাও তাই। তাদের দেহে মেদও যেন প্রয়োজনের ঢের বেশী ছিল। তাদের চেয়ে এ অনেক ভাল।

বিজয় বললে, 'পুটু, এই আমার বাবু—মানে কানাইবাবু।'

পুঁটি সসম্ভ্রমে পেছিয়ে গিয়ে বলে, 'আসুন, আসুন। আমার জন্ম সার্থক আজ।'

তারপর অপরিসর এবং নোংরা উঠোন পেরিয়ে পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়ে সিমেন্ট-উঠে-যাওয়া একটা রকে পৌঁছে বলে, 'এক মিনিট দাঁড়ান।'

বলেই আলোটা রেখে, গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম ক'রে কানাইয়ের চলে-যাওয়া জুতোর দাগ থেকে আঁচলে ক'রে একটু ধুলো তুলে নিয়ে মাথায়

দিয়ে বলে, 'আপনাকে ছুঁতে আর ভরসা হ'ল না—মহাপাতকী আমি!'

কানু ব্যাকুল এবং ব্যস্ত হয়ে বলে, 'ও কি করছেন! ওতে যে আমার পাপ হবে। আপনারা ব্রাহ্মণ যে, আমি ছোট জাত!'

পুঁটি ততক্ষণে উঠে আলোটা হাতে নিয়েছে, সে ওদের ঘরে নিয়ে যেতে যেতেই জবাব দেয়, 'আপনি আমার দাদা! তাছাড়া ব্রাহ্মণ এখনও কি আর আমরা আছি!'

পাকা দেওয়ালে টিনের চাল দেওয়া বাড়ী। তারই একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালে ওদের! তক্তপোশের ওপর সাধারণ একটা বিছানা, মেঝেতেও একখানা মাদুর বিছানো। একপাশে একটা পানের সরঞ্জাম। সামান্য কিছু তৈজসপত্র।

কানু কুণ্ঠিতভাবে মাদুরেই বসতে যাচ্ছিল, বিজয় টপ ক'রে ওর হাতটা ধরে ফেলে জোর ক'রে ওপরের বিছানায় বসিয়ে দিলে এবং ব্যাপারটা কি ঘটে গেল বোঝবার আগেই পুঁটি ওর পা থেকে জুতো দুটো দুহাতে খুলে নিয়ে সহজ কণ্ঠেই বললে, 'ভাল হয়ে উঠে বসুন দাদা!'

একে বর্ষার চাপা গরম তায় ঘরের জানলাও অত্যন্ত ছোট, তার ওপর লজ্জা ভয় ত আছেই—কানু কয়েক মিনিটের মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছিল। তাও পুঁটির চোখ এড়ায় নি, সে একটা শাড়ীর-পাড়-মোড়া পাখা এনে ওর এক পাশে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে লাগল। কানু আরও বিব্রত হয়ে বলল, 'ও কি করছেন—না, না, ও আমার লাগবে না—'

পুঁটি বললে, 'আমাকে আবার আপনি! আমি না ছোট বোন?'

'না, মানে—সে কথা নয়—আচ্ছা আমাকেই পাখাটা দাও—'

কানু হাত বাড়িয়ে পাখাটা নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু একটা হাতে ওর উদ্যত হাতখানা ধরে ফেলে বাতাস করতেই থাকে পুঁটি। বলে, 'ছোট বোন একটু হাওয়া করলই বা—মানুষ ত অপরিচিত মানুষকেও বাতাস করে।'

কানুকে চুপ ক'রে যেতে হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে পুঁটির হাতের মুঠো থেকে ওর হাতখানা ছাড়িয়ে নেয়। পুটির নরম হাতের ওপর নিজের বলিষ্ঠ, কর্কশ হাত—ওর লজ্জা করে যেন মনে মনে।

একটু একটু ক'রে তাকিয়েও দেখে সে। মেয়েটি হয়ত তারই বয়সী হবে। কে জানে, মেয়েদের বয়সের হিসেব পাওয়া যায় না! কিন্তু দেখতে ছোটই—তাকে দাদা বললে বেমানান হয় না।

তা হোক্, এখানে এমনভাবে বসে বসে এ মেয়েটির হাতের সেবা খাওয়া

তার পক্ষে সম্ভব হয় না। এ যেন বড় অস্বস্তি! এ হাওয়াতে গরম আরও বেশী হয়।

পুঁটি পাখা নামিয়ে ওদের জন্য চা করতে গেল। সেই ফুরসুতে কানু একটা পাঁচটাকার নোট বিজয়ের হাতে গুঁজে দিলে। ইঙ্গিতটা বুঝে বিজয় বললে, 'তুইই দে না কানু, হাতে ক'রে—'

'না না! ছি।' কানু সবেগে ঘাড় নাড়লে, 'সে আমি পারব না।'

পুঁটি দুটো কাচের গ্লাসে ক'রে চা এনে নামিয়ে রাখতে বিজয় ওরই মধ্যে একটু গলাটা খাটো ক'রে ওর হাতে নোটটা দিয়ে বললে, 'বাবু দিচ্ছেন, এটা রাখ পুঁটু।'

পুঁটির চোখ চকিতে বিজয়ের সঙ্গে মিলল, সে বললে, 'এ কি করছেন উনি! মিছিমিছি আমার অপরাধ বাড়ানো।'

কানু মনে করলে একবার যে সে বলে, 'এতে আর কি হয়েছে, বোনকে কি ভাই দেয় না?' হয়ত এমনি ক'রে গুছিয়ে বললে ভাল হ'ত, কিন্তু কিছুতেই তা পারলে না, অতি কষ্টে শুধু বললে, 'না না—ও কিছু না।' এই বলে আগুনের মত গরম চা প্রাণপণে খেতে খেতে আরও ঘামতে লাগল।

পুঁটি টাকাটা নিজের মুঠোর মধ্যে পুরে বিজয়কে উপলক্ষ ক'রে বললে, 'এ সব বড় লজ্জার কথা, ওঁকে এমন ক'রে বিব্রত করতে আর এনো না। এম্নি গরীব বোনকে মনে ক'রে আসেন ত ভাল।'

তবুও কানু একটা ভাল কথা গুছিয়ে বলতে পারল না, সবেগে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি তবে আসি ভাই বিজয়দা, তুমি ব'সো।'

বিজয় সত্যি-সত্যিই বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি রে! এরই মধ্যে? আর একটু বোস্ না!'

পুঁটি ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে বলল, 'আর একটু থাকবেন না দাদা? অবশ্য যা ঘর, বসতে বলতে লজ্জা করে, সত্যি!'

'না না—সে নয়—আমার একটু কাজ আছে!' বলে কানু একরকম ছুটেই বেরিয়ে পড়ল।

বাইরে এসে পকেট থেকে সদ্য-কেনা রুমাল বার ক'রে মুখ মুছে একটা অন্য বাড়ীর বাইরের রকে বসে একটু সুস্থ হ'ল—বাতাস না থাক্, ঠাণ্ডা আছে।

বেশ মেয়েটি! ওর মনে হ'ল। আহা, ওকেও অভাবে পড়ে এমন করতে হচ্ছে?…

সেদিন ঘরে এসে আর রাঁধতে ইচ্ছা হ'ল না। দুপয়সার আলুর চপ আর মুড়ি কিনে এনে খেলে। তারপর আলো নিভিয়ে বাইরে এসে বসল। শুতে ইচ্ছে হ'ল না তখনই—শুলেও ঘুম হ'ত না, সমস্ত শরীর যেন কিসের একটা উত্তেজনায় ভিতরে ভিতরে কাঁপছে।

আবারও মনে মনে বললে, বেশ মেয়েটি!—কিন্তু দাদা বলেছে।

মনকে সে ধমক দিলে, যদিচ মনের অপরাধটা মনে মনেও স্পষ্ট ক'রে বুঝতে চাইলে না। কোন্ একটা অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা প্রবৃত্তির আভাসেই সে কঠিনভাবে মনকে শাসন ক'রে উঠল।

এর তিন চার দিন পরে রাত্রে দোকান বন্ধ করার সময়ে বিজয় আর একবার বললে, 'একবার ওদিকে যাবি নাকি কানু? বলেছিল আজ যেতে।'

কানু একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'ন্‌না—থাক্‌গে!'

অর্থাৎ, অনিচ্ছা অস্বীকারেই।

বিজয় পীড়াপীড়ি করতে লাগল, 'বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছে—চ'না একটিবার!'

কানু আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'তাহলে একবার বাসায় যেতে হবে।'

'কেন?'

'দরকার আছে।' কানু আর কিছু বলতে পারলে না।

বিজয় পুরো উত্তরের আশায় মুহূর্তখানেক অপেক্ষা ক'রে থেকে বললে, 'বেশ ত, তাই চল্। কত আর দূর!'

ঘরের তালা খুলে কানু কাগজে-মোড়া একটা শাড়ী বার ক'রে নিলে।

'কী রে ওতে?' আবারও প্রশ্ন করে বিজয়,' শাড়ী নাকি?'

'হ্যাঁ—মানে—কাল কিনেছিলুম।'

'কিনেছিলি? পুঁটির জন্যে?'

অপ্রতিভ কানু জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, 'হ্যাঁ, দাদা যখন বললে, মানে, বোনকে ত দেওয়া দরকার!'

মুখ টিপে হাসল শুধু বিজয়, অন্ধকারে সেটা দেখা গেল না।

পুঁটিও কাপড়টা নিতে প্রথম খুব আপত্তি করল কিন্তু বেশীক্ষণ আপত্তি করতে ওর সাহসে কুলোল না। কারণ মুখচোরা কানু জোর ক'রে কিছু বলতেও পারবে না।

তারপর মোড়কটা খুলে হ্যারিকেনের আলোতে মেলে ধরতে ওর দৃষ্টি

উজ্জ্বল হয়ে উঠল। না, কানুর নজর আছে। একটাকা পাঁচসিকের শাড়ী নয়—দেশী তাঁতের রঙীন শাড়ী। অন্তত সাড়ে-তিনটাকা চারটাকা দাম।

খুশিতে ঝলমলিয়ে উঠলেও মুখে বললে পুঁটি, 'এ কী করেছেন! এত খরচ করবার কি দরকার? আমি ত মিলের শাড়ী পরি।'

তারপর বললে, 'আজ কিন্তু এখনই পালিয়ে গেলে চলবে না। এখানে খেয়ে যেতে হবে। আমি ওর মুখে শুনলুম অর্ধেক দিন আপনার খাওয়াই হয় না। এখানে কষ্ট ক'রে একটু এলেই হয়—এমন ত কিছু দূর না!'

কানু ব্যস্ত হয়ে উঠল। খেতে টেতে সে পারবে না, একদম খিদে নেই।

পুঁটি একটু ম্লানমুখে ঈষৎ করুণ একপ্রকার অপ্রতিভস্বরে বললে, 'কেন, আমার হাতে খাবেন না? যাই হই, বামুনের মেয়ে ত।'

কানু বিষম অপ্রতিভ হয়ে পড়ল, 'না, না—সে কি কথা! কী মুস্কিল, তা আমি বলি নি—আচ্ছা আনুন, কি আনবেন।'

পুঁটি ওদের দুজনেরই খাবার জায়গা ক'রে দিলে। পরোটা, পটোলভাজা, মাছের ডালনা আর একটা আলুপিঁয়াজ চচ্চড়ি। অনেকদিন পরে তৃপ্তি ক'রে খেলে কানু। বাবুদের বাড়ী ছাড়ার পর আর অদৃষ্টে এ-রকম জোটে নি!

তা ছাড়া, শুধু ভাল খাওয়াই নয়—এ এক অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা ওর কাছে। ওকে এত যত্ন ক'রে, এমন দেবতার মত আদরে কেউ খাওয়ায় নি। পুঁটি খুবই যত্ন ক'রে খাওয়াল। বেশী খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগল। খাওয়ার পর নিজে আঁচাবার জল ঢেলে দিয়ে নিজেরই আঁচলে হাত মুছিয়ে নিলে।

কিন্তু কানু খাওয়ার পর আর এক মিনিটও বসল না। বিজয় ও পুঁটির বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই সে আগের দিনের মতই প্রায় ছুটে বেরিয়ে পড়ল—যেন বাইরের বাতাসে গিয়ে নিঃশ্বাস নিতে পারলে সে বাঁচে।

তা পালাক—তবু এর পর কানুর এখানে আগমনের দূরত্বের ব্যবধানটা কমে আসতে লাগল। সপ্তাহে দুদিন, তারপর একদিন অন্তর, তারপর প্রায় প্রত্যহই।

এ যেন কানুর কেমন নেশা। অথচ বেশীক্ষণ ওর সেখানে থাকতেও সাহস হয় না। নিজের ওপর সে বিশ্বাস হারিয়েছে। বাঘ মানুষ খেলে নর-খাদক হয়—তখন মানুষের রক্তের গন্ধে সে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে, তখন আর তাকে আত্মসংযমের উপদেশ দেওয়া বৃথা। পুঁটিকে দেখবার জন্য ওর মন সারাদিন ধরে উৎসুক হয়ে থাকে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই ওর রক্তে কেমন একটা হিংস্রতা জাগে—তখন নিজের আত্মসংযমের ওপর ভরসা করে থাকতে পারে না।

প্রথম প্রথম ছিল লজ্জা ও সঙ্কোচ—এখন ওর পলায়নের কারণ হ'ল ভয়, আর সে ভয় নিজেকেই।

ওকে যে দাদা বলেছে পুঁটি—তারপর আর তাকে কামনা করা যায়? ছি!

ফলে উপহারে উপহারে পুঁটির ঘর ভরে যায়। শাড়ী, জামা, এসেন্স, স্নো, পাউডার—এমন কি ছোটখাটো অলঙ্কারও। ঝুঁটো মুক্তোর মালা, সোনার ফুল, পাথরের নাকছাবি, রুপোর ব্রুচ, আরও কত কি! এ ছাড়া নগদ টাকাও এখন সে বালিশের নিচে গুঁজে রেখে যায়। বাজারে ভাল মাছ পেলে কিনে বিড়ির কারিগর বিজয়ের আত্মীয় সেই ছেলেটিকে দিয়ে পাঠিয়ে দেয়। ওরা মুখ টিপে টিপে হাসে, কানাকানি করে। বাজারে অন্য দোকানদাররা হাসাহাসি করে, ঠাট্টাতামাশাও করে—কানুকে শুনিয়েই করে, কারণ পুঁটিদের বাড়ী বিখ্যাত। তবে কানু তাতে কান দেয় না। সে জানে যে ও সম্পর্ক নয় তার সঙ্গে পুঁটির, সুতরাং কে কি বলল না বলল তাতে ওর কি আসে যায়?

শুধু যখন পরিপাটি প্রসাধন ক'রে পূর্ণযৌবনা পুঁটি ওর চোখের সামনে জ্বলন্ত কামনার শিখার মত ঘুরে বেড়ায় রাত্রে, তখন মধ্যে মধ্যে ও ভগবানকে স্মরণ করে। ঠাকুর, রক্ষা করো।

পুঁটিও অবাক হয় বৈকি!

এতটা সে আশা করে নি। বিজয়ও না। পুঁটির ভাগ দিতে তার খুব আপত্তি ছিল না—যদি কানুর পয়সাতে পুঁটির ভরণ-পোষণ চলে ত অন্য লোক ডাকতে হয় না, তাহলে বিজয় একেবারে বঞ্চিত হবে না—এই ছিল তার উদ্দেশ্য। দাদা বলতে সে শেখায় নি—ওটা পুঁটিরই খেলা।

কিন্তু পুঁটি ঠিক এ-রকমটা ভাবে নি। মানুষের এ ধরনের সংযমের সঙ্গে তার পরিচয় নেই। পুরুষের অন্য চেহারাই সে দেখে এসেছে এতকাল। সে মধ্যে মধ্যে পীড়াপীড়ি করে কানুকে দুপুরবেলা খাবার জন্য। মধ্যে মধ্যে মুখ ফুটেই বলে, 'আচ্ছা, ওর সঙ্গে ছাড়া কি আপনার একা আসতে নেই? দুজনেই একসঙ্গে কাজ কামাই করে আসার দরকার কি? আপনি দুপুরে বিকেলে যখন খুশি ত আসতেই পারেন।'

কানু চুপ ক'রে থাকে। কিন্তু একা সে কিছুতেই আসে না।

একদিন সন্ধ্যার পর ওরা যেতে পুঁটি বিজয়কে কী একটা জিনিস আনবার ছুতোয় বাইরে পাঠিয়ে দিলে। তারপর হাওয়া করার নাম ক'রে একটা পাখা এনে একেবারে কাছে বসল। কানু তবুও অটল। তার সারা কপাল ঘেমে

ওঠে, বুকের শব্দ বাড়ে, কান দুটো থেকে আগুন বেরোতে থাকে—তবু সে প্রাণপণে ঈশ্বর স্মরণ ক'রে স্থির হয়ে থাকে।

শেষে এক সময়ে পুঁটিই তার একটা হাত চেপে ধরে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, 'তুমি এত বোকা কেন? তোমার পয়সায় ও বেশ মজা করছে আর তুমি সেই খরচা জুগিয়ে যাচ্ছ? তোমাকে দেখলে যে আমার মায়া হয়!'

কানুর মনে হয় যেন সাপে হিস্ হিস্ ক'রে উঠল ওর কানের কাছে। অনেকদিন আগে রামলালের দোকানের কোণে একটা কেউটে সাপ বেরিয়েছিল—সেই কথা মনে পড়ে যায়।

সে ঘাড় হেঁট ক রে বললে, 'ওসব কথা বলতে নেই পুঁটু, তোমাকে যে আমি বোন্ বলেছি।'

'ও ত কথার কথা!' হেসে বলে পুঁটি।

'তা হোক্—কথাটার দাম আছে।' সে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে একেবারে। প্রলোভন বড় বেশী। পুঁটি তার হাতটা যেখানে চেপে ধরেছিল সেখানটায় ধ্বক্ ধ্বক্ করছে।

পুঁটি তবুও ছাড়ে না। কেমন একরকম ক'রে চায় ওর দিকে, বনলতা যেমন ক'রে চাইত, কতকটা তেমনি ভাবে। আবারও হাতটা ধরে ওর।

বিহ্বল কানু হাতের উল্টো পিঠে কপালের ঘাম মুছে একবার বসে পড়ে অবসন্নভাবে, তারপরই অকস্মাৎ কি ভেবে পুঁটির হাতটা ছাড়িয়ে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে বাড়ীর বাইরে এসে হাঁফ ছাড়ে যেন।

না, আর সে আসবে না এ বাড়ীতে, কিছুতেই না।

অবশ্য আর তাকে আসতে হয়ও না। বিড়ির দোকানের বিক্রীর সব টাকাটাই যে লাভ নয় কানু তা ভুলেই গিয়েছিল। হাতের জমা টাকা কবে তলিয়ে গিয়েছে—ক্রমশ দোকানের অবস্থা শোচনীয় হ'তে ওর খানিকটা চৈতন্য হ'ল। এ কি করেছে সে? সর্বনাশ যে এত কাছে এগিয়ে এসেছে, এ ক'মাস সে একবার কল্পনাও করে নি। কর্মচারীদের কাছে দেনা, মহাজনের কাছে দেনা—সম্বল ত শুধু বিড়ির দোকানের সামান্য সাজপাট!

কানু একেবারে চোখে অন্ধকার দেখল। মোক্ষদার কাছ থেকে অল্প কিছু টাকা ধার ক'রে এনে কিছু কিছু দেনা শোধ করল এবং নিজে ভূতের মত খাটতে লাগল—মাল তৈরি ক'রে বিক্রী করার জন্য। কিন্তু খদ্দেরও সীমাবদ্ধ, নিজে হয়ত রাত জেগেও মাল জমা করতে পারে—কিনছে কে?

নিজের আহাম্মকির জন্ম নিজের ওপর ওর রাগের সীমা রইল না।

কি দরকার ছিল ওর বিজয়ের ভাঁওতায় ভুলে ওদিকে পা বাড়াবার? যাকে খেটে খেতে হবে—তার কাজে মন থাকাই উচিত।

তাছাড়া—বিজয়ের কারচুপিটা পুটিই ধরিয়ে দিয়েছিল, সে যে একেবারে গাধার মতই বিজয়ের ফাঁদে পা দিয়েছে সেটা বুঝে অনুশোচনার শেষ ছিল না ওর। অথচ প্রকাশ্যে বলারও কিছু নেই, কারণ যা দিয়েছে সে নিজের ইচ্ছায় দিয়েছে, বিজয় ত আর ওকে দিতে বলে নি। অনুরোধও করে নি। নিজ হতে স্বেচ্ছায় সে গলা বাড়িয়ে দিয়েছে হাড়কাঠের দিকে। এ তার নিজেরই নীচ প্রবৃত্তির ফলাফল, দোষ দেবে সে কাকে?

কারবারের অবস্থা ভাল নয় বলে কারিগর ছাড়িয়ে দিলে, একাই যতটা পারে মাল তৈরি করে এখন। বিজয় সেই রাগে যা-তা নিন্দা ক'রে বেড়াতে লাগল। কানে এল পুটিও কী সব হাসাহাসি করেছে অন্য লোকের কাছে।

রাগে ও বিদ্বেষে মধ্যে মধ্যে রক্ত মাথায় চড়ে যাবার উপক্রম হ'ত বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত সামলে নিত নিজেকে। সে বোকা, বোকার মতই কাজ করেছে—তা নিয়ে যদি কেউ ঠাট্টা করে ত এমন কিছু দোষ দেওয়া যায় না। ঠিকই হয়েছে তার, এ তার প্রাপ্যই। আর বিজয়? বিজয়কে জেনে শুনে কারবারের মধ্যে টেনেই যে ভুল করেছে, তারও ফল ভুগতে হবে বৈ কি!

সে কোন দিকে কান না দিয়ে আপন মনে খেটে যায়।

তবে এ কাজ আর তার ভাল লাগে না। কাজ খারাপ নয় হয়ত কিন্তু ওর খারাপ লাগে। তাছাড়া পয়সা খারাপ।

এক একবার ভাবে আবার কোথাও চাকরের কাজ নেবে কিনা!

নিশ্চিন্ত আহার এবং নিরাপদ আশ্রয়, কিছু টাকাও হাতে জমে।

আবার পূর্ব স্মৃতি মনে পড়ে দমে যায়। থাক্‌গে—এ তবু স্বাধীনতা আছে খানিকটা।

এই দোটানার মধ্যেই একদিন ভোঁদা এসে তাকে মুক্তি দিলে। বললে, 'কানু, আমরা একটা কারখানা খুলেছি, মানে আমরা ক'জন মিলে। কাজ করবি তুই? এখনই বারো আনা রোজ দেব, রবিবার ছুটি থাকবে কিন্তু মাইনে কাটা যাবে না।'

কানু যেন বেঁচে গেল। ভোঁদা যা-ই করুক, ভোঁদাকে সে বরাবরই পছন্দ করত, তার ভদ্র কথাবার্তার জন্য। ওর কাছে চাকরী করতে আপত্তি নেই।

বিড়ির দোকান বেচে সে মোক্তার দেনা শোধ করে পরের মাস থেকেই কারখানার কাজে লেগে গেল।

মুক্তি পেলে সে। হাতপায়ের যেন খিল ছাড়ল এতদিনে।

১০

কারখানার সঙ্গও খারাপ কিন্তু বাবুদের বাড়ীর মত নয়। এখানে যারা কাজ করে আসলে তারা খুব খারাপ লোক নয়—সারাদিনের কাজের পর হয়ত কেউ একটু আধটু তাড়ি খায়—হয়ত বেউ কেউ পতিতালয়েও যায় কিন্তু তবু তাদের সঙ্গ বিষাক্ত নয়, দিনরাত মনকে ক্লেদাক্ত ও অবসন্ন ক'রে রাখে না। ভাল কথাও তারা বলে, তারা ঈশ্বরের কথা আলোচনা করে, মোটামুটি জীবনের সৎ আদর্শ ও লক্ষ্য কি তা তাদের জানা আছে। তারা চায় ভাল হতে ও ভাল করতে। আবার এমন লোকও ঢের আছে বৈকি, বিড়ি খাওয়া ছাড়া যাদের অন্য নেশা পর্যন্ত নেই, যারা কদাচিৎ মুখে খারাপ ভাষা আনে, খুব রাগ না করলে যাদের শিক্ষা বা সংস্কারের অভাব বোঝা যায় না অর্থাৎ এখানে, ইচ্ছা করলে, সে সমস্ত রকম অসৎ সংসর্গ থেকে দূরেও থাকতে পারে।

আর তাই সে থাকেও।

জীবনে ভাল হবার, ভদ্র হবার আশা আজও সে রাখে, আজও একেবারে সে নিজের সম্বন্ধে হাল ছাড়ে নি। বর্তমান যে সত্যটা, সেটাকে সে চলার পথে ক্ষণিক তথ্য বলেই মনে করে। ওপরে ওঠবার সিঁড়ি মাত্র। এ অবস্থা চিরকাল থাকবে না, এ শুধু সাধনার সময় তার। অর্থ উপার্জন না করলে ওর সেই ভদ্রজীবনের স্বর্গে প্রবেশাধিকার পাবে না—তাই যেমন ক'রে পারে সে অর্থ উপার্জন করছে। দৃষ্টি আছে তার অনেক ওপরে, অনেক উঁচুতে। বর্তমানের কষ্ট বা অস্বাচ্ছন্দ্য তাই ওকে স্পর্শ করে না কিছুতেই।

কানু কারখানায় ভূতের মত খাটে। 'ওপর-টাইম' বা ওভার-টাইমের হুকুম আসে অবশ্য কদাচিৎ, কিন্তু সুযোগ পেলে কানু কখনও ছাড়ে না। বোধ হয় দিনরাত কাজ করবার প্রস্তাব হ'লেও সে করত। সবাই বলে কানুর শীগগিরই পদোন্নতি হবে, দু-চারজন ঈর্ষান্বিতও হয়ে ওঠে, বিদ্রূপ করে কানাইকে। কিন্তু সে কোনদিকেই কান দেয় না। পদোন্নতি হবে কি'না তা নিয়ে মাথাও ঘামায় না। হবেই—সে জানে। উন্নতি যে তাকে করতেই হবে।

তবু তার টাকা যেন যথেষ্ট জমে না। মাসে তেইশ-চব্বিশ টাকা মাইনে, তা থেকে খাওয়া-পরা সব খরচ ক'রে কীই বা থাকে? তবু এখনও সে রেঁধেই

খায়। রাত্রে গিয়ে একটা তরকারি আর ভাত করে, তরকারি খানিকটা আলাদা বাটিতে ঢেলে জলে বসিয়ে রাখে। এ কৌশল শিখিয়েছে তাকে মোক্ষদা। ফলে গরমেও তরকারি খারাপ হয় না। ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে শুধু চারটি ভাত চাপিয়ে দেয় একটা কিছু ভাতে দিয়ে। বাসি তরকারি আর গরম ভাত দিব্যি খেয়ে নেয়। এখন কাজ থেকে অত হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে এসেও রাঁধতে বসতে তার কষ্ট হয় না তত—যেন হাতপায়ের খিল ছেড়ে গিয়ে সে প্রথম যৌবনের অমিত শক্তিতে জেগে উঠেছে। খাটতেই সে চায়, যে-কোন কাজে।

মাস ছয়েক পরে মাইনে বাড়ল তার সত্যি-সত্যিই, কিন্তু সে অতি সামান্য, এক আনা রোজ—মাসে দুটো টাকাও পুরো নয়। বছর পুরো হবার আগেই মাইনে বাড়া যে বিশেষ অনুগ্রহের লক্ষণ, সেটা কানুও বোঝে কিন্তু এভাবে গেলে কত দিনে সে কি করবে!

মাসি পীড়াপীড়ি করে বিয়ের জন্য, কিন্তু নিজে একটু জমি অন্তত খাজনা ক'রে নিয়ে নিদেন একটা মাটির চালাও তুলতে না পারলে বিয়ে করবে না কানু। এ তার প্রতিজ্ঞা।

তবে এ প্রতিজ্ঞা যে কবে তার সার্থক হবে তা সে জানে না। খুব চেষ্টা ক'রেও মাসে তিন চার টাকার বেশি জমাতে পারে না। অবশ্য তার জীবন-যাত্রার মান তার স্বজাতি বা সহকর্মীদের চেয়ে একটু উন্নত বটে—এটা সে-ও মনে মনে স্বীকার করে। মোক্ষদা বলে, 'অত নবাবিতে তোর দরকার কিরে বাপু? যেমন ঘরের ছেলে তুই তেমনি থাক্। বিয়ে একটা কর্—দরকার হয় সেও দু'বাড়ী খেটে কিছু রোজগার করতে পারবে!'

কানু কথাটা শোনে আর মনে মনে শিউরে ওঠে। যে কাজ সে পুরুষ হয়েও সহ্য করতে পারলে না, সেই কাজ করতে দেবে ওর বৌকে?

না, স্ত্রীকে সে চাকরি করতে দেবে না। ওতে পুরুষ-মানুষের ইজ্জৎ থাকে না।

হ্যাঁ, মেয়েরা আজকাল কেউ কেউ কাজ করছে বটে তবে সে হ'ল সম্মানের কাজ। ইস্কুল-মাস্টারিই করে অধিকাংশ মেয়ে। তাতে দোষ নেই। কিন্তু ওর যে বৌ হবে সে ত আর তা পারবে না। তাকে করতে হবে ঐ কাজ—বাসন মাজা, জল তোলা, ঘর মোছা! তাতেও দুঃখ ছিল না—যদি ও-সব কাজের মনিব সম্বন্ধে তার এত তিক্ত অভিজ্ঞতা না থাকত।

ওর অফিসে কিন্তু ওরই মধ্যে পয়সা জমিয়ে ছোটোখাটো ব্যবসা করে কিংবা তেজারতি কারবার চালায়—এমন লোক ঢের আছে।

একজন আসে বাড়ী থেকে মুড়ি-তেল-নুন-মশলা নিয়ে। এখানে এসে ভাজামশলার গুঁড়োর সঙ্গে মেখে দেয়, তাতে নাকি বেশ-কিছু লাভ থাকে তার। দৈনিক চার আনা পাঁচ আনার কম নয়।

আর একজন বাড়ী থেকে ঘুগ্‌নি ক'রে নিয়ে আসে।

একজন ঐখানে বসেই চা তৈরি ক'রে। কেট্‌লি, কাপ সরঞ্জাম সব রেখে দিয়েছে। এক পয়সা ক'রে কাপ বেচেও তার কিছু থাকে। কেউ কেউ বাড়ী থেকে ডাব আনে, বেশী মাইনের কর্মচারীদের বিক্রি করার জন্য।

এসব কারবার অল্প পুঁজিতে হয় বটে কিন্তু কানুর মাথায় এ ব্যাপারটা ভাল খোলে না। আরও কী কারবার এ রকমের চলতে পারে তা সে ভেবেই পায় না। ওর মনে হয় যা হতে পারত তা ত সবই এরা ক'রে ফেলেছে। এখন আবার এরই ভেতর এই এক ধরণের জিনিস নিয়ে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা চালানো, সে বড় খারাপ।

তেজারতি যারা করে তাদের অবস্থা আরও ভাল।

দু' টাকা চার টাকা মাসের শেষে ধার দিয়ে—মাইনের দিন আবার নির্মম ভাবে সুদসুদ্ধ আদায় ক'রে নেয়। সুদও বেশ চড়া। টাকা-পিছু মাসিক এক আনা থেকে ক্ষেত্রবিশেষে চার আনা পর্যন্ত সুদ আদায় হয়। ক্ষেত্রবিশেষে অর্থাৎ টাকাটা শোধ হওয়া সম্বন্ধে যেখানে যত সংশয় থাকে সেখানে তত বেশী সুদ।

অথচ ধার যারা নেয় তাদের মধ্যে দু' চার জন যে মদ বা জুয়া খেলার জন্য নেয় না তা নয় কিন্তু অধিকাংশই নেয় সাংসারিক অভাবে। কারুর বা ছেলেমেয়ের অসুখের জন্য। কারুর বা মেয়ের বিয়ে, বাপমায়ের শ্রাদ্ধ। কারুর বাড়ী মাসের শেষে জামাই এলেও এই সমস্ত মহাজনের কাছে হাতপাতা ছাড়া উপায় থাকে না।

এভাবে টাকা রোজগার করার প্রবৃত্তি নেই কানুর। তার চেয়েও বড় কথা—ক্ষমতাও নেই।

টাকা ধার দিতে গেলে পুঁজি ত চাই আগে। সেটা আসে কোথা থেকে?

এ কারবার যারা করে তাদের মধ্যে ভরতই লোক ভাল। সে এক আনার বেশি সুদ কখনই নেয় না। তা-ছাড়া নিয়মিত সুদ যে দিয়েছে, টাকা শোধের সময় তাকে কিছু সুদ রেহাই দেয় নিজে থেকেই।

ভরত উড়িষ্যা-দেশবাসী। অনেকদিন বাংলায় থাকলেও পুরো বাংলা শেখে নি, সর্বদাই কথা কয় উড়িয়া ও বাংলায় মিশিয়ে—এমন কি ওর নিজের দেশবাসীর সঙ্গেও। মানুষটাকে বেশ লাগে কানুর। ওর সঙ্গে কথা-কয়েও সুখ আছে। সরল ভাবে সত্যকথাই বলে সব সময়ে।

একদিন ও ভরতকেই চেপে ধরল, 'ভরতদা, এই যে তেজারতি কারবার করো, এ টাকা পেলে কোথা থেকে? এইখান থেকে জমিয়ে? মাইনে থেকে এত টাকা জমে তোমার?'

'হ, মহিনা থেকে জমিবে না! কত মহিনা তোমার এখানে!'

'তবে? এখন না হয় সুদে সুদে পুঁজি বেড়েছে। কিন্তু প্রথম টাকাটা পেলে কোথা থেকে? তা ছাড়া এমনিও তোমার খরচ ত কম নয়। তুমিই সব চেয়ে খরচা করো, তা আমি দেখতে পাই।'

'কাম্ম করি। কাম্ম।'

'কাম? মানে কাজ? আবার কি কাজ করো?'

তখন ভরতের ইতিহাস প্রকাশ পেল। ও এ-কাজ ছাড়াও ঢের কাজ করে। দুটো বাবুর বাড়ী মালীর কাজ করে, একজনের বাড়ী জল তোলে। তাতে মাসে দশটাকারও বেশী আয় হয় ওর। সকাল বিকেল ও এই কাজ করে। ভোরবেলা যায় জল তুলতে—কারখানার ফেরৎ সন্ধ্যেবেলা আবার। তা ছাড়া সন্ধ্যাতেই ও বাগানে জল দেয়। শনিবার আর রবিবারে বাগানের অন্য কাজ করে।

সত্যিই ত! কানুর চোখদুটো সম্ভাবনায় উজ্জল হয়ে ওঠে।

এ কাজ ত সে অনায়াসে করতে পারে! মালীর কাজ জানে না বটে কিন্তু জল তুলতে ত বাধা নেই। ওদের গ্রাম কলকাতার উপান্তে বলে কলকাতার কলের জলই আসে পাইপের মধ্যে কিন্তু এত পর্যাপ্ত আসে না, যাতে বাড়ী বাড়ী কল যায়। শুধু রাস্তার মোড়ে মোড়ে কয়েকটা কল এবং কয়েকটা টিউব-ওয়েলের ব্যবস্থা আছে (সেটা হয়েছে ইদানীং—তাও অধিকাংশই জন্মাবধি খঞ্জ অর্থাৎ চলে না)—সেইখানেই পাড়া-সুদ্ধ স্ত্রী পুরুষ ভিড় করে। বেশির ভাগ বাড়ীতেই ভেতরে জলের কোন ব্যবস্থা নেই—রাস্তার জলের ওপর ভরসা ক'রে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা হয়। সুতরাং এখানে এটা বেশ বড় রোজগার। যাদের অবস্থা খারাপ তারা নিজেরাই গিয়ে দাঁড়ায় কলের ধারে—যাদের ওরই মধ্যে একটু সঙ্গতি আছে তারা লোক রাখে।

ভারী আছে কয়েকজনই. ভারে ক'রে জল বয়। এমন লোকও আছে—তারা বাল্তি বা ঘড়া ক'রে জল তুলে দেয়।

এটা ত মন্দ নয়। এ কাজের কথা আগেই তার মাথায় যাওয়া উচিত ছিল।

ঘরমোছা বাসনমাজা নয়, পরিশ্রমের কাজ বটে, তবু অনেকটা স্বাধীন। মনিবের সঙ্গে মাখামাখি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কিছু নেই। অথচ অনেক উপরি উপার্জন করা যায়। তার বলিষ্ঠ কর্মঠ দেহ যেন নিশপিশ করতে থাকে। পরিশ্রমে তার আনন্দ আছে—ভয় নেই।

সে ভরতকে চেপে ধরে, 'আমাকে একটা কাজ খুঁজে দেবে ভরতদা? দাও না!'

ভরত হেসে বলে, 'কী কাম্ম করিবি? মালী কাম্ম?'

'মালীর কাজ যে আমি জানি না ভাই। জল তোলা কাজ? পাওয়া যাবে না?'

ভরত অভয় দেয়, 'হু। যীবে, যীবে। দিব কাম্ম একটা।'

সত্যিই দেয় ভরত। কাজ একটা তাকে যোগাড় ক'রে দেয় হপ্তা-খানেকের মধ্যেই। বাঁড়ুয্যে-পাড়ায় সতীশ মিত্রের নতুন ছোট ভাড়াটে-বাড়ীটায় কারা যেন এসেছে, তাদের কাছেই কাজ। জল তুলে দিতে হবে। একটা ছোট চৌবাচ্ছা ভরে দেওয়া আর দু'তিন ঘড়া রান্না-খাওয়ার জল। মাসে চারটাকা মাইনে। সকালে হোক্ সন্ধ্যেয় হোক্—যখন কাজুর সুবিধা, নিয়মিত জলটা তুলে দিলেই হ'ল।

সেই সঙ্গে আরও একটা কাজ আছে: ওদেরই বাড়ীর কাছে। সেখানে শুধু বড় বাল্তির দু-বাল্তি খাবার জল তুলে দিলেই চল্বে। তাদের বাড়ীতে কুয়া আছে। মাইনে একটাকা।

সব খুলে ব'লে ভরত প্রশ্ন করে, 'কী রে, করিবি?'

করিবি! হাতে স্বর্গ পায় যেন কাজু। মাসে পাঁচ টাকা ক'রে আয় বাড়া মানে পাঁচটাকা ক'রেই জমা। বছরে নীট ষাট টাকা ক'রে জমবে। দরকার হ'লে আরও দু' একটা কাজ নেবে সে। না হয় ভোর চারটেয় সে উঠবে। কলের জল আসবার আগেই নিজের রান্না স্নান সেরে নেবে—তারপর জল তুলে দিয়ে কোনমতে ভাত খেয়ে কাজে বেরোবে।

এ ছাড়া টাকা জমানোর উপায়ই বা কৈ?

পরের দিন থেকেই কানু কাজে লাগল। কাজ এমন কিছু নয়। প্রকাণ্ড দুটো বালতি দুহাতে ঝুলিয়ে এনে ঢেলে দেওয়া, এ তার গায়েও লাগে না। অসুবিধা যা একটু সময়ের। একবার জল ঢেলে দিয়ে ফিরে এসে দেখে ইতিমধ্যে আরও দু চারটে বালতি ঘড়া কলের ধারে জমা হয়ে গেছে। খানিকটা দাঁড়িয়ে না থাকলে আবার কল খালি পাবার উপায় নেই।

কিন্তু তা'তে কানুর দুঃখ নেই। মনিব সে পেয়েছে ভালই। ভাল মনিবের জন্য খাটতে কষ্ট হয় না।

ওর যেটা বড় কাজ—সেখানে সংসার খুবই ছোট। স্বামী-স্ত্রী আর একটি ছোট ছেলে—বছর-দেড়েকের। কাজ কম, জলও কম লাগে।

বাবু কাজ করেন কোন বাঙ্গালীর কারবারে—বাড়ী ফিরতে রাত ন-টা বাজে। তাঁর সঙ্গে ওর দেখা হয় এক শনিবার দিন। বাবুটির অল্প বয়স, মানুষও ভাল বলে মনে হয়। আর বৌটির ত কথাই নেই। ভারি মিষ্টি কথা—সস্নেহ ব্যবহার। তাঁদের চা খাওয়ার সময় কোনদিন গিয়ে পড়লে ওকে চা না খাইয়ে ছাড়ে না। প্রথমটা খুব সঙ্কোচ বোধ করেছিল কানু কিন্তু বৌদির সরল ও নিঃসঙ্কোচ সহজ ব্যবহারে এখন আর কোন দ্বিধা নেই। কত গল্প করে বৌদি তার সঙ্গে—ছেলের গল্প, বাড়ীর গল্প, শ্বশুর বাড়ীর গল্প। ওর কথাও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে প্রশ্ন করে, শোনে সহানুভূতির সঙ্গে। তার চেয়েও বড় কথা, মনে ক'রে রাখে। বনলতাও প্রশ্ন করত কিন্তু সেটা যে আন্তরিক নয় তার প্রমাণ ঐ ভুলে যাওয়াই। অন্যমনস্ক ভাবেই জিজ্ঞাসা করত, অন্যমনস্ক ভাবে শুনত তার উত্তর। ফলে এক কথাই রোজ প্রশ্ন করতে বাধত না।

বেশ বৌটি।

ললিতা নাম। বয়স বোধহয় কুড়ি-একুশের বেশি হবে না। খুব সুন্দরী যে তা নয়, তবে সুশ্রী। গায়ের রং উজ্জল শ্যাম, মুখশ্রী শান্ত ও মিষ্ট। আর তেমনি পরিষ্কার কাজ কর্ম ওর; রান্নাঘর ইতিমধ্যে অনেকগুলোই দেখলে কানু কিন্তু তার কোনটাই এর ধারে কাছে আসে না। বাসনগুলো যেমন ঝক ঝক করে, তেমনি পরিচ্ছন্ন উনানের চার পাশটা। জঞ্জালে-ছাইয়ে-জলে যেমন অন্য উনানধারগুলো থক্ থক্ করে, এখানে তার কিছুই নেই। রান্না শেষ হয়ে গেলেও মনে হয় যে এখনও রান্না শুরু হয় নি। এইটেই সবচেয়ে বিস্মিত করে তাকে। রান্নাঘরেরই এক দিকের তাকে ডাল মশলা সব টিনে

ও শিশিতে সাজানো, সব গুলিই পরিপাটি ভাবে নিজের স্থানে গুছানো থাকে রান্নার পর—কোনদিন এতটুকু স্থানচ্যুতি হয় না তাদের, মায় বাসনগুলোও জলচৌকির ওপর এমন সুন্দর ভাবে সাজানো থাকে যে, সেগুলোর কখনও ব্যবহার হয়েছিল বলেই মনে হয় না।

এম্‌নি নির্মল ও পরিচ্ছন্ন আব্‌হাওয়া এই ছোট সংসারের সর্বত্র। ছেলেটার ইজের-জামা কখনও ময়লা দেখে নি কানু। কিংবা কখনও দেখেনি ময়লা মেঝে বসে আছে। ঘর-দ্বারে আসবাবপত্রে বিছানায় একটা অদ্ভুত পারিপাট্য ও শ্রী। তাতে ঐশ্বর্যর আড়ম্বর নেই কিন্তু যত্নের শুচিতা ও রুচিবোধের পরিচয় আছে। বাড়ীর মধ্যে ঢুকলে যেন চোখ জুড়িয়ে যায়। সারা মন একটা অপরিসীম আরামে স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। সে আরাম, সে স্বাচ্ছন্দ্য ওর জন্য নয়—তা কানুর চেয়ে আর বেশি কে জানে? তবু ওর ভাল লাগে। ওর মনে হয় এইখানে ওর অবসরের প্রতিটি মুহূর্ত কাটাতে পারলে ও খুশি হত।

কিন্তু অবসরই যে দুর্লভ এখন ওর জীবনে।

গিয়ে রাঁধতে হবে। কারখানায় দেরি হলে চলবে না। নিজের খুটিনাটি কাজ বিস্তর। এমনি সহস্র চিন্তা ওকে সজাগ ও সতর্ক ক'রে রাখে, তবু দেহ যেন নড়তে চায় না। কানু স্বেচ্ছায় ও সাগ্রহে বৌদির ছোটখাটো ফরমাস খাটতে চায়। ললিতা অবশ্য সহজে ওকে দিয়ে অন্য কোন বাড়তি কাজ করায় না, কিন্তু কোন ফরমাশ করলে কানু যেন কৃতার্থ হয়ে যায়! সেধেও এটা-ওটা অনেক কাজ ক'রে দেয় সে।

তবে বেশীক্ষণ থাকতে ওর সাহস হয় না—অন্য কথা ভেবে। কে জানে, ললিতা-বৌদি যদি কিছু মনে করেন? ওর এই শ্রদ্ধা ও প্রীতিকে যদি আর কোন চোখে দেখেন? যদি—যদি ধৃষ্টতা বলে মনে করেন? কিংবা অপর কেউ যদি কিছু মনে করে? ওর নিজের জন্য কোন চিন্তা নেই—ললিতা-বৌদিদিকে না কোনদিন এতটুকু আঁচড় লাগে।

কথাটা যেদিন মনে পড়ে সেদিন সে কোনমতে কাজ সেরেই বাড়ী ফিরে আসে।

কিন্তু বাড়ীতে এসে আজকাল এত বিশ্রী লাগে! গৃহ শয্যা—সারাদিন কঠোর পরিশ্রমের পর আরামের যা কিছু উপকরণ যে এত নিরানন্দ বোধ হতে পারে তা কানুর আগে আর কেউ বোধ হয় এমন ক'রে উপলব্ধি

করেনি। ময়লা বিছানা, বিশৃঙ্খল ঘর-কন্না; কোন্‌টা কোথায় রাখে নিজেই খুঁজে পায় না। রান্নার জায়গাটা কতদিন যে পরিষ্কার হয় নি তা মনে করাও শক্ত। পোড়া বিড়ির টুকরোয় আর দেশলাইয়ের কাঠিতে মেঝেটা যেন পুরু হয়ে উঠেছে। পরিষ্কার করতে ইচ্ছেও করে না—বোধ হয় আর উদ্যমেও কুলোয় না। বাড়ীতে এলেই মন যেমন হতাশায় ভরে যায়, দেহও তেমনি ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে। মনে হয় নিজের জন্য আর এত পারা যায় না। বাইরের কাজ, কারখানার কাজ ক'রে এসে আবার ঘর ঝাট দেওয়া, উনুন নিকানো—? থাক্‌গে! অমনিই থাক্‌। তার আবার ঘর-কন্না, তার আবার জীবন! তার জন্য আর এত পোষায় না। এই ত দৈন্য চারিদিকে, এই ত অভাব। এর ভেতরে সে আর কতটুকুই বা স্বচ্ছন্দ করতে পারবে জীবনকে?

সুতরাং পরিষ্কার করাটা হয়ে ওঠে না কোনদিনই। অথচ মন বিরক্তিতে ভরে যায় ঘরে ঢুকলেই। বিশেষত রাত্রিবেলা—ললিতাদের বাড়ী জল দিয়ে এসে ঘরের তালা খুলে হাতড়ে হাতড়ে যখন আলো জ্বালে তখন কালিপড়া চিম্‌নির ম্লান আলোতে ঘরের যে চেহারাটা ওর নজরে পড়ে তাতে কিছুক্ষণ আর রান্না-খাওয়ার কোন ইচ্ছাই থাকে না। অপ্রসন্নমুখে চারিদিকে চেয়ে অবসন্নভাবে বসে থাকে খানিকটা ভ্রূকুটি ক'রে। খাওয়ার ইচ্ছাও যেন চলে যায় ওর। কিছুতেই উৎসাহ থাকে না। কেবলই মনে হয় এ জীবন যাপনের দরকার নেই।

ললিতা-বৌদির বাড়ীতে যায় ও সারাদিন কারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে, তবু ত এতটুকু ক্লান্তি অনুভব করে না। মনে হয় এখানে খেটেও সুখ। আরও কিছু করবার থাক্‌লে খুশী হ'ত যেন ও। মাঝে মাঝে ওর এই মনোভাবে ও নিজেই বিস্মিত হয়—কারণটা খুঁজতে চেষ্টা করে।

শেষে একদিন অসহ্য হয়ে উঠতে ও মোক্ষদার কাছে গিয়ে দরবার জানাল। মাসি যদি ওর ঘরটা মধ্যে মধ্যে ঝাঁটপাট দিয়ে পরিষ্কার ক'রে দেয়, আর উনুনটা নিকিয়ে মুছিয়ে দেয় তাহ'লে ও বরং মাসে মাসে কিছু দিতে রাজী আছে—

মোক্ষদা বলে, 'পোড়া কপাল! বুড়োবয়সে তোর কাছে চাকরি ক'রে মাইনে নিতে হবে! যা—যা—'

কিন্তু একদিন এসে সে সত্যিই পরিষ্কার ক'রে দিয়ে যায়। রোজ আসা তার পক্ষে সম্ভব নয়—তবে যতটা পারে মধ্যে মধ্যে এসে ক'রে দিয়ে যাবে সে।

টাকার প্রত্যাশী সে নয়। কানু যেন আর কখনও তাকে টাকা না দেখায়। ঐ জন্যেই ত বলা যে, কানু একটা বিয়ে করুক। তা সে-দিক দিয়ে ত যাবে না। বুড়ো-বয়সে কি আর সত্যি-সত্যিই রেঁধে খাওয়া যায়! মাসিই বা কত করবে? তার বয়সই কি কম হ'ল?

গজ গজ করতে করতে চলে যায় মোক্ষদা। কিন্তু তার পরিষ্কার করা ঘরে ঢুকেও কানু খুশি হতে পারে না। পরিচ্ছন্ন ঘর কাকে বলে এরা তা-ই জানে না, কোন জ্ঞানই নেই যে! এদের কাছে সে আশা করাই ভুল!

আরও ভুল ওর ললিতা-বৌদির ঘরের দিকে চাওয়া।

শ্বেতচামরে আর ঘোড়ার লেজে! অনেক তফাৎ, অনেক তফাৎ। ঝি আর চাকর, এই ত তাদের পরিচয়। যে জীবন যাকে সাজে তাই নিয়েই খুশি থাকা ভাল।

তবু এক সময়ে মোক্ষদার কথাটাই ওর মাথার মধ্যে কোথায় যেন একটা বাসা খুঁজে পায়। মোক্ষদার প্রস্তাবটা বীজ, তা নিয়ত ললিতা-বৌদির ঘর-কন্না, তার জীবনযাত্রার স্নিগ্ধ বারি-নিষেকে ক্রমে ক্রমে অঙ্কুরিত হয়ে ওঠে।

ওর কারখানার বন্ধুরাও পরামর্শ দেয়, 'ত্যাখ্ কানু, এমন ক'রে আর পারবি না বেশিদিন চালাতে। একদিন যখন শরীর ভাঙবে তখন মুখে জল দেবার লোক খুঁজে পাবি নি। এখন না হয় বয়সের জোর আছে, যুঝে যাচ্ছিস্—এর পর? কী খাচ্ছিস্ দুধ-ঘি মোণ্ডা-মিঠাই—যে, রক্তের তেজ বেশীদিন থাকবে। বাড়ী ফিরে গিয়ে দুটো রাঁধা ভাত দরকার!'

প্রবীণরা বলেন, 'হাতে কাঁচা পয়সা আর অল্প বয়স—এ দুটোর যোগাযোগ ভারি খারাপ, বুঝলি কানু?'

কানু হয়ত প্রতিবাদ করতে যায়, 'এ'কে কাঁচা পয়সা বলেন?'

'ঐ হ'ল বাবা!...দরকারের বেশি যা, তাই আমাদের কাছে কাঁচা পয়সা। ভাগাড়ে গোরু পড়লেও যা বেড়াল পড়লেও তাই, শকুনির কখনও অভাব হয়? তার চেয়ে একটা বিয়ে কর্—জীব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি—দিন মানুষের একরকম ক'রে চলেই যায়।'

যতীন ওর সঙ্গেই কাজ করে, সে ঠাট্টা ক'রে বলে, 'কী অপ্সরী তোমাকে

বিয়ে করবে তাই শুনি? কার জন্যে হা-পিত্যেশ ক'রে আছিস? যা, যা—যেমন জোটে তাই বিয়ে করগে যা। কেন, আমরা ঘর করছি না?'

তাই ত!

বিয়েই করবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

বাসা বাঁধতে ত হবেই জীবনে একদিন। আর তার জন্যই ত সব—এত পরিশ্রম, টাকার জন্য এত ছুটোছুটি। বৌ ছেলেমেয়ে সংসার। বাইরের কাজ থেকে ফিরে দেখবে, ঘর-দ্বার সাজানো গোছানো, চা-জলখাবার তৈরি—হাসি-হাসি মুখে ছেলেমেয়েরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই ত জীবন, তার জন্যই ত এত কষ্ট, এত তপস্যা। গৃহসুখ যে কী তা ত সে ভুলেই গেছে। ভুলে যাওয়াই বা কেন, সে জানলে তবে যে, ভুলে যাবে! মার স্মৃতি আজ ঝাপসা! মা যখন ছিল তখন তার যত্নের দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখবার মত, তার মূল্য বোঝবার মত বয়স ওর ছিল না। তা ছাড়া অস্পষ্ট স্মৃতিতে যেটুকু ছবি ওর জেগে আছে, তার মধ্যেও কোনখানটায় ওর স্বপ্ন বা আদর্শের সঙ্গে মিল নেই। পাঁচবাড়ী খেটে এসে পরিচ্ছন্নভাবে জীবনযাত্রা-নির্বাহের কথা কুন্তী ভাবতেও পারত না।

না, গৃহসুখ সে কোনদিনই পায় নি।

পাবেও কি কোনদিন? উত্তরকালে কখনও?

চিন্তাটা মনে উঁকি মারা মাত্র সে ভয়ে শিউরে ওঠে। তাদের ঘরে তাদের সমাজে এ ধরণের জীবনযাত্রার কথা কেউ জানেই না যে। সে অভাব-বোধও ওদের নেই। ওরা জেনে নিশ্চিন্ত আছে যে ভদ্র ও শোভন জীবন-ধারণের প্রণালীটা একমাত্র ম-গী ও বাবুদের জন্য। ওদের এসব নিয়ে মাথা ঘামাতে নেই।

তাকে যদি বৌ আনতে হয় ত ঐ ঘর থেকেই আনতে হবে। সে কি বুঝবে কানু ঠিক কি চায়? সে কি পারবে ঐ রকম—ঐ রকম না হোক্ কতকটা ঐ ধরণের ঘর-সংসার করতে!

আবার মনে মনে ও নিজেকেই নিজে আশ্বাস দেয়। গ'ড়ে নিতে পারলে অন্তত কতকটাও হবে ত! আর না হলেই বা কি? এমন করে আর ক'দিন সে পারবে? এখন যদি কেউ শুধু ভাতটা রেঁধে দেয় তাহলেও বাঁচে।

এক একবার ভাবে পুঁটির কথা। পুঁটির কাছেই আশ্রয় নেবে নাকি শেষ পর্যন্ত?

না, না, ছি!—সঙ্গে সঙ্গে ধমকে দেয় মনকে।

বিয়েই তাকে করতে হবে।

তবে ঠিক এ অবস্থায় সে করতে পারবে না। পরের ঘরে, এই সামান্য আয়ে—জীবনটাকে বিড়ম্বনা করে তুলবে না সে কিছুতেই! অন্তত মাটির ঘরও একটা না বেঁধে সে ও কাজে যাবে না। তা ছাড়া, গৃহকে গৃহসজ্জায় সাজানো চাই; তবে ত তার মধ্যে তার গৃহিণীকে মানাবে। যার যা অঙ্গ। শুধু যেমন-তেমন ক'রে বিয়ে করা—তারপর নিত্য অভাব, একপাল ছেলেমেয়ে নিয়ে শেষ অবধি বৌ যাবে পরের বাড়ী কাজ করতে—ছিঃ!

কিন্তু উপায়ও একটা শেষ পর্যন্ত হয়।

কারখানার কাজ বাড়ে। বিলেতে কোথায় যুদ্ধ বেধেছে সে যুদ্ধের জের এখানেও আসতে পারে, তারই তোড়জোড় চারিদিকে। সরকার বাহাদুর চারিদিকে কাজ দিচ্ছেন, আশেপাশের যত কারখানা সে কাজের উৎসাহে ফুলে ফেঁপে উঠল। ভোঁদাদের কারখানায় সামান্য আয়োজন, বেশী কাজ পাবার উপায় ছিল না। তবু যেটুকু পেলে তাতেই রোজ ওভারটাইম চলতে লাগল।

অবশ্য তাতে কর্মচারীদের মন ভরে না। অন্য অন্য কারখানায় ডবল ডবল মাইনে দিচ্ছে। তোমাদের কাজ কম বললে আমরা শুনব কেন? কানাঘুষো হয়—বাইরে থেকে লোক এসে ফিস্-ফিস্ করে, একটি একটি ক'রে লোক ছেড়ে যেতে থাকে বেশী-মাইনের লোভে। কানুও চঞ্চল হয়ে ওঠে, নানা কারখানা থেকে নানা লোক আসে বেশী মাইনের প্রস্তাব নিয়ে, শুধু ভোঁদারা অসময়ে ওকে ডেকে চাকরি দিয়েছে বলে কানু তাদের ছাড়তে পারে না।

তবে কতদিন এ নিমকের মর্যাদা রাখা সম্ভব হ'ত তা সেও বলতে পারে না। কিন্তু বেশী দিন পরীক্ষার প্রয়োজনও হ'ল না। এক ভাটিয়া আর এক পাঞ্জাবী মহাজন এসে ওদের মোটা টাকা দিতে চাইল। ওদের কারখানায় বিস্তর জায়গা পড়ে আছে, বাড়ানো চলবে ঢের। এমন বোকামি করছে কেন ওরা? চারিদিকে পয়সা উড়ছে—এ সময় চুপ ক'রে বসে থাকবে নাকি? টাকা নিক, চার আনা চার আনা ভাগ দিক্, এখনই বড় বড় মেশিন বসিয়ে ওরা মোটা মোটা কাজ করতে পারবে।

ভোঁদাদের কারখানায় দৈন্য এবং অভাব চারিদিকে—কোনক্রমে টিকে ছিল মাত্র। এ লোভ ওরা সামলাতে পারলে না। রাজী হয়ে গেল।

তারপর রাশি রাশি ইট এল, বস্তা বস্তা সিমেণ্ট। বড় বড় টিনের শেড উঠল। তাতে বিপুলাকার দৈত্যের মত অসংখ্য যন্ত্র খাড়া হল।

ওদের কাজের অন্ত রইল না। মাইনে বাড়তে লাগল লাফিয়ে লাফিয়ে। সবাই বললে, 'বাইরের কাজ এবার ছেড়ে দে। এখানে আধঘণ্টা বেশি খাটতে পারলেও লাভ আছে। তোর জল তুলে আর ক'পয়সা হবে?'

এমন কি, যে ভরত এ কাজে ওর গুরু, সেও বাইরের সব কাজ ছেড়ে কারখানা নিয়ে পড়ল। বেলা আটটায় হাজিরা দেয়, যায় রাত আটটায়। কোন কোন দিন আরও বেশি।

কানু ইতিমধ্যে আরও একবাড়ী কাজ নিয়েছিল, এবার সে সবগুলোই ছেড়ে দিলে, খালি ললিতা-বৌদিদের বাড়ী ছাড়া। এ বাড়ীর কাজ সে ছাড়তে পারবে না। এ ওর কাজ নয়—এ ওর নেশা। পরিশ্রম নয়, বিশ্রাম, আনন্দ। এইটুকু সময় সে এক পরম বিত্তে মনকে ভরে নিয়ে যায়—আর তাই নিয়ে চলে ওর রোমন্থন। দিনরাত সেই স্বপ্নে বিভোর হয়ে থাকে। কারখানার হাড়ভাঙা খাটুনির মধ্যে ওর বলিষ্ঠ পেশীগুলো যখন অবশ হয়ে আসে, পিঠের হাড় টন্ টন্ করতে থাকে—তখন হাতের কাজ থামিয়ে কয়েক মুহূর্তের জন্য শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়ায় আর ভাবে ললিতা-বৌদি এখন কি করছেন? হয়ত পা ছড়িয়ে বসে তেঁতুলের বীচি কেটে কেটে জড়ো করছেন, নয়ত ছেলের মুখ মুছিয়ে পাউডার মাখিয়ে কাজল পরিয়ে দিচ্ছেন।

এর মধ্যে বনলতা ওকে বহুবার ডেকে পাঠিয়েছেন লোক দিয়ে। তার ভেতর একবার মাত্র কানু দেখা করতে গিয়েছিল। ওর বলিষ্ঠ দীর্ঘ চেহারার দিকে তৃষার্ত দৃষ্টি মেলে বনলতা প্রস্তাব করেছিলেন সেদিন যে, তিনি আর তাঁর স্বামী পুরী যাচ্ছেন হাওয়া খেতে—পনেরো দিনের জন্য। এই পনেরো দিন যদি কানু ছুটি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে যায় ত ওর কারখানার মাইনে যা ক্ষতি হবে তার ডবল পুষিয়ে দেবেন তিনি। তাছাড়া খাওয়া-পরা রাস্তা-খরচ সব তাঁদের। ভাল বিশ্বাসী লোক পাচ্ছেন না বলেই—

ছুটি এর ভেতর একদিনও নেয়নি কানু। নেবার প্রয়োজন হয়নি। ছুটি চাইলেই পাওয়া যায়, হয়ত মাইনে সুদ্ধই পাওয়া যায়। প্রস্তাবটা সব দিক দিয়েই লোভনীয়। তবু সে যেতে পারেনি। ললিতা-বৌদির কষ্ট হবে। যদি তাঁরা লোক না পান? লোক হয়ত কানুই জোগাড় করতে পারত কিন্তু—কিন্তু—মনে হ'ল ওর—সে যদি কামাই করে? ঠিক ঠিক যদি না আসে?

না, শেষ পর্যন্ত সে রাজী হতে পারেনি বনলতার প্রস্তাবে। বনলতাকে দেখে আজও ওর লোভ হয়, কিন্তু ললিতা-বৌদিকে সে পুজা করে। সে পুজোর মধ্যে কলুষের নাম-গন্ধ নেই। ও শুধু দেখেই খুশী, ওঁর সংসারের আবহাওয়াতে যেন মুক্তির স্বাদ আছে, চিত্ত একটা অদ্ভুত বিশ্রাম পায়, প্রেরণা পায় নতুন পরিশ্রমের।

তা ছাড়া দিনরাত কারখানায় ঐ যন্ত্রের ঘড়ঘড়ানি শোনা, আর লোহার ঠক্‌ঠক্। গরম বাতাস, ঘাম, তেলের গন্ধ আর কাঁচা কয়লার ধোঁয়া। তার মধ্যে চৌদ্দ ঘণ্টা, ষোল ঘণ্টা কাটানো একনাগাড়ে? না, তা সে পারবে না। ও ভরতই করুক। ও-রকম পয়সায় দরকার নেই কানুর। ভরত ওকে হিসেব ক'রে দেখিয়েছিল বটে যে কতগুণ বেশী রোজগার সে করতে পারে ঐ সময়টায়, কিন্তু ভরত কি বুঝবে যে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব ছাড়াও পাওনা আছে মানুষের। ললিতা-বৌদি অবশ্য পাড়ার ঝি-চাকরদের বর্তমান মাইনের অঙ্কগুলো শুনে নিজে থেকেই একটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন ওর, কিন্তু না দিলেও দুঃখ ছিল না কানুর। ইদানীং বৌদি ঘরে কিছু ভাল খাবার করলেই ওর জন্যে রেখে দিতেন। সেই দু'খানা সিঙ্গাড়া কি চারটে রসবড়া কিংবা দুটো নারকেল নাড়ুর মূল্য ওর কাছে এক রোজের ওভার-টাইমের যা দাম তার চেয়ে ঢের বেশি।

ভরত ওকে বলে বোকা, ঠাট্টা করে কত কি! তা করুক।

বাইরে যে একটা বিপুল জগৎ পড়ে আছে, যেখানে গাছপালায় ফুল ফোটে, পাখী ডাকে, আকাশ ছেয়ে মেঘ ক'রে আসে, যেখানে মা ছেলেমেয়েকে ভালবাসে, যেখানে শিশুর মুখের হাসিতে সোনা ঝরে, যেখানে ললিতা-বৌদিরা গৃহকোণে সেবার ইন্দ্রজাল রচনা ক'রে বসে থাকে—সে জগৎ কারখানার ভরতের দল অনেকদিনই ভুলে গেছে। কানুরও ভোলবার কথা, তবু সে ভোলেনি। সব কথা সে বোঝে না, জানে না, তবু এখনও এগুলো তাকে তার অজ্ঞাতেই আকর্ষণ করে। সে কারখানার মজুরীর মধ্যেও নিজের মনুষ্যত্বকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে—নিজের অজ্ঞাতসারেই।

১১

অবশেষে কানু বিয়ে করল। মোক্ষদাই সম্বন্ধ ঠিক ক'রে দিলে। বেশি পণ লাগবে না, ওরই সম্পর্কে কি রকম নাতনী হয়। বেশ নাকি লক্ষ্মী মেয়ে। বয়সও একটু বেশি, কানুর যা চাই। চোদ্দ-পনেরো বছরের মেয়ে ওদের সমাজে দুর্লভ, এ মেয়েটি নাকি কানুরই অদৃষ্টক্রমে বসে ছিল। দৈবাৎ

আপনা-আপনিই বাতাসে শুকিয়েছে—বাকিটা তখনও ভিজে। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'এ কী কাণ্ড?'

বোকার মত চেয়ে থাকে চাঁপা, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে।

আবারও প্রশ্ন করে কানু, হয়ত একটু রূঢ়কণ্ঠেই, 'ব্যাপার কী? সময় পাওনি সারাদিন এটা শুকোতে দেবার?'

'মনে ছিল না।' বেশ সপ্রতিভ ভাবে জবাব দেয় চাঁপা। যেন এতে লজ্জা পাবার মত কিছু নেই।

ওর এই সপ্রতিভ ভাবটাই খারাপ লাগে কানুর। অপরাধী যদি লজ্জিত হয় নিজের কাজের জন্য ত, ক্ষমা করা যায়। যে তাও হয় না—যে বুঝতেও পারে না অপরাধটা কোথায় তাকে কি ক'রে শোধরাবে কানু?

আর একদিন ফিরে দেখলে ঘর অন্ধকার।

'কী হ'ল, আলো জ্বালোনি কেন?'

'তেল নেই।' জবাব দেয় চাঁপা।

'তেল নেই? এক বোতল পুরো তেল ছিল যে!'

'কাল হাত থেকে পড়ে বোতল ভেঙে গিছল।'

'কাল ভেঙেছিল? কৈ, আমাকে বলোনি ত! আমি যা হয় ক'রে একটা ব্যবস্থা করতুম!'

শান্ত-কণ্ঠেই চাঁপা উত্তর করে, 'মনে ছিল না অত।'

গা জ্বালা ক'রে ওঠে কানুর, 'অত মানে কি? এক বোতল তেল এই বাজারে ফেলে নষ্ট করলে, জানো যে আবার আলো জ্বালতে হবে—সে খবরটা কি অত খবরের মধ্যে পড়ল?'

চুপ ক'রে থাকে চাঁপা।

'তা ঘরে ত একটু সর্ষের তেলও ছিল, ন্যাকড়ার সলতে পাকিয়ে একটা পিদিমও ত জ্বালতে পারতে!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সারাদিন পরিশ্রমের তিক্ততা বিষ হয়ে বেরিয়ে আসে।

'কিসে কি জ্বালব না জ্বালব—অতশত বাপু আমার মাথায় যায় না।'

'তবে অন্ধকারে থাকো।'

বেরিয়ে পড়ে কানু তখনই। জলখাবার খাওয়া হয় না, চা খাওয়া হয় না। মুখ হাত ধোবারও অবসর পায় না।

পেছন থেকে শোনে চাঁপার উদ্বেগ-লেশ-হীন কণ্ঠস্বর, 'চা খেয়ে গেলে না? তেল একটু কোথাও চেষ্টা ক'রে দেখোনা—'

সে যদি ভদ্র হবার স্বপ্ন না দেখত মনে মনে, তাহ'লে তাদের ঘরের স্বাভাবিক নিয়মে বসিয়ে দিত ঘা-কতক চাপার পিঠে। কিন্তু প্রাণপণে আত্মসম্বরণ করে কানু। মনের দুঃসহ ক্রোধ দমন করার জন্য একরকম ছুটেই চলে যায় ললিতা-বৌদিদের বাড়ীর দিকে। অন্যদিন ঘরে এসে স্নান ক'রে সারাদিনের গেঞ্জিটা কেচে একটা কাচা শুক্‌নো গেঞ্জি প'রে তবে বেরোয় জল দিতে। এটুকু শৌখিনতা ওর বরাবরই আছে। তার জন্য অনেকে ঠাট্টা করেছে। বলেছে, 'বাবুদেরও যে অতগুলো গেঞ্জি নেই রে কানু! তা ছাড়া পরবি ত ওর ওপর তেলকালির জামা—কাচা গেঞ্জি কি হবে?'

কিন্তু কানু সে সব কথা শুনতে প্রস্তুত নয়। কারখানায় গিয়ে একটা তেলকালি-মাখা জামা পরতে হয় ঠিকই, তবে সেটা ত বাইরে থাকে। গায়ে যেটা লেগে থাকে সেটা পরিষ্কার হওয়া দরকার। তা ছাড়া যা দুর্গন্ধ হয়! অপর লোকে ঐভাবে কাছে এলে যখন তার বিশ্রী লাগে তখন নিজের সম্বন্ধেও সতর্ক হওয়া দরকার বৈকি! তাছাড়া সারাদিন পরে স্নান ক'রে উঠে আবার সেই ঘামে-ভিজে সপসপে গেঞ্জি পরতে ইচ্ছে করে না। জামা একটা আছে বটে, জামা প'রেই সে অফিসে যায়, গিয়ে খুলে রাখে, কিন্তু সে জামাও শুধু পরা যায় না—আর জামা প'রে জল তোলা বড় অসুবিধা।

আজ কিন্তু জামাটাও ছাড়া হ'ল না। ভেতরের গেঞ্জি ভিজে ওপরের জামাসুদ্ধ ভিজে উঠেছে। এ অবস্থায় ললিতা বৌদিদের বাড়ী যেতে ওর যেন কিছুতেই ভাল লাগে না। কেন লাগে না তা ও বোঝে না, তবে লাগে না এটা ঠিক।

ওদের বাড়ী পৌঁছে দেখলে বৌদির রান্না তখন শেষ হয়ে গেছে। উনুনের ধারে গরমে খাবার তরকারি সব থরে থরে সাজানো, উনুনটি লেপা-মোছা হয়ে গেছে, ঘর ধোওয়া পরিষ্কার—এইমাত্র যে সেখানে রান্না হয়েছে তার চিহ্নও নেই। বৌদির পরিষ্কার শাড়িখানার দিকে চেয়েও বোঝবার জো নেই যে, এইমাত্র তিনি রান্না শেষ ক'রে ঘর ধুয়ে উঠলেন। সুন্দর ললাটে চুলগুলি সযত্ন বিন্যস্ত, ঠিক মাঝখানে সিঁদুরের টিপটি জলজল করছে, আল্‌তার চিহ্ন যেন আগুনের রেখার মত সুন্দর দুটি পা ঘিরে আছে।

কানুর ইচ্ছে হ'ল সে ঐ দুটি পা ছুঁয়ে একবার পায়ের ধুলো নেয়, কিন্তু বৌদি কী মনে করবেন ভেবে নিতে সাহস করলে না। এ ইচ্ছা ওর অনেকবারই হয়েছে, কোনদিনই সাহসে কুলোয়নি। যদি কিছু মনে করেন, তা ছাড়া কী কৈফিয়ৎ দেবে সে এই আকস্মিক ভক্তির?

বিকেলের শুকোতে-দেওয়া-কাপড়গুলো বৌদি গুছিয়ে তুলে রাখছিলেন। কাপড় ওঁর আলনায় সাজানো থাকে, সে একটা দেখবার জিনিস—এমন পরিপাটি করে যে কাপড় কুচোন যায়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত। ওর দিকে চেয়েই বৌদি বলে উঠলেন, 'তুমি বুঝি অফিস থেকে সোজা আসছ কানু? বাড়ী যাওনি?'

'না বৌদি, দেরি হয়ে গেল!' সে জামাটা খুলে কলঘরের কপাটে ঝুলিয়ে রেখে বড় বড় দুটো বাল্‌তি নিয়ে বেরিয়ে গেল। দুবার মাত্র জল আনা হয়েছে সবে—বৌদি ডেকে বললেন, 'কানু, একটু চা খেয়ে নাও ভাই, অফিস থেকে সোজা এসেচ, চা খাওয়াও ত হয়নি!'

ইতিমধ্যেই বৌদি কখন জল চড়িয়ে দিয়েছেন নিবন্ত উনুনে, তা সে লক্ষ্য করেনি। শুধু চা নয়, একটা পাতায় দুখানা রুটি, একটু তরকারি, খানিকটা গুড়।

এতও নজর থাকে ওঁর, আর এত বিবেচনা!

আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় ওর চোখে জল এসে পড়ে। কোনমতে গলাটা পরিষ্কার ক'রে সে তবু একটু ক্ষীণ প্রতিবাদ করে, 'আপনাদের দুটো লোকের সংসারে গোনা-রুটি বৌদি, কম পড়ে যাবে যে! শুধু চা-ই দিননা।'

'না-না, কিছু কম পড়বে না, তুমি খাও। কম পড়লে আমি আবার করে নিতাম, তুমি বিশ্বাস করো।'

জল দেওয়া শেষ করে সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত কানু পথে পথে ঘুরে বেড়াল। স্টেশনে গিয়ে ওভার-ব্রিজের ওপর খানিকটা বসে রইল। আজ যেন বাড়ী ফিরতেই ইচ্ছে করছে না। গিয়ে দেখবে হয়ত এখনও আলো জ্বালা হয়নি, আলোর কোন ব্যবস্থাও নেই। ওকেই আবার ছুটোছুটি ক'রে তেল জোগাড় করতে হবে, তারপর আলো জ্বলবে তবে রান্না হবে। থাকুগে—আজ আর ও খাবেই না। ছুঁড়িও থাক উপোস্ করে—তবে যদি ওর চৈতন্য হয়!

তবু উঠতেই হয় এক সময়। যুদ্ধের দৌলতে চারিদিকেই মিট্‌মিটে আলো, স্টেশনও অন্ধকার। অন্ধকারে ওভারব্রিজে বেশি রাত অবধি বসে থাকলে, পুলিসে ধরবে—জবাবদিহি করতে হবে।

বাড়ী গিয়ে দেখলে চাঁপা পাশে কার বাড়ী থেকে একটু তেল চেয়ে এনে আলো জেলেছে, রান্নাও চাপিয়েছে। কিন্তু কানু সেদিন সত্যিই আর কিছু খেলে না, চাঁপার অনুনয়-বিনয়েও না। উপোস ক'রে পড়ে রইল।

তাতেও চাঁপার স্বভাব বদলায় না।

এ'রকম ঘটনা নিত্যই লেগে থাকে। চাঁপার শিক্ষা-দীক্ষা তাদের ঘরের মতই—খাবার জিনিস পরিষ্কার রাখতে হয়, ঢাকা দিতে হয় তা সে জানে না। এ নিয়ে কানু অনেক তিরস্কার করেছে। তবু এক একদিন হয়ত বাড়ী ফিরে দেখে যে, উনুনের ধারে ডাল তরকারি খোলা পড়ে আছে, চাঁপা সে তল্লাটেই কোথাও নেই, পাশে কোথাও গল্প করছে। জলের কলসীতে ঢাকা দেওয়ার প্রস্তাব ত সে কানেই তুলতে চায় না। কানু নিজে বারবার ঢাকা দেয়, কিন্তু পরক্ষণেই দেখে চাঁপা জল নিয়ে কলসীর মুখ খুলে রেখে গেছে। সেজন্য অনুযোগ করলে মুখের ওপরেই ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'জলের কলসীতে আবার ঢাকা, তোমার যত অনাছিষ্টি কথা! এ কি দুধ না মাছ যে, বেড়ালে খেয়ে যাবে?'

ফলে, একদিন ভাত খেতে বসে দেখে পাশে যে জলের গেলাস দেওয়া হয়েছে, তাতে মরা মাকড়সা ভাসছে। কানু হাতে হাতে প্রমাণ করে দিলে তার কথার যৌক্তিকতা, কিন্তু তবুও চাঁপা উদাসীন। নিরাসক্ত কণ্ঠে বললে, 'এতদিনের মধ্যে এই ত একদিন! তার জন্যে আর বার বার চাপা দিতে পারি না!'

এই বলে সে গ্লাসের জল ফেলে আবার সেই কলসীর জলই এনে দিলে গড়িয়ে।

কানু অবাক হয়ে প্রশ্ন করে, 'ওটা কী হ'ল?'

আরও অবাক হয়ে চাঁপা বলে, 'কেন, কী হয়েছে?'

'ঐ কলসীর জলটা আবার এনে দিলে? মাকড়সা ত কলসীতেই পড়েছিল!'

'তাতে কি? সারা কলসীর জলটাই তাতে অশুদ্ধ হয়ে গেল? ঐটুকু মাকড়সা, তাতে মরা। অতখানি জল তার জন্যে ফেলে দিতে হবে নাকি? কত কষ্ট করে জল আনা—এক কলসী জল আমি ফেলতে পারব না অত সহজে।

সে বেশ দৃঢ়কণ্ঠেই নিজের মতামত জানিয়ে দেয়।

কানু রাগ ক'রে গেলাসসুদ্ধ জলটা ওর গায়ে ছুড়ে দিয়ে উঠে পড়ে। ভাতের থালাটায় মারে এক লাথি—ভাত ডাল চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। তারপর না খেয়েই চলে যায় কারখানার কাজে।

চাঁপা পা ছড়িয়ে বসে খানিক কাঁদে। তাই বলে সে এত বোকা নয় যে নিজে উপোস ক'রে থাকবে, দুপুর বেলা ভাত বেড়ে নিয়ে বেশ সহজেই খেতে বসে।

ক্ষোভে, ক্রোধে, তিক্ততায় কানুরই শুধু বুক ভরে গ্লানি উপছে ওঠে—সারাদিনটা বিষাক্ত হয়ে থাকে।

কানু অনুযোগ করে মধ্যে মধ্যে, 'আচ্ছা সব সময়ই তুমি এত ময়লা কাপড় প'রে থাকো কেন? কাপড় তো তোমার ঢের আছে।'

'ময়লা?' চাঁপা আকাশ থেকে পড়ে যেন, 'ফি হপ্তায় ক্ষার কাচছি, তবুও ময়লা! আমার সব তাইতে খুঁত ধরা তোমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। তাই আর কিছু না পেয়ে কাপড় নিয়ে পড়লে। এর চেয়ে ফরসা কাপড় আবার কে কোথায় পরে? তা ত নয়—ও হ'ল তোমার গায়ে-গাছ-কেটে ঝগড়া করা—'

এই বলে সে ছড়া কাটে—

'যা তো দিদি, আন্ তো ঘোড়া,
ঝগড়া করতে যাবো বালি ওতরপাড়া।'
'তোর ঘর দেখবে কারা?'
'কেন, পাড়ার যত আট-গতর-খাকীরা!'
'আ মরণ! গাল দিচ্ছিস্ ধরে, আর ঘর দেখব আমরা?'
'অ দিদি, রাখ্ ঘোড়া।
এইখানেই পেয়েছি ঝগড়ার গোড়া,
যেত হ'ল না আর বালি-ওতরপাড়া!'

কানু তবুও ধৈর্য হারায় না। ঠাণ্ডা মেজাজেই বলে, 'বেশ ত, আয়নার গিয়ে একবার নিজের কাপড়টার পানে চেয়ে দেখো না—'

অসংখ্য-দাগযুক্ত কাপড়টায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চাঁপা বলে, 'কী করব, রান্না করতে গেলে কাদামাটি হলুদের দাগ লাগেই।'

কানুর চোখের সামনে ললিতা-বৌদির পরিচ্ছন্ন চেহারাটা ভেসে ওঠে। কিন্তু কিছু বলে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে যায়।

রাত্রে একশয্যায় পাশাপাশি শুয়ে সেই কাপড়ের ও চুলের দড়িটার দুর্গন্ধে এক একবার মনে হয় ছুটে চলে যায় সে—এ ঘর ছেড়ে, এদেশ ছেড়ে; কোথায় তা জানে না—তবে বহুদূরে!

এমনি ক'রে এক এক সময় ওর মন যেন হতাশায় ভেঙে পড়ে। এই স্ত্রী নিয়ে ওকে সারা জীবন কাটাতে হবে?

কানু অবশ্য মনকে শাসন করে বারে বারে। বারে বারেই ও বধূর দিকে নিজেকে নিয়ে যেতে চায়, তাকে নিয়ে সুখী হ'তে চায়, সম্পূর্ণ হ'তে চায়। কিন্তু কিছুতেই যেন তা হয় না। এ কী দুর্লঙ্ঘ্য দূরত্ব তাদের মধ্যে রচিত হয়েছে—যা কিছুতেই অতিক্রম করা যায় না! সে বুঝতে পারে না এ কেন, এ কী, এ কেমন ক'রে হ'ল! শুধু অনুভব করে যে ঐ মেয়েটি যেন সম্পূর্ণ-ভাবেই তার পর, একেবারে অপরিচিত কেউ।

একি ওর সাংসারিক কাজে নিপুণতার অভাব? একি ওর পরিচ্ছন্ন রুচিবোধের দৈন্য শুধু?

কানু এমনভাবে প্রশ্ন করতে পারে না, এমন সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ ক'রে দেখবার ক্ষমতাও তার নেই, সে তবু নিজেকে প্রশ্ন করে—কেন এমন হয়? সে কী চায়—যা পাচ্ছে না চাঁপার কাছে?

আসলে সে বুঝতে পারে না যে, সে চায় চাঁপার কাছে সম্পূর্ণভাবে নিজেকে উদ্‌ঘাটিত করতে। সে চায়, ও তার আশা-আকাঙ্ক্ষা বুঝুক, আশাভঙ্গের ব্যর্থতাতে সহানুভূতি বোধ করুক। কানু চায় ওর বৌয়ের কাছে সে যেন নিজেকে নিঃশেষ ক'রে দিতে পারে, নিজের ভার একেবারে ছেড়ে দিতে পারে। কানু চায় মনের কথা বলবার এবং বোঝবার লোক। এটা সে স্পষ্ট ক'রে বোঝে না—কিন্তু এইটেই সে চায়।

অথচ সে মনে মনে কেমন একরকম ক'রে নিঃসংশয়ে বুঝতে পারে যে তা হবার নয়। চাঁপার দেহ আছে, হৃদয় নেই। শিক্ষা বা সংস্কার ওর কাছে আশা করা যায় না, কিন্তু অন্তর? অন্তরও ওর নেই। চাঁপা যাকে বিয়ে করেছে, তার স্বাস্থ্য ভাল, সে দেখতে ভাল, তার নিজের ঘর আছে, সে ভাল রোজগার করে—এইতেই সে সুখী, সে গর্বিত। কানুর যে এর চেয়ে বেশী কিছু চাইবার থাকতে পারে, এর চেয়ে বেশী আশা তার কোন দিকে গ'ড়ে উঠতে পারে তা চাঁপার ধারণার অতীত।

তাই দিনের পর দিন কানুর চেষ্টা ব্যর্থ হয়।

বিছানায় পাশাপাশি ঘনিষ্ঠভাবে শুয়ে, কিংবা ওকে নিজের খুব কাছে টেনে এনেও মনে হয়, এ কা'কে সে কাছে টান্‌ছে, ওর পাশে শুয়ে আছে এ কে?

ভাবটা মন থেকে দূর করার চেষ্টা করে ও বারবার, বরং এ রকম নিজের মনের ভাবে ও বিস্মিতও হয় যথেষ্ট, তবু সেটাকে মুছেও ফেলতে পারে না একেবারে। নিজের এত কাছে একটা অপরিচিত অজ্ঞাত কোন অস্তিত্বে ওর মন অস্বস্তি অনুভব করে যেন। নিজেকে নিয়ে নিজের যে অন্তরঙ্গ

জীবনযাত্রা সেটা যেন ওর এই দাম্পত্যজীবন থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে দিন দিন।

তা বলে দৈহিক আকর্ষণটাকেও অস্বীকার করতে পারে না কোনমতেই। যৌবন তার স্বাভাবিক নিয়মে চাঁপাকে কাছে চায়, অথচ মন তাতে যেন একটু বিস্ময় বোধ করে, একটা অকথিত প্রশ্ন যেন জাগে মনে মনে এই স্ত্রীলোকটি সম্বন্ধে।

মোট কথা চাঁপাকে ওর ভাল লাগে কিংবা লাগে না এই প্রশ্নটারই কোন সদুত্তর খুঁজে না পেয়ে ও যেন নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠে। একটা কী যে, যন্ত্রণা হ'তে থাকে ওর ভেতরে ভেতরে। সে ক্ষোভ ও ক্রোধ বাইরে প্রকাশ পেয়ে মধ্যে মধ্যে চাঁপাকে ভয়চকিত ক'রে তোলে।

১২

যে কথাটি মনের মণিকোঠায় একেবারে নিজস্ব হয়ে থাকবার কথা, সেই কথাটিই কানু কোন্ এক অসতর্ক মুহূর্তে বলে ফেলে। সে জানত যে, তার এই বিশেষ মনোভাবটি আর কারুর বোঝবার কথা নয়। এ তার নিজের সহজ বুদ্ধিতেই বুঝত যে আসল কথা না বুঝতে পারলে এ ক্ষেত্রে কদর্থ হবার সম্ভাবনা আছে। তবু না বলে থাকতে পারলে না। বোধহয় কেউই পারে না। কোন মানুষই না। যে চিন্তাটি মাধুর্যে ও স্নিগ্ধতায় মানুষের মনকে রসাবিষ্ট ক'রে তোলে সেটির কথা আর আর কাউকে না বললে তার চলে না। মনের মধ্যে যে বার্তাটি সর্বপ্রধান ও সর্বাগ্রগণ্য—তাকে সে ঐ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে ধরে রাখতে পারে না।

তাই একদিন সাময়িক একটা দুর্বলতায়, কোন কারণে চাঁপার প্রতি তার চিত্তের প্রসন্নতার একটি বিশেষ মুহূর্তে, সেই পরমাশ্চর্য কথাটি সে বলে ফেলে—তার ললিতা-বৌদির কথা।

ললিতা-বৌদি কেমন পরিষ্কার, কেমন সুগৃহিণী, কেমন তাঁর রুচি-জ্ঞান, স্নেহ-মায়া-দয়ায় পূর্ণ তাঁর মন—এইসব গল্প করে সে, বহুক্ষণ ধরে। এতদিনকার বলবার এত কথা জমেছিল—আজ সেই নিরুদ্ধস্রোত যেন নিজেকে নিঃশেষ করে বেরিয়ে আসতে চায়। একবার মানুষ কোন একটি নিজস্ব কথা, যা বলার ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারেনি এতদিন, বলতে আরম্ভ করলে আর থামতে পারে না কানুও পারলে না। বলতে বলতে ঝোঁকের মাথায় অনেক কিছুই বলে ফেললে। যে শ্রদ্ধা স্বয়ং ললিতাবৌদিকে নিবেদন করা তার সম্ভব হয়নি, আজ এই গল্প করার মধ্যে দিয়ে সেই শ্রদ্ধা,

অন্তরের সেই অর্ঘ্যই যেন নিঃশেষে নিবেদন ক'রে দিয়ে ধন্য হ'তে চায় সে। ললিতা-বৌদি মাটির মানুষ নন্, ললিতা-বৌদি দেবী! একদিন সে চাঁপাকে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে আসবে।

চাঁপা অখণ্ড মনোযোগে সব কথা শুনছিল। মধ্যে মধ্যে শুধু একটি ক'রে প্রশ্ন করছিল সে, আর তার ফলে কানুর উৎসাহ আরও বেড়ে যাচ্ছিল, বাছুর যেমন ঢুঁ মেরে মাতৃস্তন থেকে আরও দুধ সংগ্রহ করে, তেমনি সেই সব প্রশ্নের উত্তরে আরও বহুকথা বেরিয়ে আসছিল গল্‌গল্‌ করে। আর নিঃশব্দে শুনছিল চাঁপা—সমস্ত ইন্দ্রিয়কে একাগ্র ক'রে যেন গিলছিল সে কথাগুলো।

নিজের ঝোঁকে অনেকক্ষণ ধরে বকে যাবার পর হঠাৎ এক সময়ে কানু সচেতন হয়ে ওঠে। এ কী করলে সে! চাঁপার নিস্তব্ধতাও সে এতক্ষণ লক্ষ্য করেনি ত! এ নিস্তব্ধতার অর্থ সে জানে—এর অর্থ হ'ল ভুক্তদ্রব্যকে নিজের জারকরসে রসিয়ে নেওয়া, শোনা-কথাগুলোকে নিজস্ব অর্থে রূপান্তরিত ও অর্থান্তরিত করা।

সে সশঙ্ক ভাবেই থেমে গেল। কিন্তু ওপক্ষ থেকেও কোন সাড়া এল না। না প্রশ্ন, না কোন মন্তব্য। কানু প্রথমটা একটু আশঙ্কার সঙ্গে চুপ ক'রে থাকলেও, অন্তরের রসভাণ্ডার নিঃশেষিত করার অপূর্ব অভিজ্ঞতায়, নিজের নিগূঢ় আনন্দের সংবাদ অপরকে জানাবার তৃপ্তি ও গৌরবে, নিজের নিভৃত হৃদয়ের একটি পরম সত্যকে সাক্ষীর সাহায্যে নিজের কাছেই প্রতিষ্ঠিত করার নিশ্চিন্ততায় সে আবার তন্ময় হয়ে ডুবে গেল। মুখে আর কিছু বললে না বটে, কিন্তু মনে মনে চলতে লাগল সেই চিন্তারই রোমন্থন বহুক্ষণ ধরে। আর তাই সে বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্য করলে না যে পার্শ্ববর্তিনীও জেগে আছে তার সঙ্গে সঙ্গেই।

এর তিন-চার দিন পরে চাঁপা সহসা একদিন প্রশ্ন ক'রে বসল, 'কৈ, আমাকে নিয়ে গেলে না?'

এ ক'দিন এত সহজ আচরণ করেছে চাঁপা যে কানুর সে কথাটা মনেই ছিল না। সে বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে, 'কোথায়?'

একটু চুপ করে থেকে চাঁপা বললে, 'তোমার মনিববাড়ী! তোমার সেই বৌদিকে দেখাতে!'

'সেই' শব্দটায় চাঁপার অজ্ঞাতসারেই বোধ হয় কেমন একটু জোর পড়ে

গিয়েছিল। কানু একবার সন্দিগ্ধ তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালে, কিন্তু মুখ ওর ভাবলেশ-হীন। তখন শুধু সংক্ষেপে উত্তর দিলে, 'হবে' খন।'

আরও তিন-চার দিন পরে আর-একবার চাঁপা সেই একই প্রশ্ন করলে। কানু কী একটা বাজে কথায় উত্তরটা এড়িয়ে গেল। কিন্তু এর পর থেকে চাঁপা প্রায় নিত্যই তাগাদা করে। কৈফিয়ৎ কয়েকদিন দেওয়া চলে, অবশেষে তাও যখন ফুরিয়ে গেল তখন একদিন সসঙ্কোচে ললিতা-বৌদির কাছে কথাটা পাড়লে, 'ও একবার আপনাদের বাড়ী বেড়াতে আসতে চায় বৌদি!'

'ও মানে? তোমার বৌ? আনবে বৈকি, নিশ্চয় আনবে। কালই নিয়ে এস সঙ্গে ক'রে।'

আসবার সময়ও আবার বলে দিলেন, 'কাল এনো তাহ'লে, বুঝেছ?'

পরের দিন অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই কানু নিয়ে গেল চাঁপাকে। এ যেন কী এক লজ্জা। এ লজ্জা বা সঙ্কোচের কোনই কারণ নেই—তার স্ত্রী ওঁদের মত হবে না এ-ত জানা-কথাই, তা কেউ আশাও করে না;—তবু একটা দুর্নিবার লজ্জা যেন বোঝার মত ঘাড়ে চেপে বসে।

ললিতা-বৌদি কিন্তু খুব যত্ন করলেন। খাবার খাওয়ালেন, চা খাওয়ালেন। রীতিমত আসন পেতে থালা করে খাবার সাজিয়ে দিলেন। চাঁপার উচিত ছিল ওঁর হাত থেকে আসনটা কেড়ে নিয়ে নিজে পেতে নেওয়া কিংবা মাটিতে বসা—ওঁরা গুরুজন, ওঁদের পেতে দেওয়া আসনে বসতে নেই; কিন্তু একথাটা চাঁপার মাথাতেই এল না, সে বেশ সহজভাবেই আতিথ্যের এই সমাদর মেনে নিলে। কানু মনে মনে রাগে গজরাতে লাগল, কিন্তু মুখে কিছু বলা সম্ভব নয় তখন। তার পক্ষে ললিতা-বৌদির হাত থেকে আসন কেড়ে নেওয়াও শোভন নয়। সে শুধু নিজে বসবার সময় আসনখানা একবার কপালে ঠেকিয়ে সসম্মানে সরিয়ে রেখে মেঝেয় বসল এবং খাওয়া শেষ হ'লে সংক্ষেপে স্ত্রীকে আদেশ করলে, 'বাসন ক-খানা ঐ কলতলায় নিয়ে গিয়ে মেজে দাও, আর জায়গাটা পেড়ে নাও।'

বৌদি অবশ্য বললেন যে, 'থাক না কাল ত আমার ঝি আসবেই, সে নেবে'খন'—কিন্তু কানুর মুখের দিকে চেয়ে চাঁপা আর সে কথা শুনতে সাহস করলে না।

পথে বেরিয়েই কানু চাঁপাকে তিরস্কার করতে শুরু করলে। চাঁপা খানিকটা নিঃশব্দে সব শুনে একবার একটা চাপা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'অতশত

আদিখ্যেতা আমার জানা নেই। মানুষের বাড়ি মানুষ গেলেই আসন পেতে দেয়। বৌদির আসনে বসায় কী এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়েছে তা বুঝি না। আসন কি পচে গেছে, না ফেলে দিতে হবে?'

কানু রাগ ক'রে জবাব দিলে, 'তাই যদি বুঝবে তাহ'লে আর ভাবনা কি! তুমি মানুষ হলে বুঝতে! বিয়ে করেছি যে জন্তুকে!'

চাঁপাও সমানে উত্তর দিলে, 'মানুষকে বিয়ে করতে হ'লে নিজে মানুষ হ'তে হয়। তুমিই-বা এমন কী তালেবর? নিজের দিকে চেয়ে দ্যাখো না? কারখানার কুলি কি আর রাজনন্দিনীকে বিয়ে করবে? পরের দেখে মাথা খারাপ করো কেন?'

কথাটা এমন নির্ঘাত সত্য যে কানু উত্তর দিতে পারলে না। দুঃসহ ক্রোধ প্রাণপণে দমন ক'রে সব আঘাতটাই হজম করতে হ'ল ওকে।

এরপর তিন-চার দিন চাঁপা কেমন গুম্ হয়ে রইল। এ-সব প্রসঙ্গ তোলেই না, কানু তুললেও এড়িয়ে যায়। তবে ভেতরে ভেতরে যে সে একটা কিছু পাকাচ্ছে, এ তার ভাবভঙ্গী দেখে বোঝে কানু। সেও মনে মনে কঠিন হতে থাকে।

অবশেষে একদিন ভেঙে পড়ল চাঁপা। কী একটু হাস্য-পরিহাসের মধ্যে কানু ওর প্রতি একটু সস্নেহ হয়ে উঠতেই, সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে হঠাৎ বলে বসল, 'দ্যাখো, তোমাকে একটি কথা রাখতে হবে আমার!'

'কী কথা? কানের দুল গড়াতে হবে?'

'না, না, তার চেয়ে ঢের সোজা।'

'তবু শুনি?'

'ও-বাড়ীর চাকরি তুমি ছেড়ে দাও—ঐ জলতোলা কাজ!'

কানু যেন প্রচণ্ড কি-একটা ধাক্কায় মুহূর্তে সজাগ ও সতর্ক হয়ে ওঠে। কিন্তু মুখে বলে, 'সে কি! কেন বলো ত? কী হয়েছে?'

'না, কিছু হয়নি। তবে তুমি এখন যা রোজগার করছ তাতে ও ক-টা টাকা না পেলে কিছু ক্ষেতি হবে না। চিরকাল কি আর জল তুলবে পরের? তা ছাড়া ঐ সময়টা কারখানায় খাট্‌লে ত আরও ঢের বেশি রোজগার হ'তে পারে।'

'আমার রোজগারের হিসেব তোমাকে নিতে হবে না।' কণ্ঠস্বর কঠিন

হয়ে ওঠে কানুর—'আমি যেন শুধু তোমাদের জন্তে টাকা রোজগার করতেই জন্মেছি। দিনরাতই কারখানায় খাটব! চব্বিশ ঘণ্টা যদি কাজ করতে পারি ত আরও ঢের বেশি রোজগার হয়। তাই করি এবার।'

চাঁপার কণ্ঠও আর ঠিক সুধামাখা শোনায় না। সেও উত্তেজিত ভাবে বলে, 'তোমার সব কথাতেই উল্টো বোঝা! জল তুলতে বুঝি খাটুনি হয় না? যত খাটুনি কারখানার কাজে!'

'তুমি কী বোঝ কাজের আর খাটুনির?'

'না—আমি কিছুই বুঝি না। তাই ত অত সহজে স্থাকা বোঝাতে পারো, নইলে কি পারতে? তোমার ত ও-বাড়ীর চাকরি টাকার নয়।'

'নয়ই ত!' ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলে কানু, 'ও আমার পয়মন্ত কাজ। ওরই পয়ে উন্নতি আমার। ও কাজ আমি ছাড়ব না। ও আমার লক্ষ্মী।'

'হুঁ, লক্ষ্মী! সে আমি জানি যে আমার কপাল পুড়েছে। ঐ ডাইনী গিলে খেয়ে বসে আছে তোমায়।'

'কী বললি!' প্রচণ্ড ধমক্ দিয়ে ওঠে কানু। ওর মাথায় রক্ত চড়ে যায় নিমেষে। ভদ্র হবার প্রাণপণ চেষ্টার ফলে সে নিজের আচার-আচরণ অনেকখানিই সংযত ক'রে নিয়েছিল, আজ অবধি কখনও স্ত্রীকে 'তুই' বলেনি। এই প্রথম।

চাঁপাও সমান জোরের সঙ্গে বলে উঠল, 'কী আবার বলব! ওখানে কাজের ঢের আগে তোমার কারখানার কাজ। সেটা লক্ষ্মী হ'ল না—এটা হ'ল! জানি গো জানি। ও কি আর তোমার পয়সার জন্তে করা, ও যে তোমার পীরিতের কাজ!'

'মুখ সামলে কথা বলবি হারামজাদী!'—রাগে দিগ্বিদিক্-জ্ঞানশূন্ত হয়ে চাঁপার চুলের মুঠিটা ধ'রে মাটিতে আছড়ে ফেলে কানু।

তবুও চাঁপা দমে না, কান্নায় ওর গলা বুজে আসে, তারই মধ্যে প্রাণপণে চেঁচায়, 'তোমার কীর্তি কি আর আমার বুঝতে বাকি আছে, একদিনেই বুঝে নিয়েছি। সত্যি কথা বললে সবারই অমনি হিং লেগে যায়। রাক্কুসি! ডাইনি! সব্বস্ব গিলে খেয়ে বসে আছে ... হবে কি, সেইজন্তেই ত আমাকে তুমি দুটি চক্ষে পেড়ে দেখতে পারো না!'

কিন্তু তার শারীরিক শক্তি আর পাল্লা দিতে পারলে না। কীল, চড়, লাথি—দুদ্দাড় ক'রে বর্ষণ হ'তে লাগল। কানু যেন পাগল হয়ে উঠেছে, আজ ওকে খুন ক'রে ফেলবে।

চাঁপার চীৎকারে আশপাশের বস্তির লোক ছুটে এল, কে একজন এসে ওর হাতটা চেপে ধরলে। হয়ত কেউ কিছু তিরস্কারও করলে কিন্তু সে সব কোন কথাই কানুর কানে গেল না, দুঃসহ ক্রোধে সমস্ত রক্ত ওর তখন মাথায় উঠেছে যেন, কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ করছে, মাথায় সব যেন গোলমাল। তবু হাতটা ধরতেই থেমে গেল সে, নিজেও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল, এ শ্রেণীর উত্তেজনায় যে অনভ্যস্ত তার ক্লান্তি বা অবসাদ সহজেই আসে। সে একবার বিহ্বলভাবে সকলের দিকে তাকালে, একবার চাইলে পায়ের কাছে রোরুদ্যমানা বীভৎস-মূর্তি চাঁপার দিকে, তারপর কারুর সঙ্গে একটি কথাও না বলে এক রকম ছুটেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

জীবনে এ-রকম রাগ কখনও হয়নি কানুর, এ-রকম অনুভূতির প্রচণ্ডতাও কখনও বুঝতে পারেনি সে।

রক্ত তখনও তার মাথার দিকেই উঠতে চাইছে, নিজের বুকের শব্দে নিজেরই কান যেন রুদ্ধ। দৃষ্টি আচ্ছন্ন, চোখের স্নায়ু অবশ।

সে প্রথমে কতকটা দিশাহারা ভাবেই ছুটল। স্টেশন পার হয়ে লাইন ডিঙিয়ে ও-পাশের বড় রাস্তাটা পেরিয়ে—কোথায় যে ছুটছে তা সে নিজেও জানে না।

স্ত্রীর ওপরে শুধু যে ঐ কথাগুলো বলার জন্য রাগ তা নয়—আজ যে তাকে পশুর স্তরে সে নামিয়ে এনেছে সেজন্যও রাগ কম নয় ওর। ও যা হ'তে চায়নি, যে জীবনকে সে প্রাণপণে চেষ্টা করেছে পরিহার করে চলতে—তাই ওকে আজ হ'তে হয়েছে, সেই জীবনের মধ্যে নেমে তাদের সমাজেরই পাঁচ-জনের সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গিয়েছে—এ ক্ষোভও ওর কম নয়!

কিন্তু এসব কথা তার তখন গুছিয়ে ভাববার সময় নয়। নিজের উন্মত্ত ক্রোধ নিজেকেই তখন দহন করছে, রক্ত-চলাচলের আওয়াজে সমস্ত শ্রবণশক্তি আচ্ছন্ন, রক্ত এসে ঢেকে দিয়েছে দৃষ্টিশক্তিকে—রক্তই দেখছে সে।

'হারামজাদীকে একেবারে খুন ক'রে ফেলাই উচিত ছিল! গলা টিপে মেরে ফেলতে পারলে খুশি হতুম!'

বার বার আপনমনে, কেমন একটা বিকৃতকণ্ঠে কথাগুলো উচ্চারণ করে সে।

ওর মুখের ভাবটা যন্ত্রনায় বিকৃত। সে যন্ত্রণা ওর আত্মার। সমস্ত অন্তর ওর মুচড়ে উঠেছে অসহ একটা বেদনায়।

বহু রাত্রি পর্যন্ত ঘুরে বেড়াল সে অমনি ক'রে। রাস্তায় রাস্তায় শুধু

বসবার ইচ্ছাও ছিল না, শক্তিও ছিল না। তাকে চলাও বলে না, একরকম ছুটে বেড়ানো। সে সময় ওর পরিচিত কোন লোক ওর মুখের চেহারা দেখলে ভয় পেত। অবশ্য সে সম্ভাবনা ছিল না, কারণ ওর নিজের অজ্ঞাতসারেই কানু আলো এড়িয়ে রাস্তার অপেক্ষাকৃত অন্ধকার অংশ দিয়েই চলছিল।

অবশেষে একসময় কেবলমাত্র শারীরিক ক্লান্তিতেই থাম্‌তে হ'ল ওকে।

রাস্তার ধারের একটা আলোর খুঁটিতে ঠেস দিয়ে অবসন্নভাবে দাঁড়াল। উদ্‌ভ্রান্তের মত এতক্ষণ ছুটে বেড়িয়েছে সে। কত রাত হ'ল কিম্বা কোথায় এসেছে, কিছুই জানে না। কোথায় যাবে এখন, বা কোথায় রাত কাটাবে, তা ভেবে দেখবার অবকাশ পায় নি। কিন্তু এখন ওকে কোথাও বিশ্রাম করতে হবে—একটু বসা চাই-ই। সমস্ত শরীর পাতার মত কাঁপছে, হাঁটু ছুটো মুড়ে আস্‌ছে আপনা আপনিই।

বাড়ী যাবে? বাড়ী?

সেই বহু লোকের জটলা আর চাঁপার বীভৎস-মূর্তি চোখের সামনে ভেসে উঠল।

না: না—সে সম্ভব নয়!

অসহায় ভাবে তাকাল একবার কানু চারিদিকে।

না কি রাস্তাতেই বসে পড়বে? এইখানে বসে একটু চোখ বুজতে পারলেই ঘুমিয়ে পড়বে হয়ত। কিন্তু যদি পুলিশে ধরে? বিশেষ এখন যুদ্ধের দিন।

হঠাৎ ওর মনে হ'ল, এই বিশেষ গলির মোড়টা ওর পরিচিত, খুবই পরিচিত। ভগবানই হয়ত ওকে টেনে এনেছেন এখানে।

পুটির বাড়ী? মন্দ কি!

অস্বাভাবিক উত্তেজনায় ওর মন ব্যগ্র হয়ে উঠল। মনের সহজ অবস্থায় দেহের যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটাকে এতকাল ও চেপে রেখেছিল প্রাণপণে—হয়ত সেই অতৃপ্ত ক্ষুধাই রক্তের মধ্যে উদগ্র হয়ে উঠল, যেমন ক'রে দেহের দুর্বলতার সুযোগ পেয়ে রোগের বীজাণু দেহের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠে।

আশায়, আনন্দে, সমস্ত রকম সংযমের বাঁধ ভেঙ্গে ফেলবার অদ্ভুত একটা উত্তেজক নেশায় সে অধীর হয়ে উঠল। আজ রাত্রে সে আর মানুষ নয়—আজ সে পশুর স্তরে নেমে এসেছে—আজ সে যা খুশি তাই করবে। এই যথেচ্ছাচারিতার আশ্চর্য একটা আনন্দ আছে, তারই নেশা তার আকণ্ঠ পূর্ণ ক'রে তুলেছে। আঃ!

কানু আবার চলতে শুরু করল। অগ্র-পশ্চাৎ কিছুই ভেবে দেখে নি ও।

কতকাল পুঁটির বাড়ী আসে নি, তার কোন খবর নেয় নি—সে এখানে আছে কিনা তাও জানে না। কিন্তু সে যে ওখানে না-ও থাকতে পারে কিম্বা তার মানসিক কোন পরিবর্তন হতে পারে ইতিমধ্যে, সে সম্ভাবনা একবারও ওর মাথায় গেল না। যেমন পাগলের মত ছুট্‌ছিল এতক্ষণ, এখনও সেই রকমই ছুটে চল্‌ল পুঁটিদের বাড়ীর দিকে।

ওদের বাড়ী পৌছে বিজয়ের সেই সঙ্কেত-মত জোরে জোরে দুবার এবং আস্তে একবার কড়া নাড়ল। এভাবে আর কখনও কড়া নাড়ে নি, নাড়বার দরকারও হয় নি, কিন্তু তবু সঙ্কেতটা ওর মনে আছে, আশ্চর্য! মানুষ সম্পূর্ণ অপ্রকৃতিস্থ অবস্থার মধ্যেও কেমন এক এক সময় এক একটা ধূর্ততার পরিচয় দেয়—কতকালের কথা মনে করে!

কানুর নিজেরই যেন অবাক লাগে নিজের ব্যাপারে। মনে মনে হাসেও বোধ হয় সে একটু।

কিন্তু এইবার ওর নজর পড়ে বাড়ীটার দিকে।

সে ভাঙাবাড়ী আর নেই। টিনের চালাটা আছে বটে, তবে দেওয়াল মেরামত করা হয়েছে, নতুন রং হয়েছে তাতে, দরজা-জানলাতেও নতুন রঙের ছোপ। অবস্থা ভাল হওয়ার চিহ্ন নিঃসংশয়রূপে চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে।

হঠাৎ যেন একটা ধাক্কা খেয়ে কানু একটু সচেতন হয়ে ওঠে। এ বাড়ীতে তারা যদি না থাকে? হয়ত বাড়ী বেচে দিয়ে গেছে কাউকে! তা যদি হয় ত এতরাত্রে গৃহস্থবাড়ী ডাকাডাকি করার জন্য তারা কি মনে করবে?

ফিরবে নাকি?...কানু একবার ফিরেও দাঁড়াল। কিন্তু কিংকর্তব্য স্থির করার পূর্বেই হঠাৎ দোরটা খুলে গেল। এবার আর হাতে কেরোসিনের ডিপে নেই, মাথার ওপর ইলেকট্রিক আলো জ্বলছে—সে আলোতে কানুর চিনতে দেরি হ'ল না—পুঁটিই দাঁড়িয়ে আছে তার সামনে।

তবে সে পুঁটি নয়।

ওর সে নিটোল যৌবন বেশ ক্ষুন্ন হয়েছে, আগের লাবণ্যও আর নেই। অত্যাচারের ছাপ তার নিশ্চিত ফলাফল চিহ্নিত করে রেখে গেছে ওর দেহে। কিন্তু সে সমস্ত দৈন্য ঢাকবার চেষ্টা করা হয়েছে প্রসাধনে আর বেশভূষায়। সর্বাঙ্গে সোনার গহনা ওর; মুখে, ঠোঁটে, নখে অভিজাত প্রসাধনের ছোপ—দামী মাদ্রাজী শাড়ীর জরির আঁচলটা বিদ্যুতালোকে ঝলমল্ করছে। প্রাচুর্য ও মহার্ঘতায় পুঁটি যেন অগ্নিশিখার মতই জ্বলতে লাগল ওর চোখের সামনে।

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঞ্চিত ছিল পুঁটির। বোধ হয় সে ভেবেছিল বিজয়ই এসেছে। কিন্তু মুহূর্ত-কয়েক তেম্‌নি ভাবে তাকিয়ে থাকার পরই দৃষ্টি ওর সহজ হয়ে এল, বরং মনে হ'ল পুরু প্রসাধনের মধ্যে থেকে মুখখানা যেন ওর উজ্জ্বলই হয়ে উঠল।

'কে, দাদা? এতকাল পরে? এমন সময়ে? এস এস!'

কানুকে কে যেন জোরে একটা আঘাত করল—শক্ত কোন বস্তুর আঘাত।

তবু সে ফিরে যেতে পারল না। সে শক্তিও ছিল না। বসতে যে কোথাও ওকে একটু হবেই।

পুঁটি ওকে আগের দিনের মতই হাতটা ধরে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল। তবে সে পূর্বপরিচিত ঘরে নিয়ে গেল না। রকের ওপাশে আরও একখানা নতুন ঘর উঠেছে—সেইখানেই নিয়ে গেল। কানু একবার আচ্ছন্ন, বিহ্বল দৃষ্টিতে চাইল আগেকার ঘরের খোলা দ্বার-পথে—ভেতরে কে একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার লোক বসে আছেন, বোধহয় পাঞ্জাবী কোন ভদ্রলোক হবেন। তাঁরও ওপাশে আর একজন কে। তার পরনে মিলিটারী ইউনিফর্ম।

পুঁটি ওকে ছোট ঘরটার মধ্যে টেনে এনে বসিয়ে রেখে ছুটে বেরিয়ে গেল। কানু শুনতে পেলে দরজার বাইরে দাঁড়িয়েই পুঁটি ও-ঘরের বাবুদের বলছে, 'তোমরা ব'স একটু, আমার এক দাদা এসেছেন অনেকদিন পরে, তার সঙ্গে দুটো কথা বলে আসি।'

কে একজন যেন ভাঙা ভাঙা বাংলায় ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গেই প্রশ্ন করল, 'কী রকম দাদা গো? হঠাৎ কোথা থেকে এল?'

'আপনার দাদাই। ভয় নেই।' এই বলে আর কোন বাদানুবাদের অবকাশ না দিয়েই পুঁটি আবার এ ঘরে চলে এল। আসবার সময় ওদের ঘরের কপাটটা সজোরে বন্ধ ক'রে দিয়ে এল!

'তার পর? এ কী দশা তোমার? মাগো! কাউকে খুন ক'রে এলে নাকি? এতরাত অবধি কোথায় ঘুরছিলে?'

সে ওকে আগের দিনের মতই প্রণাম করল গলায় আঁচল দিয়ে। আজ কানু কোন বাধাও দিল না। তার চিন্তাশক্তি একেবারেই শিথিল হয়ে পড়েছে যেন। শুধু মরা ঘোড়াকে চাবুক মারার মতই পুঁটির কথাগুলো সেই এলিয়ে-পড়া চিন্তাশক্তিকে সচেতন করার চেষ্টা করতে লাগল।······

ছোট্ট ঘর। তাতে ছোট্ট একটি বিছানা, টুলের ওপর একটা টেবিল-ফ্যান্।

পাখাটা খুলে এদিকে ফিরিয়ে জোর ক'রে দিয়ে পুঁটি কাছে এসে নিজের দামী শাড়ির আঁচল দিয়েই ওর কপাল, গলা, মুখ মুছে নিলে।

'এ কী ছিরি হয়েছে দাদা! বাড়ী থেকে ঝগড়া ক'রে বেরিয়েছ বুঝি? এতকাল পরে বোনকে মনে পড়ল? কী হয়েছে, বৌকে মার-ধোর ক'রে বেরোও নি ত?'।

আশ্চর্য! পুঁটি কি দৈবজ্ঞ? অত দুঃখের মধ্যেও মনে মনে ওর দৃষ্টি-শক্তিকে তারিফ না ক'রে পারে না কানু।

পুঁটি ওর চিবুকটা ধরে নিজের দিকে ফিরিয়ে একটু আব্দারের সুরেই বললে, 'বলো না দাদা—কি হয়েছে?'

মাথা নিচু ক'রে কানু বললে, 'তুমি ঠিকই বলেছ। আমি, আমি বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করেই বেরিয়ে পড়েছি, তাকে মার-ধোরও করেছি!'

লজ্জায় যেন মাথা ওর মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিল।

পুঁটি একটুখানি চুপ ক'রে থেকে বললে, 'কিন্তু তুমি ত সে মানুষ নও দাদা, তোমাকে দিয়ে এমন কাজ করালে সে! পোড়াকপালী তোমাকে নিয়ে যদি সুখী হতে না পারে ত তার গলায় দড়ি দিয়ে মরাই উচিত!'

তারপর একটু থেমে বললে, 'কিন্তু আমি শুধু বাজে কথাই বকছি। তোমার নিশ্চয়ই তেষ্টা পেয়েছে। কী খাবে, শরবৎ না চা? খুব ঘুরে বেড়িয়েছ বোধ হয় রাস্তায় রাস্তায়, না? মুখ দেখে তাই মনে হচ্ছে—এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে! চা আনি? না সরবৎ?'

'চা—চা একটু হবে?'

একটু দ্বিধার সঙ্গেই প্রশ্ন করে কানু। বেশভূষা ও কথাবার্তায় এত বেশী সম্ভ্রান্ত হয়ে পড়েছে পুঁটি! কানু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ছিল আপনা থেকেই।

পুঁটি হেসে বললে, 'ওমা হবে না কেন! আমাদের ত এখন সন্ধ্যে রাত্তির! তা ছাড়া এখন একটি ঝি আছে, কায়স্থর মেয়ে—সে-ই রান্না-বান্না করে! তাকেই বল্‌ছি—'

পুঁটি ঘর থেকেই গলা বাড়িয়ে বললে, 'ননীর মা, অ ননীর মা—এক কাপ চা ক'রে এ-ঘরে দিয়ে যাও ত!'

এরপর খাবারও এল। পরিপাটি ক'রে ঠাঁই ক'রে পুঁটি আগের দিনের মতই নিজে খাবার এনে দিলে। শুধু হাত-পাখা নিয়ে আর বসবার দরকার হ'ল না, টেবিল-ফ্যান্‌টা নামিয়ে দিলে আসনের কাছে।

খাওয়া শেষ হ'লে পুঁটি হাত দিয়ে টেনে বিছানাটা ঠিক ক'রে বললে,

তাহ'লে তুমি এইখানেই একটু শুয়ে পড়ো, এত রাত্তিরে আর বাড়ী ফিরে দরকার নেই, কী বলো? মরুক্ সে ছুঁড়ি ভেবে ভেবে। যেমন-কে-তেমনি!'

তারপর একটুখানি থেমে, অপ্রতিভের মত ম্লান হেসে মাথা নিচু ক'রে বললে, 'আমি---মানে আমাকে এখন একটু ওদিকে যেতে হবে দাদা। ওরা এতক্ষণ বোধ হয় গালি-গালাজ করছে। স্বাধীন ত নই, ওরাই যখন খেতে দিচ্ছে! এত ঘুরেছ, পা-টা একটুখানি টিপে দিলে বোধ হয় আরাম হ'ত—কিন্তু ওরা ভাই ছাড়বে না! চেঁচামেচি করবে—'

কানু ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'না, না—তুমি যাও। আমি বেশ থাকব'খন।'

পুঁটি ছাড়া পেয়ে যেন খুশী হয়ে যাবার সময় বেশ লঘুকণ্ঠে বলে গেল, 'ওরা অবিশ্যি খানিক পরেই চলে যাবে। তা তখন ত তুমি ঘুমিয়ে পড়বে, কাল ভোরেই সব শুনব'খন।'

যাবার সময় দোর ভিজিয়ে দিয়ে সে চলে গেল।

কানুও শুয়ে পড়ল সঙ্গে-সঙ্গেই। কিন্তু ওর তখনই ঘুম এল না। এত ক্লান্তিতেও যেন উত্তেজনাটা যেতে চায় না, আশ্চর্য!

এই বিছানাটা বোধ হয় পুঁটির নিজস্ব। ওর 'বাবু'রা চলে গেলে রাত্রে বোধ হয় এইখানে এসে ঘুমোয়। বালিশে গন্ধ-তেলের একটা মৃদু সৌরভ, যেটা এইমাত্র ওর মাথা থেকেও পাচ্ছিল কানু। নিশ্চয় এটা ওরই বিছানা। বেচারী আজ আর শুতে পাবে না. হয়ত ও ঘরেই রাত কাটাবে।

কানু কি একটু নিরাশ হ'ল মনে মনে?

ওর অন্তরের ক্ষুধা কি লাঞ্ছিত, অপমানিত হ'ল?

না। কানু আর-একদিক দিয়ে এসে সুখীই হয়েছে। আজ পুঁটির যা অবস্থা তাতে এতখানি সম্মান, এতখানি যত্ন ওকে করবার কথা নয়—করতও না, যদি না কানুর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা থাকত ওর। আর সে শ্রদ্ধা কানু পেয়েছে নিজের সংযমের জন্যেই।...ভালই হয়েছে, মা-কালী বাঁচিয়ে দিয়েছেন ওকে, দাদা বলে ডাকার সম্মানটা সে রাখতে পেরেছে। ওর নিজের ভেতরের পশুটা ধরা পড়বার অবকাশ পায় নি।

চাঁপা?

থাক্ থাক্। সে চিন্তা এখন থাক্। জোর ক'রে কানু তার মনকে অন্যদিকে ফেরাবার চেষ্টা করে। পুঁটির কথা ভাববে সে। কী সুন্দর

মানিয়েছে তাকে মাদ্রাজী শাড়িটা। আর কী বুদ্ধি ওর। কেমন সহজে শুধু মুখ দেখেই আসল কথাটা ধরে নিলে। কত যত্ন করলে ওকে, সত্যি! নিজের বোন থাকলেও এটা সম্ভব হ'ত না।···নিজের বোন? থাকলে ওদের ঘরেরই মত হ'ত—হয়ত ঐ চাঁপার মত।

আবার চাঁপা!

তার কথা আজ আর ভাববে না সে, কিছুতেই না। ললিতা-বৌদি? না, তাঁর কথাও থাক্ আজ।

পুঁটির কথাই ভাববে সে। কতদিনকার কথা, সে যেন কত যুগ মনে হচ্ছে আজ, যখন সে বিজয়ের সঙ্গে প্রথম এ-বাড়িতে আসতে শুরু করে। তখন কী বোকাই ছিল সে!···তবু তখনই বোধ হয় ভাল ছিল; সুখী না হোক্ —নিশ্চিন্ত ছিল। আর বোকামি? কে জানে, সে-ই বোকামিরই ফলে আজ হয়ত এই সম্মান, এই স্নেহ, এই আন্তরিকতা সে পেলে!

মা কালী তাকে রক্ষা করেছেন! বাঁচিয়েছেন তাকে। পুঁটির চোখে ওকে আর-পাঁচটা মানুষের পর্যায়ে নামিয়ে আনেন নি।···

পুঁটিকে একটা ভাল শাড়ি কিনে দেবে সে এবারের ভাই-ফোঁটায়—পুজোর বোনাস থেকে। আগুন-রঙের একটা দামি শাড়ি। 'দাদার উপহার—'না' বলতে পারবে না।··

অস্পষ্টভাবে, যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্নতার মধ্যেই মনে হ'ল কে ঘরে এল। মনে হ'ল কে যেন ওর পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে···

না,—না ও ত জেগেই আছে!

কে, চাঁপা?

না—চাঁপা নয়। কে জানে কে! সব আচ্ছন্ন হয়ে যায় একটা সুগভীর শান্তিতে।

ঘুমের মধ্যেই অপরিচিত পরিবেশ যেন ওর চৈতন্যকে কোথায় আঘাত করে, ভোরবেলাই ঘুম ভেঙে যায়।

ধড়মড় ক'রে উঠে বসে দেখে কখন পুঁটি এসে ঐ ঘরেই মেঝেতে শুয়েছে।

একটা বালিশও নেই মাথাতে। অঘোরে ঘুমোচ্ছে বেচারী।

তবু ওঘরে সে শোয় নি। কিন্তু বালিশও ত একটা আনতে পারত।

কুণ্ঠা ও সঙ্কোচের অন্ত থাকে না কানুর। তার জন্যই বেচারী নিজের

বিছানা, নিজের বালিশ দিয়ে, অনাথার মত মেঝেতে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। নিজেকে যেন অত্যন্ত অপরাধী মনে হয়।

কতটা স্নেহ করে পুঁটি ওকে। আর কতখানি বিশ্বাস। অনায়াসে ওর ঘরে শুয়ে ঘুমিয়েছে সে নিশ্চিন্ত হয়ে!

ভাগ্যে কানু জান্‌তে পারে নি রাত্রে। হয়ত, হয়ত নিজেকে রক্ষা করতে পারত না শেষ পর্যন্ত। বাবা পঞ্চানন্দ, মা কালী তাকে রক্ষা করেছেন। হে ঈশ্বর!

ঘুমন্ত পুঁটির দিকে চেয়ে চেয়ে কে জানে কেন ওর দু-চোখে জল ভরে এল—কাল অত দুঃখেও যা আসে নি। সে জল দুই চোখের কোল উপ্‌ছে নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল।

১৩

বাড়ী অবশ্যই ফিরতেই হয় কানুকে এক সময়ে। খানিকটা আরও বকাবকি, পাড়ার লোকের গায়ে-পড়া মধ্যস্থতা। চাঁপার ব্যর্থ খানিকটা মান-অভিমান। তারপর আবার শুরু হয় স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা।

কিন্তু কানু একটা বিষয়ে মন স্থির ক'রে ফেলে। ললিতা-বৌদিদের কাজ ওকে ছেড়ে দিতে হবে, ও বাড়ী যাওয়া আর চলবে না।

একদিনে, সহসা এ সঙ্কল্প ওর মনে আসে নি। একটু একটু ক'রে গ'ড়ে উঠেছে। কথাটা মনে করতেও বেদনায় মন টন্ টন্ ক'রে ওঠে কোথায়—দারুণ একটা যন্ত্রণা হয় ওর। তবু সে মন ঠিকই করে। সে বোঝে যে চাঁপা চুপ ক'রে গেছে কিন্তু তাতে তার বিশ্বাসের বা অনুমানের কোন পরিবর্তন হয় নি। বরং হয়ত উল্‌টোটাই হয়েছে, চাঁপার নিজের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। ফলে আবারও সেই সংশয়, সেই কলুষিত অভিযোগ বেরিয়ে আসবে কোনদিন। আবারও হয়ত কানু নিজেকে সাম্‌লাতে পারবে না।...এতে যে ওদেরই জীবনে অশান্তি শুধু তাই নয়—কথাটা ক্রমে ক্রমে পাঁচ কান হয়ে একদিন ললিতা-বৌদির কানে উঠতে পারে। ছি ছি, তা যদি হয় ত লজ্জায় ঘৃণায় কানুকে সেদিন আত্মহত্যা করতে হবে!

তা ছাড়া লাভই বা কি!

এই জীবন যখন কাটাতে হবে, এই স্ত্রী নিয়ে—তখন শান্তি যাতে বজায় থাকে তাই করাই ত ভাল। হয়ত একদিন সে চাঁপার দোষত্রুটি, চাঁপার যা-কিছু দৈন্য ভুলে যেতেও পারে তাতে। সামনাসামনি প্রতিদিন দেখতে দেখতে তফাৎটা বড় চোখে ঠেকে। দূরে গেলে সেটা ঝাপ্‌সা হয়ে যায়।

না। ও মায়া কাটানোই মঙ্গল।

কিন্তু কি-ভাবে এ সম্পর্ক কাটাবে তা ভেবে পায় না, ভাববার চেষ্টাও করে না বোধহয় ভাল ক'রে। মনের অবচেতনে চিন্তাটাকে ক্রমাগত এড়িয়ে যেতে চায়। মন স্থির যখন করেইছে—তখন আর তাড়া কি?

তা ছাড়া, কথাটা কি ক'রে প্রথম পাড়বে ও ললিতা-বৌদির কাছে, সেই ভেবেই যেন দিশাহারা হয়ে পড়ে। এতকালের সম্পর্ক। টাকাটা কিছুই নয় অবশ্য—এখন সে সাত টাকা মাত্র পায়, অন্য যে কোন জল-দেওয়ার ভারী এই কাজে তেরো চোদ্দ টাকা আদায় ক'রে নিত—কিন্তু এমন ভাবে সে ঐ পরিবারের সঙ্গে মিশে গেছে যে টাকা-পয়সার প্রশ্নই ওঠে না আর। সে যে সেখানে চাকরি করে তা সে-ত ভুলেছেই, ওঁরাও কতকটা ভুলেছেন বোধহয়। প্রতিমাসে টাকা দেওয়ার সময় অত্যন্ত সসঙ্কোচে টাকাটা দেন ওঁরা। ললিতা-বৌদিও খুব সম্ভব জানেন মনে মনে যে, ওর এই নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধাকে টাকার হিসাব দিয়ে মাপা যায় না। মাস-কাবারে যেদিন মাইনে দেবার দিন, সেদিন হয় চা নয়ত কোন খাবার দেবেনই তিনি, আর সেইটে দেবার সময় টাকাটা চায়ের পেয়ালার কিংবা খাবারের রেকাবির পাশে বিনাবাক্যে রেখে চলে যাবেন। নিঃশব্দে এই অভিনয়টুকু চলে প্রত্যেক মাসেই। কানুর নিজেরও যেন ঐ টাকা ক'টা নিতে অত্যন্ত সংকোচ বোধ হয়, কোনমতে সকলের দৃষ্টি এড়িয়ে টাকাটা তুলে ট্যাকে রেখে দেয়! ললিতা-বৌদি কি মনে করেন তা সে জানে না, তবে সে নিজে জানে যে এঁদের কাছে ওরই ঋণ বেশী। সম্ভব হ'লে, এরা অপমানিত বোধ করার সম্ভাবনা না থাকলে, সে-ই এদের বরং কিছু দিত! অন্তত এই টাকা ক'টা নিত না এটা ঠিকই। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়।

এঁরা যেন কানুর আত্মার সঙ্গে জড়িয়ে গেছেন। এঁদের ছেড়ে দেবে, এঁদের কাছে আর আসবে না—এ যেন কিছুতেই শেষ পর্যন্ত সে ধারণা করতে পারে না। খোকা ওকে 'কানু মামা' বলে ডাকে, আদর আব্দার করে সত্যিকারের আত্মীয়ের মতই। তার জন্য বাঁশি খেলনা বিস্কুটে কানুর বহু পয়সাই চলে যায়—ললিতা-বৌদি বিষম রাগ করেন সে অমিতব্যয়িতায়, কিন্তু এখন কানু আর তাঁর রাগকেও ভয় করে না। সে জানে তার এতদিনের সেবার ফলে এটুকু অধিকার সে নিশ্চয় পেয়েছে। সাত টাকার অনেকখানিই এইভাবে চলে যায়, সে হিসাব ললিতা-বৌদির অন্তত অজানা নেই।

সুতরাং তিনিও অন্যভাবে যতটা পারেন পুষিয়ে দেন। বছরে বছরে পূজোয় একখানা ক'রে কাপড় দিতেন, গত দুবছর কাপড় জামা গেঞ্জি সব

দিচ্ছেন। আমের সময় আম, লেবুর সময় লেবু—খাবার, সন্দেশ এসব ত আছেই।' বৌদির বাপের বাড়ী থেকে তত্ত্ব এলে কিংবা বাবু বিদেশ থেকে কোন-কিছু নিয়ে এলে কানুর ভাগটি ঠিক তুলে রাখেন বৌদি। চা-ত আজকাল মাসের মধ্যে কুড়ি দিনই বাঁধা হয়ে গেছে। নেহাৎ মধ্যে মধ্যে কানু খুব আপত্তি করে, মিছে ক'রে বলে 'অনেক চা খেয়েছি', তবে বৌদি নিবৃত্ত হন।

এই স্নেহ ও অন্তরঙ্গতা—এর বন্ধন ছিন্ন করা শক্ত বৈকি!

তবুও—শুধু মন স্থির করে বসে থাকলে চলে না, দিনও স্থির করতে হয়। যত দুঃখই হোক, যত অসম্ভব বলে ঠেকুক, করতেই যখন হবে তখন আর অহরহ এই মানসিক দ্বন্দ্ব বা সংশয়ের মধ্যে থেকে দরকার কি! এই রকম একটা কিছু ভেবে মনকে শক্ত করে কানু। ও শেষ হওয়াই ভাল। নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে অন্তত আর কিছু না হোক।

বিশেষত, কানু বেশ বুঝতে পারে যে এধারের আবহাওয়া ভাল নয়। কানাঘুষো চলছেই তাকে নিয়ে তাদের বস্তিতে। এ বস্তির অনেকেই বিভিন্ন পাড়ায় ভদ্রলোকের বাড়ী চাকরি করে, মুখে মুখে কথাটা বহু দূর ছড়িয়ে যাবে। বাড়ীতে যদি একটি ঝি কিংবা চাকর থাকে ত সে বাড়ীর যাবতীয় সংবাদ যেমন চারিদিকে ছড়িয়ে যেতে বাধ্য—গোপনীয় বলে কিছুই থাকা সম্ভব নয়, তেমনি বাইরের সব খবরও সেখানে নিমেষে পৌঁছয়। স্থানীয় সংবাদপত্রের কাজ করে এরা।

আভাসে ইঙ্গিতে হাসি ঠাট্টায় সেই সম্ভাবনারই পূর্বাভাস পায় কানু।

একদিন শুনলে গঙ্গারাম বলছে নেত্যকে, 'যাই বলিস্ বাপু, কানু আমাদের বাহাদুর ছেলে বটে! গেঁথে তুলেছে ত? ডাইনে-বাঁয়ে চিনির নৈবিদ্যি ঠিক চালাচ্ছে।'

নেতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দেয়, 'তা যা বলেছিস্। সবই বরাত। আমাদের দিকে কেউ ফিরেও চায় না রে!'

অর্থাৎ সেদিন ওদের বিবাদের পরই কথাটা রীতিমত ছড়িয়ে গেছে। চাঁপা কিছুই বলতে বাকি রাখে নি। তার অন্তরের সমস্ত সংশয় বা সন্দেহকে নিশ্চিত সত্যের রঙ্ দিয়ে প্রচার করেছে। এরাও তা বিশ্বাস করেছে সহজেই, কারণ এটা শতকরা নব্বইটি ক্ষেত্রে সত্য—এটা বিশ্বাস করাই তাদের অভ্যাস।

অক্ষয় টিটকিরি দিয়ে মন্তব্য করে। বনমালী মুখ টিপে হাসে ওকে দেখলেই।

শুধু চাঁপা আর ওদের নাম করে না। যদিও কানুর মনে হয় এর চেয়ে নাম করা ভাল ছিল, সোজাসুজি খানিকটা ঝগড়া করলে ভাল হ'ত।

সন্ধ্যায় হয়ত ললিতা-বৌদির বাড়ী বেরুচ্ছে, দরজার কপাটটা ধরে চাঁপা খুব নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলে, 'আজ একটু সকাল সকাল ফিরতে পারবে? —মানে এই নটা-সাড়ে-নটার মধ্যে এলেই চলবে।'

কোনদিনই কানুর অত-রাত হয় না ফিরতে, এ অনুরোধটা যে শুধু একটা প্রচ্ছন্ন অভিযোগ মাত্র, তা সে বুঝতে পারে। তবু প্রাণপণে উদ্যত ক্রোধ দমন ক'রে শান্তকণ্ঠে প্রশ্ন করে, 'কেন?'

'না। এম্‌নি—' আঁচলের খুঁটটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে উত্তর দেয় চাঁপা, 'শরীরটা ভাল লাগছে না!'

'তাহ'লে না হয় থেকেই যাই এখন খানিকটা।'

'না না, সে আবার হয়ত নানা রকম অসুবিধা হবে, তুমি যাও! এখন থাকবার দরকার নেই—একটু আগে এলেই চলবে।'

কানু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে বলে, 'কিন্তু তুমি সকাল ক'রে আসবার যে টাইম দিচ্ছ, অত-রাত ত আমার কোনদিনই হয় না।'

'ও, তাই নাকি? কে জানে, আমার অত হিসেব থাকে না। আমার মনে হয় দশটা এগারোটা বেজে যায় তোমার ফিরতে—'

নিরীহ ভাবেই বলে চাঁপা। কিন্তু কানুর সর্বাঙ্গে বিষ ছড়ায় এই ন্যাকামি। তবু সে আর কথা বাড়ায় না। আর ঝগড়া করার ইচ্ছে নেই ওর।

এই কথাবার্তারই দিন চারেক পরে—একটা রবিবারে ও দুপুরবেলা বাড়ী আছে, ওপর-টাইমে বেরোয় নি—কানে গেল চাঁপা কাকে যেন বলছে, 'হ্যাঁ ভাই, তা যা বলেছ, বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়েছে আজ। সোয়ামীকে তবু জেগে থেকে চোখে দেখতে পাচ্ছি। কি ভাগ্যি আজ আর বেরোয় নি। তা নইলে দিনে ত দশঘণ্টা কারখানা—সন্ধ্যেবেলা এসেই ছোটা পড়ি-কি-মরি করে, সে ফিরতে সেই রাত দশটা এগারোটা, আবার ভোর না হ'তে হ'তে দৌড়নো, এসে কোনমতে হাতে-ভাতে করারই সময় থাকে না। দু-দণ্ড চেহারাটার দিকে তাকিয়ে দেখব সে সময়ও মেলে না।'

বড় যেন অসহায় ঠেকে কানুর নিজেকে—বড় বেশি যেন অবলম্বনহীন বলে মনে হয়!

জগৎ-সংসারের এ এক বিচিত্র চক্রান্ত, কিছুতেই শান্তিতে ওকে থাকতে দেবে না! মানুষ সব পারে, শুধু অব্যক্ত এই বিরোধ বা বিবাদের সঙ্গে

এঁটে উঠতে পারে না।' পারে না, এই নিঃশব্দ প্রতিরোধকে ঠেকাতে। দু-দিন চার দিন পরেই ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে। কানুও ক্লান্ত। হারই মেনেছে ও চাঁপার কাছে। চাঁপার জেদই বজায় থাক্।

সেইদিনই সন্ধ্যাবেলা ও জল দেবার পর রান্নাঘরের দোরের বাইরে দাঁড়িয়ে মাথা-টাথা চুলকে একরকম মরীয়া হয়েই বলে ফেলল, 'বৌদি, একটা কথা ছিল—'

ওর দিকে না ফিরেই ললিতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধি মিষ্ট কণ্ঠে বললেন, 'কী কথা ভাই ?' ললিতা বোধ হয় ভেবেছিলেন যে কানু এতদিন পরে কিছু মাইনে বাড়াতে চায়। তাই ঠোঁটের কোণে বহু-প্রত্যাশিত প্রশ্নেরই অপেক্ষায় একটু সচেতন হাসিরও আভাস ছিল।

কানু আরও একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'আপনাদের সুবিধামত একটা লোক-টোক দেখে নেবেন, আমার বোধহয় বেশীদিন আর এ কাজ করা চলবে না।'

ললিতা-বৌদি তখন ডাল ঢাল্‌ছিলেন, চম্‌কে হতে কেঁপে খানিকটা পড়ে গেল মাটির ওপর। কড়াটা নামিয়ে উঠে এসে ওর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে একটু যেন বিবর্ণ-মুখেই প্রশ্ন করলেন, 'কেন ভাই কানু, আমরা কি কিছু অন্যায় করেছি ?'

কানুর মনে হ'ল মাটির সঙ্গে মিশে যেতে পারলেই ভাল ছিল। লজ্জায় বেদনায় সে ললিতা-বৌদির দিকে চোখ তুলে চাইতে পারে না যেন কিছুতেই। তাঁর কণ্ঠের সেই ব্যাকুলতা, সেই সামান্য একটু আহত অভিমানের সুর, ওর বুকের অনেকখানিই যেন চিরে চিরে দিয়ে গেল।

কানুও একটা অভিমান বোধ করছিল! প্রচণ্ড অভিমান, এই সারা সংসারটার ওপর। তার স্ত্রী, তার আত্মীয়, তার চারিদিকের পরিবেশের ওপর—প্রচণ্ড, তীব্র অভিমান! সে অভিমানে এবং বুক-পিষে-যাওয়া একপ্রকার বেদনায় ওরও চোখে জল এসে গিয়েছিল, প্রাণপণে মাথা হেঁট ক'রে সেই জলই সাম্‌লাবার চেষ্টা করতে লাগল, ললিতা-বৌদির কথার উত্তর দিতে পারলে না।

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে—বৌদি কখনও যা করেন নি আজ তাই করলেন—ডান হাত দিয়ে ওর চিবুকটা তুলে ধরে বললেন, 'ও কি কানু, চোখে জল এসে গেছে একেবারে ? আমরা কী করলুম তা ত বুঝতে পারছি না, কোন কষ্ট যদি দিয়ে থাকি ত সে নিশ্চয় না বুঝে—'

'ছি ছি, ও কি বলছেন বৌদি, ওতে আমার যে অপরাধ হয়।' এই বলে সেও, ওর বহুদিনের সাধ—যা এতকাল মেটাতে সাহস করে নি—আজ মিটিয়ে নিলে, হেঁট হয়ে ওঁর দুই পায়ের তলায় হাত বুলিয়ে ধুলো নিয়ে মাথায় দিলে। তারপর গাঢ় ধরা গলায় বললে, 'নানা ব্যাপারে আমার আর এখানে আসা চলবে না। সত্যিই, অফিসে বড় চাপ দিচ্ছে, অনেক-রাত পর্যন্ত থাকতে হবে সেখানে—'

'তা যদি হয় ত আর কি বলব, তোমার আর্থিক লোকসান আর কতকাল করাবো বলো,—কিন্তু সেইটেই ঠিক ত? আমাদের তরফ থেকে কোন অন্যায় হয় নি?'

ললিতার কণ্ঠস্বরে সত্যকারের উদ্বেগ, আর বোধহয় অকপট স্নেহও। সে গলার আওয়াজে নতুন ক'রে কানুর চোখ জলে ঝাপ্‌সা হয়ে এল। সে একটা কথাও বলতে পারলে না, ললিতার আশঙ্কা যে একেবারে অমূলক সে আশ্বাসও তাঁকে দেওয়া সম্ভব হ'ল না, না কুলোল শক্তিতে, না খুঁজে পেলে ভাষা, একটু-খানি যেন কি বলবার চেষ্টা ক'রে দ্রুতপদে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

শুধু বাইরে পা দিয়ে দোরটা ভেজিয়ে দেবার সময় একবার চকিতে তাকিয়ে দেখলে ললিতা-বৌদি তখনও স্তব্ধ হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছেন।

সেদিনও বহুরাত্রি পর্যন্ত পথে পথে ঘুরে বেড়াল কানু। এতরাত ক'রে বাড়ী ফেরার যে বিষম কদর্থ হবে তাও ভেবে দেখলে না সে। সে আজ নিশ্চিন্ত। সে বেঁচেছে। কেমন ক'রে বলবে, কি ভাবে বলবে কথাটা—অহোরাত্র এই দুশ্চিন্তা থেকে সে আজ মুক্ত। সে আজ নিরাপদ।

অদ্ভুত একটা মুক্তির আনন্দে ও দুঃখে বিহ্বল কানু লক্ষ্যহীন ভাবে পথে পথেই ঘুরতে লাগল। যে মুক্তি সে চায় নি সেই মুক্তিই পেয়েছে। মুক্তির একটা স্বাদ আছে বৈকি, দুশ্চিন্তার হাত থেকে অব্যাহতি পাবার একটা আনন্দও আছে, কিন্তু এর বেদনাও কম নয়। সংশয় যতদিন ছিল ততদিন কোথায় একটা সুদূর অসম্ভাব্য সম্ভাবনাও ছিল—হয়ত শেষ পর্যন্ত কোথাও কিছু একটা দৈব-ঘটনা ঘটবে যাতে আর ওর এসব কথা পাড়বারই প্রয়োজন হবে না। আশার অতীত কোন আশা সে মনে মনে পোষণ করছিল। কিন্তু আজ আর কোথাও কিছু রইল না। পাশা পড়ে গেছে হাত থেকে—চিরকালের মত। আর ফেরা সম্ভব নয়, অসম্ভব সম্ভব হ'ল না কিছুতেই, কোন দুরাশাই সার্থক হ'ল না। আজ ও নিঃস্ব, আজ ও রিক্ত।

জীবনে একমাত্র যে শান্তি ওর ছিল, ছিল ওর আত্মার মুক্তির অবকাশ, তা ও নিজেই ঘুচিয়ে দিয়ে এল। নদা'র কাছে কালিদাসের গল্প শুনেছিল, সেই কালিদাসের মত, যে ডালে বসে ছিল সেই ডালেরই গোড়াতে মারলে কোপ।

সমস্ত বুকের ভেতরটা যেন টন্ টন্ করতে থাকে। মাথার শিরগুলো একসঙ্গে দপ্ দপ্ করে। চারিদিকে তাকিয়ে যেন পথ চিনতে পারে না—কী ভাবছে ও, তাও যেন ঠিক ধারণা করতে পারে না এক এক সময়।

ললিতা-বৌদিকে কী অপরূপ দেখাচ্ছিল আজ। ঠিক যেন দেবীমূর্তি। ওঁর পা স্পর্শ করার অদম্য লোভ ওর, তা চরিতার্থ হয়েছে, ওঁর নরম ফুলের মত দুটি আলতা-পরা পা কানু আজ স্পর্শ করেছে, অনেকখানি পর্যন্ত হাত বুলোতে পেরেছে।

ওঁর কণ্ঠস্বরে যে উদ্বেগ, সে কি শুধু—সে কি শুধু কানু চলে এলে ওঁদের কি অসুবিধা হবে এই দুশ্চিন্তাতেই? ওর মধ্যে কি স্বার্থলেশহীন কোন স্নেহ নেই?

মন বিশ্বাস করতে চায়—আছে।

আছে বৈকি! হাত কেঁপে ডালটা যে মাটিতে পড়েছিল কানু তা দেখেছে। কণ্ঠের উদ্বেগে দুঃখও ছিল। তার চেয়ে বেশী ছিল শঙ্কা অবশ্য, তবে সে ত শুধু তাঁদের আচরণে দুঃখ পেয়ে কিংবা অভিমান ক'রে কানু তাঁদের ত্যাগ করছে কিনা এই আশঙ্কা।

আচ্ছা,—কানু স্টেশনের ওভার-ব্রিজের সিঁড়িতে বসে বসে নিজের মনেই প্রশ্ন করে,—আচ্ছা, এই স্নেহ ও আশঙ্কা কি এতকালের বিশ্বস্ত চাকরের প্রতি যতটুকু স্নেহ থাকে বা থাকা উচিত—কেবল ততটুকুই? তার বেশী কি কিছুই নেই? ব্যক্তিগত কোন আকর্ষণ? ভৃত্যটাকে বাদ দিয়ে শুধু মানুষটার প্রতি?

প্রশ্নটা যে কী, কি যে জানতে চায় কানু, তা নিজেই ঠিক ভাল ক'রে বুঝতে পারে না। নিজের মত ক'রে সে বোঝবার চেষ্টা করে আবার। আচ্ছা ধরো, কানু যদি ঠিক অতটা বিশ্বাসী, অতটা ভাল চাকর না হ'ত তাহলেও কি ওঁরা ওকে কিছু স্নেহ করতেন? প্রশ্নটার অসারতা নিজেই বোঝে সঙ্গে সঙ্গে। আবার বোঝায়—আচ্ছা বেশ, এরপর যে লোক পেলেন সে যদি আরও ভাল হয়, আরও বিশ্বাসী হয়, যদি ঐ মাইনেতেই পাওয়া যায়—তাহ'লে কি বৌদিরা ওকে একেবারেই ভুলে যাবেন? তখন কি আর কোন স্নেহ, কোন মমতা থাকবে না ওর ওপর?

কিন্তু এও যে ঠিক প্রশ্ন নয় কানু তা বোঝে। শুধু যে-কথাটা জানতে

চায় ও, সেটাকে নিজের সচেতন মনে স্বীকার করতে পারে না কিছুতেই। অনেকক্ষণ ধরে অব্যক্ত প্রশ্নটা আকুলি-বিকুলি করতে থাকে মনের মধ্যে।

ললিতা-বৌদির কণ্ঠস্বর, তাঁর সেই উদ্বিগ্ন ও বেদনার্ত চোখের চাহনি যেন ওর কোন্ সুদূর-পরাহত আশাকে অভয় দিয়েছে। কল্পনারও পরপার থেকে এক আশ্বাস বহন ক'রে এনেছে। তারই পরমাশ্চর্য পুলকাস্বাদকে ও সভয়ে সসঙ্কোচে অনুভব করার চেষ্টা করে।

১৫

কথাটা চাঁপাকে বলা হয় না। অথচ ওদের স্পষ্ট বা অস্পষ্ট বক্র কটাক্ষকেও ও আর গ্রাহ্য করে না। মনে মনে একটা হিংস্র আনন্দ যেন অনুভব করে কানু ওদের সম্বন্ধে। এত সব জল্পনা-কল্পনা বিদ্রূপ-ইঙ্গিত যেদিন ভিত্তিহীন প্রাসাদের মত ভেঙে পড়বে সেই দিনটির কথা চিন্তা ক'রে অপূর্ব একটা খুশিতে মন ভরে ওঠে ওর। কেমন জব্দ হবে ওরা, যেদিন শুন্‌বে স্বেচ্ছায় কানু বৌদিদের বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে। ওদের আরও জব্দ করার একটা ফন্দী ও মনে মনে ভেবে রেখেছে। ললিতা-বৌদিদের কাজ ছাড়বে বটে, তাই বলে আরও চার ঘণ্টা ওভার-টাইম করবে না ও কিছুতেই। অন্তত এখন কিছুদিন ত নয়ই। কোন কোন দিন বাড়ীতে বসে থাকবে ও, সত্যি-সত্যিই এ কাজ ছেড়ে দিয়েছে দেখাবার জন্যে, আর কোন কোন দিন ও যাবে সটান পুঁটিদের বাড়ী। রাত দশটা এগারোটা অবধি কাটিয়ে আসবে। ইতিমধ্যে কিছু কিছু ত পড়তে শিখেছে, নিজে নিজেই একটা মহাভারত কি রামায়ণ খুলে না হয় বসে থাকবে ও পুঁটির নিজের ঘরে। মানে, পুঁটি যদি ব্যস্ত থাকে। পুঁটি ওকে আশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হবে না এটা ঠিক। আর তার নামে সহস্র দুর্নাম দিলেও তার কোন ক্ষতি-বৃদ্ধিই নেই, সে বরং হাসবে তাতে। কানুও জানবে যে সে নিজে যখন খাঁটি আছে তখন ভয় কি। বেশ হবে—সমান হিংসেয় জলবে চাঁপা কিন্তু কোন প্রতিবিধান করতে পারবে না। এ বাড়ীর বেলা যে ভয়ে কানু হার মানল, সে ভয় ওখানে ত আর নেই! কি করবে ও?

কথাটা কল্পনা করতেই প্রতিহিংসার আনন্দে ওর মন ভরে যায় যেন। বেশ হবে, জ্বলে জ্বলে মরবে।

অবশ্য তাই ব'লে, এই সম্ভাবনার মূলে যে ঘটনাটা আছে সেটাকেও অস্বীকার করতে পারে না। তার বেদনা যেন এক একদিন ওর মনটাকে

দলে পিষে মাড়িয়ে দিয়ে যায়। ছাড়তেই হবে, আর কোথাও কোন আশা নেই। কোন মতেই সে সর্বনাশা সম্ভাবনাকে চিরকালের মত ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। কানু জানে ললিতা-বৌদিরা লোক দেখছেন। এর ভেতর দু-একজন লোক দেখাও ক'রে গেছে. শুধু তারা অতিরিক্ত বেশী টাকা চেয়েছিল বলেই তাদের বাহাল করা হয় নি। তবু, একদিন না একদিন হবেই। লোক রাখতেই যে হবে তাঁদের তা তাঁরা যখন জানেন, তখন এটাও ক্রমশ বুঝবেন যে কানুর পরিশ্রমের দরটা ঠিক বাজারদর নয়। বাজারদর তার ডবলেরও বেশি। আর সেটা বুঝলেই যাকে হোক তাঁরা রাখবেন। সেই সংবাদটির পরই কানুকে ও বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে একদিন—চিরকালের মত। তারপর এক-আধদিন কোন ছুতোয় বেড়াতে যাওয়া গেলেও, রোজ যাওয়া চলবে না কোনমতেই। বেশীক্ষণ থাকাও চলবে না। আর সে যাওয়ারও কোন মানে থাকবে না। প্রথম প্রথম অভ্যর্থনাটা থাকবে আন্তরিক, ক্রমশই শুষ্ক সৌজন্যতার পর্যায়ে এসে পৌঁছবে। তারপর আর কোন পক্ষেই কোন প্রশ্ন বা উত্তরের কিছু থাকবে না। পুরোনো চাকরের অকারণ গায়ে-পড়া ঘনিষ্ঠতা যে বেশী ভাল লাগে না—তা সে জানে। ছবিটা কানু পরিষ্কার যেন চোখের উপর দেখতে পায়—ওদের সম্পর্কটা কি রকম দাঁড়াবে।

ললিতা-বৌদি ওকে ঠিক স্পষ্ট ক'রে না প্রশ্ন করলেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানতে চেয়েছেন বহুবার, ওর ছেড়ে যাওয়ার আসল কারণটা কি? বিশেষত ঐ উদ্বেগটা যেন তাঁর যেতে চায় না কিছুতেই। তাঁদের ব্যবহারে কোথাও কোন রূঢ়তা বা অভদ্রতা প্রকাশ পেয়েছে কিনা, কানু মনে কোন ব্যথা পেয়েছে কিনা! কর্তা স্বয়ং একদিন ডেকে ত সরাসরি জিজ্ঞাসাই করলেন। কোন উপায়ে ওকে ধরে রাখতে পারা যায় কিনা সে চেষ্টাও কম করেন নি। মাইনে তিনি ওর যথেষ্ট বাড়িয়ে দিতে পারেন—আকারে-ইঙ্গিতে সে কথাও জানিয়েছেন।

কানুর যে সেই হয়েছে সবচেয়ে মুশকিল, একথা সে কাকে বলবে? আসল কারণটা যে কাউকে কোনমতেই বলবার নয়! ও শুধু বারবার অসহায়ভাবে হাত জোড় করেছে বৌদির কাছে, 'বৌদি আপনি বিশ্বাস করুন। আপনাদের কথা জীবনে ভোলবার নয়, সারা জীবনটা যদি কাটাতে পারতুম আপনাদের পায়ের কাছে ত আর আমি কিছু চাইতুম না। কিন্তু সে উপায় নেই—কিছুতেই আর পেরে উঠছি না।'

বৌদি ইদানীং আর কিছু বলেন না। কী বুঝেছেন কে জানে। কানুও ও প্রসঙ্গ তুলতে ভরসা পায় না।

তবে তিনি আজকাল আরও বেশী ক'রে যত্ন করেন। খাবার এবং চা এ প্রত্যহই খেতে হয় কানুকে। কোন ওজর-আপত্তিই খাটে না। ললিতা-বৌদি আজকাল ধমক দেন, জোর করেন। যে অন্তরঙ্গতার স্বপ্ন দেখতেও কানু কোনদিন সাহস করে নি—আজ তা-ই ওর জীবনে সত্য হয়ে উঠেছে। আর সেইটেই সবচেয়ে মর্মান্তিক—এখনই ছেড়ে যেতে হবে! যখন সম্পর্কটা সবচেয়ে মধুর হয়ে উঠল, তখনই ঘনিয়ে এল বিদায়ের ক্ষণ।

ললিতা-বৌদির এ চেহারাটা ওর কাছে বিস্ময়েরও বটে।

এটা কি ওকে ধ'রে রাখবারই শেষ একটা চেষ্টা? এই যত্ন করাটা?

মনকে মোহমুক্ত করার চেষ্টা করে কানু, নিজেকে প্রশ্ন করে মধ্যে মধ্যে। কিন্তু তা কেমন ক'রে হবে? ওঁরা যে খুব লোক-খোঁজাখুঁজি করছেন তার প্রমাণ পাচ্ছে ও প্রত্যহই। ক্রমে ক্রমে কথাটা ছড়িয়ে পড়েছে ওদের বস্তিতেও—যাদের কাছে কানু সবচেয়ে বেশি লুকোতে চেয়েছিল। তাই বোধহয় চাঁপা আজকাল ওর মুখের দিকে কেমন একটা বিচিত্র দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। তার সে চাহনিতে কৌতূহল ও বিজয়গর্ব দুই-ই যেন একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চায়। ওদের ওপর একহাত নেওয়া আর ওর হয়ে উঠল না। সে যাক্ গে—পুঁটির ব্যাপারটা হাতের পাঁচ ত আছেই! কিন্তু ললিতা-বৌদির এ আন্তরিকতার ভেতরে কোন স্বার্থেরই ইঙ্গিত খুঁজে পায় না কানু, তাতে যেন আরও বিহ্বল, আরও অভিভূত হয়ে পড়ে। জল দেওয়া শেষ হ'লে চা-খাওয়া, চা-খাওয়া শেষ হ'লেও চট্ করে উঠতে দেন না, বলেন, 'আর একটু ব'সো না ভাই— দুদিন পরে ত আর গল্প করতে আসবে না। তখন দেখাই পাবো না। তার চেয়ে এইবেলা একটু গল্প ক'রে নিই, আর একটু বসো। এই ত সবে রাত ন'টা —'

কানু আগে ওঁর সঙ্গে সম্ভ্রমে কথা কইতে পারত না। এখন সে-ও বেশ সহজ ভাবে কথাবার্তা বলে। সে বলে, 'এর পর এলেই কি চিনতে পারবেন বৌদি, তখন ঘন ঘন এলে মনে করবেন কি করতে জ্বালাতে আসে ছোঁড়াটা!'

'ইস্! তাই বইকি! আমরা ত আর বড়লোক নই, দশটা লোকও নেই আমাদের। আমরা অত সহজে ভুলি না।'

পুলকিত কানু তখন চেপে বসে। কিন্তু কি কথা কইবে ভেবে পায় না ঠিক। অবশ্য ললিতা-বৌদি কথা বলাতে জানেন, আস্তে আস্তে এমন সব

প্রশ্ন করেন যে তার জবাব দিতে দিতে কানু তেতে ওঠে, তখন সে-ই অনর্গল বকতে শুরু করে। বেশির ভাগই ওর কারখানার গল্প করে। তার সব কথা ললিতা বোঝেন না, কিন্তু কাজ করতে করতে মন দিয়ে শোনেন। তাঁর ভালও লাগে। বিরাট কারখানা, তার কত যন্ত্রপাতি, তার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের মানুষ, তার মালিক, তার ম্যানেজার—সব কানুর গল্পের মধ্যে দিয়ে ওঁর মনে একটা রূপ নেয়। এর ভেতরে আবার কত চোরা ব্যাপার। মালিক ঠকাচ্ছে গবর্ণমেণ্টকে, ম্যানেজার ঠকাচ্ছে মালিকদের। আবার মালিকরাও কর্মচারীদের সঙ্গে যোগ-সাজস ক'রে পরস্পরকে ঠকাচ্ছে। মোটামুটি এই ব্যবসাটা সম্বন্ধে ওঁর একটা ধারণা হয়। এখানেও ওঁর সঙ্গে সাধারণ মেয়েদের তফাৎটা লক্ষ্য না ক'রে পারে না কানাই। চাঁপার ত কথাই নেই—কতদিন মহা উৎসাহ নিয়ে কানাই গল্প করতে গেছে, মিনিটকতক শোনবার পরই চাঁপা একটা প্রচণ্ড হাই তুলে বলেছে, 'রাখো বাপু—ওসব কথা আমার ভাল লাগে না। ঐ যে রাধি বলে না, পুরুষদের সব সময় ইয়ার চাই, কি ঘরে কি বাইরে—তোমার হয়েছে তাই!'—সঙ্গে সঙ্গে কানুর জ্বলন্ত উৎসাহে যেন কে এক বাল্‌তি জল ঢেলে দিয়েছে।

এখানে সে-সব কিছু নেই, এখানে সে কল্পনা ও সত্য মিশিয়ে মুখের লাগাম একেবারে খুলে দিত, 'জানেন বৌদি, আমাদের ফোরম্যান শালা হয়েছে এমন পাজী, বাবুদের অংশীদার রাধাকিষেণ মাড়োয়ারী, তার সঙ্গে বন্দোবস্ত ক'রে রোজ রাত্তিরে ভাল ভাল ইস্পাতের চাদর পাচার ক'রে দিচ্ছে। তার বদলে রাধাকিষেণ কোথা থেকে লক্কড় মাল এনে দেয়, সেইগুলো ভাল চাদরের সঙ্গে মিশিয়ে রেখে দেয় শালা। মোটা মোটা টাকা কামাচ্ছে বৌদি, বললে বিশ্বাস করবেন না, এর ভেতরই বৌয়ের নামে, শালীর নামে তিনখানা বাড়ী কিনে ফেলেছে। সেইজন্যে ব্যাটা আমাদের কিছুতে নাইট দিতে চায় না। ঐ যে পাঁচ-সাত জন আছে ওর বিশ্বাসী, তারাও কিছু-কিছু পায় কিনা—তাদেরই কেবল নাইট দেয়। কম পাজী ব্যাটা!'

এম্‌নি কত কি। একই গল্প ঘুরিয়ে ফিরিয়ে করে, তাতেও অবশ্য ললিতা-বৌদির মনোযোগের অভাব হয় না। হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকার গল্প করে—সদরে ও পেছনে কেমনভাবে এই বিপুল টাকা কত লোক রোজগার করছে! শুনে ললিতা-বৌদি মাঝে মাঝে হেসে বলেন, 'তাতে তোমারই বা কি, আর আমারই বা কি বলো ভাই, তোমারও দুঃখু ঘুচবে না, আমারও না। উল্‌টে দিনদিন টানাটানি বেড়েই চলেছে। ওঁর মাইনে বাড়ে

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, আমাদের খরচা চলে ছুটে ছুটে। আমরা যে তিমিরে, সে তিমিরে !'

রাত দশটা সওয়া-দশটা পর্যন্ত বসে থাকে কানু এক একদিন। বাবু ফেরেন, তিনিও বসে চা খেতে খেতে ওদের গল্পে যোগ দেন। কেমন সুন্দর মানুষ এঁরা—চাকরকে শুধু-চাকর বলে মনে করেন না।

ফলে বহু রাত্রে সে যখন বাড়ী ফেরে তখন মনটা এত লঘু ঠেকে ! বাতাসে ভর দিয়ে চলে যেন সে। অদ্ভুত একটা শান্তি, একটা স্নিগ্ধতা অনুভব করে অন্তরে অন্তরে। সেই সঙ্গে একটা সারা-মন-টন্‌টনিয়ে ওঠা বেদনা, একটা শূন্যতা, অজ্ঞাত একটা অভাববোধের হাহাকার। ওদের বাড়ী থেকে যখন বেরোয় তখন যতটা হাল্‌কা বোধ হয় নিজেকে, বাড়ীর কাছাকাছি আসতে আসতে তেম্‌নি পাষাণভার যেন ওর পা দুটোকে অনড় ক'রে তোলে। একটু আগের আনন্দ বাইরের আকাশ ও নির্জনতায় ক্রমশ বাষ্প হয়ে ঘনিয়ে আসে চোখের ওপর। তখন প্রতিজ্ঞা করে যে, আর না, কাল জল দেওয়া শেষ ক'রেই চলে আসবে, এক মিনিটও বসবে না—মায়া যখন কাটাতেই হবে তখন শেষ মুহূর্তে এতটা বাড়ানোর দরকার নেই। মিছিমিছি আরও বেশি ক'রে কষ্ট পাওয়া। কিন্তু, সেখানে গেলেই আবার সব কেমন গোলমাল হয়ে যায়। দুঃখ পাবে জেনেও সেই মুহূর্তটিকে অস্বীকার করতে পারে না। এমন কি, ওর মনে হয়, সে দুঃখের মূল কারণ যেটা, সেটা দুঃখকেও সহনীয় শুধু নয়, কামনার ধন ক'রে তোলে।

অবশেষে সেই বিশেষ ক্ষণটি সত্যিই আসে। যেটাকে সে চেয়েও আশা করেছিল পাবে না, ওর চিন্তা যাকে প্রতিমুহূর্ত আশঙ্কা ক'রেও প্রাণপণে চেষ্টা করত ধারণার গণ্ডীর বাইরে রাখতে—সেই মুক্তির ক্ষণ !

ললিতাবৌদি ছলো-ছলো চোখে জানান, 'লোক পাওয়া গেছে ভাই, ভারীই ঠিক করা হয়েছে। পাঁচ সিকে ক'রে ভার মাসে,—রোজ দশ ভার জল দেবে, তাইতেই যেমন ক'রে হোক্ চালাতে হবে। কী আর করব বলো, ওর চেয়ে বেশী খরচ করার ক্ষমতা নেই। আসছে মাসের পয়লা থেকে তাকে আসতে বলেছি।'

এই কথাগুলো কেমন যেন বিশ্রী লাগে কানুর। এসব কথা ওকে শোনানোর প্রয়োজন কি ? ও কি ইচ্ছে ক'রে ওঁদের কষ্ট দিচ্ছে ? না কি

এ বেশী খরচের জন্যে কানুই দায়ী! কত টাকা কানু ওঁদের কাছ থেকে নিতে পারত তা এইবার ওঁরা বুঝে দেখুন! কানু শুধু টাকার লোভে ওঁদের জল যোগাত না—কানুর দাম এই দুঃখে পড়ে তবে বুঝতে পারবেন!

এমনি এলোমেলো অর্থহীন অভিযোগ কোথা থেকে এসে জড়ো হয় মনের মধ্যে। আসল কথা এসব গুলো ওর ক্রুদ্ধ মনের ব্যর্থ বিদ্বেষ। সে ক্রোধের দহনে জ্বলবার কথা অন্য লোকের—কিন্তু, নিরুপায় সেই ক্রোধবহ্নি ওকেই জ্বালায় শুধু। ফলে বিদ্বেষে, ব্যথায়, অকারণ ঈর্ষায় ও যেন ছটফট ক'রে ওঠে সেই মুহূর্তে। আর অদ্ভুত একটা অভিমান বোধ করে সেই সঙ্গে। সে মাথা নিচু ক'রে গম্ভীর হয়ে বলে, 'যদি সম্ভব হয় ত তাকে কাল থেকেই আসতে বলুন না বৌদি, পয়লা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে আমার একটু অসুবিধা হবে।'

ওর এই ভাবান্তরের অর্থ বুঝতে পারেন না ললিতা, এই অকারণ আঘাতের কারণ। তাঁরও অভিমান হয়। তিনি শুধু উত্তর দেন, 'তা.ক তা বলা হয় নি। কাল থেকেই সে কি ক'রে আসবে? কাল তা'লে তাকে ডেকে জিজ্ঞেসা করতে হয়।'

'বেশ, তাই করবেন। যাতে পরশু থেকে আসতে পারে—'

তারপর একটু থেমে, আরও রূঢ় হবার একটা চেষ্টায় বলে বসল, 'না হয়, না হয় আমি—আমার এই কটা দিনের মাইনে দরকার নেই, সেটাও তাকে দিয়ে দেবেন—তাহলে হয়ত সে রাজী হবে।'

এই অনর্থক অপমানে ললিতার ভ্রূ কুঁচকে এল। তিনি শুধু সংক্ষেপে বললেন, 'না, তার দরকার হবে না।'

সেদিন আর ওদের আড্ডা জমে না। যদিও ললিতাবৌদি চা দিতে এসেছিলেন অন্যদিনের মতই। কিন্তু কানু আর বসতে পারে না, জল দিয়েই বেরিয়ে পড়ে রাস্তায়।

এ কি করল সে, এ কী করে বসল?

যাঁর পায়ের ধুলো পেলে জীবন ধন্য মনে করে ও, যাঁর পায়ের কাঁটা বাঁচাতে বুক পেতে দিতে পারে, তাঁকেই অপমান ক'রে বসল, আঘাত দিয়ে বসল,—অকারণে?

ওর যেন নিজেকে নিজে চাবুক মেরে জর্জরিত করতে ইচ্ছা করছিল। এ ওর কী ভূত চাপল ঘাড়ে? কেন এ কাজ করতে বসল?...

সেদিন সারারাত ঘুমোতে পারল না। এ-পাশ ও-পাশ ছটফট করতে করতে প্রতিজ্ঞা করল যে ভোরবেলা যখন জল দিতে যাবে তখন বৌদির

পায়ে ধরে ক্ষমা চাইবে। কিন্তু কার্যকালে তা হয়ে উঠল না। কেমন যেন লজ্জা করতে লাগল, তাছাড়া বাবুও তখন উঠে পড়েছেন—তিনি কি ভাববেন? এমনিতেই তিনি কি ভাবছেন কে জানে, বৌদি নিশ্চয়ই বলেছেন ওর আচরণের কথা!

কারখানার কাজ করতে করতে ও বার বার ভগবানকে ডাকতে লাগল —যেন ললিতাবৌদি ভুলে গিয়ে থাকেন কথাটা, কিংবা যেন সে ভারীর দেখা না পেয়ে থাকেন। দেখা পেলেও সে পয়লার আগে আসতে রাজী না হয়!

কানু সন্ধ্যার পর জল দিতে এল দুরু-দুরু বক্ষে। হে মা কালী!

কিন্তু মা কালী ওর কথা শুনলেন না। কানুর মনে হ'ল এটা ওর পাপের, অপরাধেরই শাস্তি দিলেন তিনি। ললিতাবৌদি বিষণ্ণ-গম্ভীর মুখে বললেন, 'ভারীর সঙ্গে বন্দোবস্ত করেছি ভাই কানু, কাল থেকেই সে আসবে।'

বিদায়ের ঠিক আগের মুহূর্তটিকে কানু কেন এমন ব্যবহারটা করল, এতকালের মধুর সম্পর্কটা তিক্ত ক'রে দিল, এখনও বুঝতে পারেন নি তিনি। অথচ কানুকে বিদায় দিতেও বাজছে যেন মনের মধ্যে, সে তিক্ততা সত্ত্বেও।

জল তোলা শেষ হ'তেই বৌদি ওর নাম ধরে বললেন ভেতর থেকে, 'দাঁড়াও কানু, যেও না।'

তারপর একটি রেকাবীতে গুটিকতক রসবড়া ও খানচারেক লুচি সাজিয়ে এনে দিয়ে বললেন, 'আজ খেয়ে যেতেই হবে। কাল কেন কে জানে রাগ করেছিলে আমাদের ওপর। কিন্তু তাই বলে আজ আর কোন কথা শুনছি না। আবার কবে দেখা হবে, খেতে দিতে পারব কিনা—তাই দুপুরবেলা না ঘুমিয়ে বসে বসে রসবড়া তৈরী করেছি। নাও বসো—

তিনি ম্লান একটুখানি হাসলেন।

কালকের অপমানের যোগ্য প্রত্যুত্তরই দিয়েছেন বৌদি। এ ওঁরই উপযুক্ত হয়েছে। ওর চোখে জল এসে যাচ্ছিল বলে প্রাণপণে সামলাবার চেষ্টায় খাবারের রেকাবীর ওপরেই ঝুঁকে পড়ল—কথা কইতে পারল না। কবে সে বলেছিল বৌদির হাতের রসবড়া তার সব চেয়ে ভাল লাগে—সে কথা আজও উনি ভোলেন নি। আশ্চর্য!

খাবারের থালার পাশেই টাকা ক-টা রেখে দিয়েছিলেন। পুরো এক-মাসের মাইনে, আর নতুন একখানা ধুতি।

খাওয়ার পর বাসন ধোওয়ার অছিলায় কলতলায় গিয়ে চোখ-মুখ-মুছে

প্রস্তুত হয়ে এল কানু। ধরা-ধরা বিকৃত গলায় বললে, 'একটু দাঁড়ান বৌদি, পেন্নাম কর্‌ব একটা—'

আজ আর সে কোন সঙ্কোচ রাখবে না—এজন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

সে হেঁট হয়ে, বৌদি কোন বাধা দেবার আগেই, দুহাত দিয়ে দুটি পা ধরে একেবারে পায়ের ওপর মাথা রেখে প্রণাম করল, কিন্তু তাকে বোধ হয় প্রণামও বলে না, মুখটা দুই পায়ের ওপর চেপে রইল। বহুদিনের লোভ তার—এই দুটি পায়ের ওপর। এ সুযোগ আর জীবনেও পাবে না হয়ত—সমস্ত ব্যথা, সমস্ত দুঃখ এই দুটি আল্‌তা-পরা পায়ে ঢেলে দেবার।

'ছি ছি—ও কি ভাই, এই পাগল, ছি!'

ললিতা বৌদি জোর ক'রে ওর হাত দু'টা ধরে ছাড়িয়ে নিলেন পা থেকে, তারপর ওর হাত ধরেই কোনমতে তুলে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'ও কি, ছি! অমন পাগলামি করে! অত কান্নারই বা কি আছে, এই ত এখানে। আসবে রোজ একবার ক'রে, অবসর পেলেই এসো। বুঝ্‌লে?'

কানুর হাত দুটো কিন্তু তখনও ওঁর হাতের মধ্যে চেপে ধরা ছিল। সেই অকল্পিত-পূর্ব সৌভাগ্যে ও মর্মান্তিক দুঃখে কতকটা বিবশভাবেই কানু বললে, 'অনেক অপরাধ করেছি বৌদি. কিছু মনে করবেন না, মাপ করবেন—'

'কিছু না। ওসব কিছু বলতে হবে না। চোখ মোছ, পাগল কোথাকার।'

তিনি ওর হাত দুটো ছেড়ে দিয়ে একবার নিজের আঁচলে হাতও দিলেন কিন্তু বোধ হয় একটা সংস্কারে বাধল। আবারও বললেন, 'চোখ মোছ, চোখ মোছ। ওকি, ছেলেমানুষের মত কান্না কি!'

কিন্তু তাঁরও গলা ধরে এসেছিল। চোখের জল একান্ত চেষ্টায় সাম্‌লে নিচ্ছিলেন।

কানু অন্ধের মত হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে বাড়ীর বাইরে এসে দাঁড়াল।

১৬

এরপর তিন চারটে দিন যে কী ক'রে কাটল কানুর, তা সে-ই জানে। সন্ধ্যা যেন কাটে না। কোথায় যাবে—কোথায় কাটবে এই সময়টা' সেইটেই যেন বড় সমস্যা। পুঁটির বাড়ি যেতে ইচ্ছা করে না শেষ পর্যন্ত। তার অন্য কাজ আছে, অন্য মানুষ আছে—মিছিমিছি তাকে. বিব্রত করা। স্টেশনে এসে ওভারব্রীজের একটা সিঁড়িতে বসে থাকে বহুরাত্রি পর্যন্ত, বাড়ী ফেরে কোনদিন রাত এগারোটায় কোনদিন বারোটায়। বাড়ী ফিরলেই চাঁপার মুখ দেখতে হবে, সে চিন্তাও অসহ্য। ওর সঙ্গ যেন বিষ হয়ে উঠেছে

আজকাল। যদিও রাত ক'রে বাড়ী ফেরার জন্য সে আজকাল কিছুই বলে না—নিজের খুশিতে নিজে মশগুল! কানু যে ও বাড়ীর কাজ ছেড়ে দিয়েছে এ সংবাদ ওদের বস্তিতে পৌছতে বিলম্ব হয় নি।

অবশেষে কানু রাত অবধি ওভারটাইম নিলে। পয়সাও আসবে, কাজের মধ্যে নিজের কথাটা ভুলে থাকতেও পারবে। মিছিমিছি একজায়গায় চুপ ক'রে বসে বসে ছট্‌ফট্‌ ক'রে লাভ কি?

ওর সুমতি দেখে কারখানার সবাই খুশী হ'ল। ভরত বার বার বলতে লাগল, 'দেখিল? সে কেত্তে টকা ছাড়ি দিল! এই দুবছর নাইট করিলে কেত্তে বেশি মিলিত! রাম্‌ম রাম্‌ম!'

কিন্তু রাত অবধি 'ওভারটাইম' মানে রাত সাড়ে আটটা পর্যন্ত কাজ। তারপরও যেন ওর সময় কাটে না, বাড়ী ফিরে স্নান ক'রেই আবার বেরিয়ে পড়ে। হয় স্টেশনে নয় ত রায়েদের পুকুর-পাড়ে চুপ ক'রে গিয়ে বসে থাকে। কত কী আকাশ-পাতাল ভাবে।

একটা খেয়াল আজকাল ওর মাথায় এসেছে। ললিতা বৌদিকে ও কিছু একটা উপহার দেবে। বেশ দামী একটা কিছু। এই যে ওপর-টাইমের বাড়তি টাকাটা—এইটেই সে আলাদা ক'রে জমিয়ে রাখবে। তিন-চার-মাসের টাকা জমলে সওয়া শ' দেড়শ' টাকা হয়ে যাবে। কিম্বা হয়ত আরও বেশী।

কী দেবে? শাড়ী একখানা?

বেনারসী শাড়ী? সুন্দর মানাবে কিন্তু। বেগুনি রঙের বেনারসীর ওপর সোনালি জরি। ঐ যেমন শচী দিদিমণির বিয়েতে হয়েছে। সেদিনও সে পরে বেরিয়েছিল ঠাকুর দেখ্‌তে। কত দাম কে জানে, হয়ত অনেক বেশি। তা না হয় ছ মাসের টাকা জমলেই কিন্‌বে।

কিন্তু আবার ভাবে—শাড়ী ত তোলাই থাকবে। বেনারসী শাড়ী সে ত আর রোজ পরার জিনিস নয়, কদাচিত কখনও, কালে-ভদ্রে পরার কাপড়। যখন পরবে তখন হয়ত একবার মনে পড়বে কানুকে। না-ও পড়তে পারে, বেনারসী পরে মানুষ যজ্ঞিবাড়ীতেই যায়—লোকজনের ভীড়ে, কাজ-কর্মের ঝঞ্ঝাটে অত কথা মনেই পড়বে না।

আচ্ছা, প্রায়ই কানুর কথা মনে পড়ে—এমন কোন জিনিস দেওয়া যায় না?

কী এমন আছে!

বালা গড়িয়ে দেবে সোনার? সে বোধ হয় দুশ' আড়াইশ'র কমে

হবে না। তাই হোক্ না, দোষ কি? ওঁর ঐ সুন্দর হাতে মানাবে ভারী চমৎকার!—যে হাতে কানুর হাত দুটো চেপে ধরেছিলেন! কানু নিজের হাতের উল্টে পিঠটা নিজের অজ্ঞাতেই গালের ওপর চেপে ধরে। যেখানটা তিনি হাত দিয়ে ধরেছিলেন, সেইখানটা। যেন তাঁর স্পর্শটা অনুভব করবার চেষ্টা করে।

কিন্তু অন্যসময়ে প্রকৃতিস্থ অবস্থায় বালার কথা চিন্তা করতে গিয়ে সে নিজে নিজেই সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। কাজ নেই, সেটা বড় বেশী রকমের ধৃষ্টতা হয়ে পড়বে, বড় বেশি স্পর্ধা। কী মনে করবেন ওঁরা? বিশেষ ক'রে বাবু। সাতটাকা মাইনের চাকরের পক্ষে সোনার বালা কিংবা বেনারসী শাড়ী উপহার দেওয়ার অর্থটা কারুর কাছেই খুব ভাল বলে মনে হবে না।

না, না—সে থাক। বিশেষত বৌদি নিজে কি ভাববেন?

তার চেয়ে ছোটখাটো কিছু, নিতান্ত তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর, আর্থিক মূল্য হিসাবে যার দাম নেই—অথচ কাজে লাগে? এমন কিছু?

তেমন কী জিনিস দেওয়া যায়?···

দিন-রাত কাজের ফাঁকে ফাঁকে কত কি ভাবে কানু। কুলো? ডালা? কাঠের একটা টুল—বৌদির রান্নার জন্যে? কিন্তু মনে হয় কুলো ডালা ত ভেঙে যাবে, টুলও তাই। দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় এমন কোনো জিনিসের কথাই যেন তার মনে পড়ে না! বিশেষত এমন কোন জিনিস যদি দেওয়া চলত, যা সে নিজে তৈরি করতে পারে, ওর হাতের জিনিস!

দুতিন দিন ধরে কথাটা মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে হঠাৎ এক সময়ে কানুর মনে পড়ে যায়, বৌদির সাঁড়াশি দুটোই ভাঙা! কানু নিজেই দুবার কামারের দোকান থেকে সারিয়ে এনে দিয়েছে, কতবার গরম তরকারী গায়ে পড়ে যেতে যেতে রয়ে গেছে। বাবু কিছুতেই ভাল সাঁড়াশি আনতে পারেন না বলে বৌদি প্রায়ই অনুযোগ করেন। সাঁড়াশিই ভাল। কানু নিজে হাতে তৈরী ক'রে দিতে পারবে'খন্—মজবুত ভারী, খাঁটি ইস্পাতের। ওদের সেই রেঞ্চুর ছাঁচে, যাতে বজ্র-কামড়ে ধরতে পারে কড়া চাটু থেকে শুরু করে যে কোন জিনিস—অথচ সাধারণ রেঞ্চুর থেকে ঢের বড়, লম্বা, বৌদির হাতের সাইজ মত। এই ঠিক হবে, বা! কানু মনে মনে নিজেকেই তারিফ করে, এই মতলবটা মাথায় আসার জন্য। প্রতিদিন দরকার, প্রতি-

দিনই দুবেলা বৌদি হাতে ক'রে কুড়া-চাটু নামাবেন বার বার! সবচেয়ে প্রয়োজনের জিনিস হবে তাঁর, অথচ কানুর হাতের জিনিস। পয়সার দিক থেকেও এত সামান্য যে সেটাকে কেউ স্পর্ধা বলে ভাববে না, ভাববে এমনি বৌদির কাজের অসুবিধা দেখে এনে দিয়েছে, তুচ্ছ জিনিস তাও আবার ওর কারখানার, মানে নিজে হাতে করা—নিতান্তই ছোটখাটো ব্যাপার। ওর এই জিনিসটা উপহার দেওয়ার আর কোন অর্থ তারা কল্পনা পর্যন্ত করতে পারবে না।...

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে কানু বিষম উৎপাটিত হয়ে ওঠে। অবাক হয়ে ভাবে এই সোজা কথাটা এতদিন মাথায় আসে নি কেন? এখন শুধু সুযোগের অপেক্ষা।

তা সুযোগেরই বা অভাব কি? বিশেষতঃ অতবড় কারখানায়? সে এদিক ওদিক থেকে একটু একটু ক'রে এগোয়। এ যন্ত্র থেকে খানিকটা, ও যন্ত্র থেকে খানিকটা কাজ সেরে দুটো টুকরো তৈরী হয়ে গেল দুদিনেই—নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, এখন শুধু দুটো অংশকে জুড়ে রিবিট ক'রে দেওয়া। সেইটেরই একটু অসুবিধা। চুরি সবাই করতে-চায় এবং করে ব'লে কর্তারা কড়াকড়ি পাহারার ব্যবস্থা করেছেন আজকাল, যাতে নিচের দিক থেকে অন্তত কিছু বেরোতে না পারে। রিবিট করা যদি বা যায়, বার ক'রে আনা অত্যন্ত কঠিন!

যাই হোক্—পাঁচ সাতদিন অসহিষ্ণু প্রতীক্ষার পরই একটা সুযোগ এসে গেল। কাজ এত জমেছে যে ওভার টাইম ব্যবস্থা রদ হয়ে সোজাসুজি তিন 'শিফ্ট' বা তিনবার লোক বদলে দিনরাত কাজ চালানোর ব্যবস্থা হ'ল। ইচ্ছে করলে কেউ দুশিফ্ট্ পর পর নিতে পারে কিংবা একটা অন্তর। তাতে আর সামান্য কিছু বেশী পাবে কিন্তু কোম্পানীর অনেক লাভ। 'আটটা' থেকে চারটে, চারটে থেকে রাত বারোটা, আবার বারোটা থেকে পরের দিন সকাল আটটা—এই তিন দফা। কানু যেন হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পেলে। প্রথম থেকেই কানু প্রথম দুটো দফা বেছে নিলে—পরপর অর্থাৎ সকাল থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত। বিপুল পরিশ্রম, চৌদ্দ ঘণ্টা খাটুনি—দুঘণ্টা টিফিন বাদ। তাও দু-ঘণ্টা টিফিন পাবার কথা থাকে বটে কিন্তু হাতের কাজ-গতিকে পুরো টিফিন প্রায় কোনদিনই নিতে পারে না। তাতে কানুর প্রয়োজনও নেই। খাটতে সে পারে খুব, খোরাকটা ঠিকমত পেলেই হ'ল। সেটাতে সে কার্পণ্য করে না। ভরত প্রভৃতি দু-একজন আছে যাদের সব পয়সাটাই জমানোর

দিকে লক্ষ্য, ফলে তাদের এখনই যা শরীরের অবস্থা, যক্ষ্মা না হোক্ অন্ত যে-কোন শক্ত ব্যারাম যে কোন মুহূর্তে হ'তে পারে। কানুর কিন্তু অর্থে লোভ থাকলেও মায়া ছিল না অত। পয়সাটা রোজগার করা খরচের জন্যই। সে ওরই মধ্যে যতটা সম্ভব ভাল খাওয়া-দাওয়া করত। মাছ খাওয়া রোজ হয়ে উঠত না বটে, তার বদলে ও একটু দুধ নিত প্রত্যহ। আনাজ তরকারী কিনতেও তার সঙ্কোচ ছিল না।

এই খাওয়ার জন্যেই তার শরীর আজ এমন সবল ও সুস্থ হয়ে উঠ্‌তে পেরেছে, অন্তত কানুর তাই বিশ্বাস। ঈশ্বর এই একটা দিকে তাকে কখনও কষ্ট দেন নি। পর পর যে সব বাড়ীতে সে কাজ করেছে তাতে খাওয়ার কোন অসুবিধা হয় নি। আড়ম্বর না থাকলেও পর্যাপ্ত খেতে পেয়েছে। কলকাতায় বড়লোকের বাড়ীতে খাওয়াব ব্যবস্থাটা একটু খারাপ ছিল বটে, তা হ'লেও বীণাবৌদির খবরদারীতে অন্তত পরিমাণে কম হ'তে পারে নি। একটু সেয়ানা হওয়ার পর, যখন চোখ মেলে চেয়ে দেখার বয়স হ'ল, অন্য বাড়ীতে ঝি-চাকরের খাওয়ার ব্যবস্থা যা সে দেখেছে—মনে হ'লেই যেন মাথা হয় বেচারীদের ওপর। কোথাও কোথাও বাবুদের খাওয়া হ'লে কাঁচাজল মিশানো হ'ত দালে, সেই হিসেব ক'রেই দাল কম নেওয়া হ'ত—এবং চচ্চড়ির ডাটা থেকে আনাজের ভাগ চেঁচে নিয়ে শুক্‌নো ডাটাগুলো রাখা হ'ত ওদের জন্য। বহু বাড়ীতে বেচারীদের পেট ভরবারই কোন ব্যবস্থা ছিল না, বাধ্য হয়ে চুরি করতে হ'ত তাদের। চুরি ক'রে না খেলে বাঁচাই দুষ্কর হ'ত। ইদানীং বটে যুদ্ধের দৌলতে ঝি চাকর আক্রা হ'তে বাবুরা বাধ্য হচ্ছেন ভাল ব্যবস্থা করতে।

কানু তাই জানে যে, তার দেহের ইঞ্জিনে যদি যথেষ্ট কয়লা ও জল পায় ত যত খুশী চালাতে পারবে। মোটা ক'রে টিফিন খেয়ে নিত সে, কারখানার রেশন—আটার অভাব নেই, আজকাল সে রুটি করিয়ে নিয়ে আসে। রাত বারোটা কেন, সারারাত কাজ করালেও তার আপত্তি নাই।

আর তাতেই ওর সুযোগ এল। বারোটায় পাহারা শিথিল হয়ে আসে এমনিতেই। জিনিসটা কোমরের মধ্যে গুঁজে নিয়ে যাওয়া যাবে অনায়াসে। একটু তদ্বির ক'রে রিবেট করার কাজ নিলে সে কদিনের জন্যে ইচ্ছে করেই। তবু অসুবিধা হয়। আশে পাশে যারা কাজ করে তাদের কাউকেই বিশ্বাস নেই—চুকলি খেতে সিদ্ধ হস্ত। মালিকদের সবাই কিছু কিছু গোয়েন্দা রাখেন এদের মধ্যে, কে কখন লাগাবে ঠিক নেই। আর না লাগালেও পঞ্চাশ

রকমের জবাবদিহি। এ সংবাদটা সে একান্ত গোপনে রাখতে চায়—কাউকে ওর জানাবার ইচ্ছা নেই। সুতরাং ভেতরে ভেতরে অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেও বাইরে খুব শান্তভাবে সুযোগ খোঁজে।

অবশেষে একদিন সে সুযোগ এল শিগ্‌গিরই। রাত বারোটায় যাদের কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা, তাদের অনেকেই দশটা নাগাদ কারখানায় ঢুকে একপাশে পড়ে ঘুমোয়। অর্থাৎ আসল হাজিরাটা বারোটা না হয়ে সাড়ে বারোটা কি একটা হলেও ক্ষতি নেই। কে দেখছে? অথচ যারা যাবার তারা বরং দু-পাঁচ মিনিট আগেই বেরিয়ে যায়। এমনি একটা নির্জন মুহূর্তে কানু নিজের কাজ গুছিয়ে নিতে বসল। খুবই অল্প কাজ, ওদের কাছে দুমিনিটের বেশী সময় লাগবার কথা নয় কিন্তু কানু ইচ্ছে ক'রেই একটু বেশী সময় নেয়। পরিপাটি ক'রে তৈরি করে সে, কোথাও কোন খুঁত, কোথাও কোন অসুবিধা না থাকে। মজবুতও হওয়া চাই। তার ললিতাবৌদির জীবিতকালে যেন আর সাঁড়াশির দরকার না হয়।

শেষ ক'রে উঠে পা বাড়াতে যাবে, হঠাৎ মনে হ'ল এটাকে নিকেল ক'রে নিলে কেমন হয়?

ছেলেমানুষী নিতান্তই সন্দেহ নেই—কিন্তু সে মুহূর্তে সে কথাটা মনে হ'ল না কানুর, বরং আকস্মিক একটা আগ্রহে চোখ জ্বলে উঠ্‌ল। সে-ই ওধারে নিকেল করার যন্ত্রপাতি। কেউ নেই ওখানে, কাজটাও কানুর জানা আছে। বেশ হবে, রূপোর মত চক্‌চকে করবে সাঁড়াশিটা। একবার একটুখানি মাত্র ইতস্তত করে সে সেই দিকেই পা বাড়াল—

তারপর?

বোধহয় ওকেই নিয়তি বলে।

তখনকার কথা ওর ভাল জানাও নেই। কারণ ঘটনাটা কয়েক মুহূর্তের। তা ছাড়া ওর তখন কোন জ্ঞানও ছিল না, তখন ত নয়ই, অনেক দিন পরে পর্যন্ত না। কী ক'রে যে কি হল তা-ও ও পরিষ্কার জানতে পারে নি। শুধু কোথা থেকে কী একটা শিথিল হয়ে এসে কেমন ক'রে যেন ওকে জড়িয়ে ধরল এবং ব্যাপারটা কি ঘটল ভাল ক'রে বোঝবার আগেই নিয়ে গিয়ে ফেলল বিপুল একটা যন্ত্র-চক্রের মধ্যে। সে এক নিমেষের ব্যাপার।

তার পর?

তারপর আর ও জানে না। ওর পা-দুটো থেঁতলে গুঁড়িয়ে পিষে, ছাতু

হয়ে গেল—ও একবার প্রাণপণে আর্তনাদ করে ওঠ্‌বার আগেই। চোখের পলক ফেলতে তর সইল না।

এর পর-মুহূর্তেই ও অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল বটে কিন্তু সেই, বোধহয় কয়েক মুহূর্ত সময়ের যন্ত্রণা—হে ভগবান!

কানু যেন অব্যক্ত একটা আন্তরিক যাতনায় ছট ফট্‌ ক'রে উঠে বসল। ঘরে বাইরে চারিদিকে অন্ধকার—রাস্তার কোলাহল থেমে গেছে অনেকক্ষণ। পাশের বস্তির গোলমাল চেঁচামেচিও কমে এসেছে। কেউ তখনও রান্না করছে, কেউবা খেয়ে শুয়ে পড়েছে। অনেকেরই এ বেলা রান্না হয় না, খাওয়াও হয় না—তাদেরই মত। তাই সকাল ক'রে শুয়ে পড়ে।

কত রাত হ'ল কে জানে! চাঁপা এখনও ফিরল না? থাক্‌ চাঁপার কথা। কিন্তু সেদিনের, সে রাত্রির কথাও যে ওর মনে করতে ইচ্ছে করে না।

নিদারুণ যন্ত্রণায় ওর তখন সমস্ত চৈতন্য আচ্ছন্ন ছিল কিন্তু একেবারে অজ্ঞান হ'তে ও পারে নি বোধহয়। কারণ আব্‌ছা আব্‌ছা—অস্পষ্ট ওর মনে পড়ে এখনও, সেই হৈ-চৈ, ছুটোছুটি—লোকজন ছুটে আসা, সে বিপুল চেঁচামেচি! তারপর বোধহয় ওকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই রাত্রেই বোধহয় পা দুটো উরু থেকে কেটে বাদ দেয়। সে কথা ওর কিছু মনে নেই। পরে শুনেছে।

এরপর দীর্ঘকাল ওর সেই হাসপাতালে পড়ে থাকা। পিঠে, শিরদাঁড়ায় প্রচণ্ড আঘাত লেগেছিল, সেইজন্যে পা শুকিয়ে গেলেও উঠে বসতে পারে নি। ওর বাবু, মানে ললিতা-বৌদির বর হাসপাতালে দেখতে গিয়েছিলেন—তিনি চেষ্টাও করেছিলেন যাতে কী আলো ফেলে ওর পিঠের হাড়টা পরীক্ষা ক'রে দেখা হয় আর তেমন কোন হাড় ভেঙ্গে-চুরে গেছে দেখতে পেলে পিঠ কেটে সেটা ঠিক ক'রে দেওয়া হয়—কিন্তু হাসপাতালের ডাক্তার তাতে কান দেন নি। যুদ্ধের সময়, চারিদিকে ভীড়, হাসপাতালে আশ্রয় পাওয়ার জন্য হাজার হাজার লোক রোজ ধন্না দিচ্ছে, এ সাধারণ একটা লোকের জন্য অত করা যায় না। এমনিতেই ত তিন মাস লোকটা জায়গা জোড়া ক'রে পড়ে আছে।

সুতরাং কিছুই হ'ল না। যে সাদা বিলিতি মাটিতে ওর কোমর পিঠ আটকানো ছিল, আরও দিন-কতক বাদে সেটাও খুলে দিয়ে ওকে বিদায় দিয়ে

দিলে। চাঁপা কোনমতে ওদের পাড়ার নেত্য আর নিবারণের সঙ্গে ধরাধরি ক'রে রিক্সায় তুলে বাড়ীতে নিয়ে এল।

তারপর থেকে এই। এই অনবরত শুয়ে থাকা। চাঁপার রোজগারে খাওয়া। আশা নেই এর চেয়ে ভাল কোন দিন দেখবার, আনন্দ নেই—অন্য কোন উপায়ও নেই! বেঁধে মারছেন ভগবান!

উঃ!

কানু অন্ধকারে কপালে ঘা মারে নিজের হাতেই। ইচ্ছে হয় মাথা ঠুকে ঠুকে মরে যায়। নিতান্ত শুনেছে আত্মহত্যা মহাপাপ, তাই পারে না।

হে ভগবান, হে মা কালী, ওকে তোমরা নাও!

প্রথম প্রথম কত লোক আশা দিয়েছিল যে কোম্পানীর নজর রাখবার দোষে কল বিগড়েছে, তাইতে তোমার ক্ষতি—এর মোটা ক্ষতিপূরণ পাবে।

ওরও আশা হয়েছিল, অন্তত মাসে মাসে গোটা কুড়ি ক'রে টাকাও যদি ওঁরা দিতেন তাহ'লে আজ চাঁপাকে—

থাক্ সে কথা।

সে ক্ষতিপূরণ তাঁরা দেন নি। মাসিকও না, এককালীন থোকেও কিছু নয়। তখন রাত বারোটা বেজে গিয়েছিল, ওর তখন থাকবার কথা নয়। বিশেষত সেদিকে ওর তখন যাওয়ার কোন কারণই ছিল না। লুকিয়ে সাঁড়াশি তৈরি করত ও হয়ত এমনি—প্রত্যহই। বেচে লাভ করত। চোরাই কারবার ক'রে কোম্পানীকে কতদিন ধরে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তার ঠিক কি? ওঁরা তাঁরা জেনেই দিতেন, তবে এম্‌নিতেই যথেষ্ট শাস্তি ভগবান দিয়েছেন মনে ক'রে আর কোন আইন আদালত করলেন না। ঐ কদিনের মাইনেটা দিলেন কিন্তু প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের টাকাটার কথা আর কেউ তুলতেও সাহস করলে না এর পর—ওঁরাও দিলেন না!

দয়া?

হ্যাঁ, দয়া করেছে বৈকি! অনেকেই করেছে। ললিতাবৌদি নিজে কোন দিন দেখতে আসেন নি বটে, বোধ হয় ইতিমধ্যে কিছু কানা-ঘুষো পৌঁচেছিল তাঁর কাছে, আগেকার সেই সব কথা—কিন্তু সে ভালই করেছেন। এই দৈন্য, এই নোংরামির মধ্যে ললিতাবৌদি? ভাবলেই শিউরে ওঠে কানু। ভগবান বাঁচিয়েছেন। মাঝে মাঝে ওর খুবই দেখতে ইচ্ছা হয় তাঁকে, তবু সে কল্পনা

করতেই পারে না যে এখানে তিনি এসে দাঁড়িয়েছেন! তার চেয়ে এ জীবনে আর তাঁকে দেখবে না, সেই ভাল।

বাবু এসেছেন ওদিকে কয়েকবার। মধ্যে মধ্যে দু-চারটে টাকাও দিয়ে গেছেন। এটা ওটা দু একটা খাবার জিনিস কিংবা দু একটা পুরনো জামা। সে বোধ হয় ললিতাবৌদিরই তাগিদে। এত বিবেচনা আর কার হবে, আপনা থেকে এত ভেবে-চিন্তে কাজ করা? তবে ইদানীং আর আসেন না। কতই বা করবেন তাঁরা? এই বাজার! না, সেজন্য কোন ক্ষোভ নেই কানুর মনে, কাউকে সে কোন দোষও দেয় না। তবে যদি খবরটা পেত অন্তত! ওঁরা এখানে আছেন কিনা, ভাল আছেন কিনা! এটুকু খবরও আজ আর পাবার উপায় নেই। চাঁপাকে জিজ্ঞাসা করতে ওর ঘৃণা বোধ হয়। আর কেমন একটা সঙ্কোচও।

সন্টু এসেছিল খবর নিতে। সে আজকাল বেশ মাতব্বর হয়েছে, মিলিটারীতে কি একটা চাকরীও করছে। বেশ মানায় ওকে সরকারী খাকি পোশাকটা! সে যদি সুস্থ থাকত হয়ত সে-ও অমন বেশী মাইনের না হোক, সিপাইর কাজও পেতে পারত। তাকেও খারাপ দেখাত না খুব। হয়ত ওর চেয়ে ভালই মানাত। যাই হোক্ সন্টু নিজে কিছু দিয়ে, বাকীটা পাড়ায় চাঁদা তুলে গোটা কয়েক টাকা দিয়ে গিয়েছিল একবার। তবে পাড়ায় বিশেষ সহানুভূতি সে পায় নি। যে চোর, ভগবান তাকে উচিত শাস্তি দিয়েছেন—তাকে দয়া করার কিছু নেই। এই ওঁদের ধারণা। সন্টু অবশ্য তাতে খুব রাগ করেছিল, সে নাকি অনেকের মুখের ওপরই শুনিয়ে দিয়েছে যে—'এই যুদ্ধের বাজারে চোর কে নয় তা বলতে পারেন? একটা সৎলোক দেখিয়ে দিন না? গরীব বেচারি একটা সাঁড়াশি চুরি ক'রেই যত চোরের দায়ে ধরা পড়ল, না?' কিন্তু কানু আর রাগ করে না, দুঃখও করে না। সে হাসে। সন্টকে বলে, 'কী দরকার ভাই ওদের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে? যে যা ভাবে ভাবুক।' কিন্তু সন্টু বলে, 'কেনই বা ওরা অমন বলবে। চোরা কোম্পানী কম্পেন্‌সেসান দেবার ভয়ে ঐ সব রটালে! রোজ যদি সাঁড়াশি চুরি করত ত এতদিন বাজারে ছেয়ে যেত—সে সব সাঁড়াশি গেল কোথায়?'

তবে সন্ট আর বেশিদিন খবর নিতে পারে নি। বেচারি রাঁচি না অমনি কোথায় বদলী হয়ে চলে গেছে।...

দয়া আরও অনেকে করেছে।

মোক্ষদা বেঁচে নেই আজ আর—কিন্তু নেত্য, নিবারণ, অক্ষয়, সুরেন,

সতীশ সবাই। আসলে সবাই ওরা লোক ভাল, মন কারুর খারাপ না। যে যতটা পেরেছে সাহায্য করেছে। টাকায় গতরে—আজও করে মাঝে মাঝে। একেবারে অচল হয়ে পড়লে ওদের কাছেই যেতে হয় যে। তবে ওদেরও ত অবস্থা ভাল না। একবেলা খেয়ে থাকে এমন লোকের অভাব নেই ওদের মধ্যে। তবু তারা যেটুকু করেছে তার ঋণ শোধবার নয়। কানু দুহাত তুলে মনে মনে ওদের নমস্কার করে।

আর চাঁপা?

১৭

চাঁপা!

মনটা ঘুরে ফিরে চাঁপার কাছেই যায় বার বার।

তীব্র একটা যাতনা বোধ করে চাঁপার কথা মনে হলেই—মানসিক আর বোধহয় দৈহিকও—তবু চাঁপার কথা বাদ দিয়ে নিজের জীবনের কথা ভাবা যায় কৈ?

চাঁপার কাছে ঋণই কি ওর কম?

চাঁপা অদ্ভুত, চাঁপাকে ও যেন কিছুতেই বুঝতে পারে না। চাঁপার জন্যই আজ ওর জীবনের এই সর্বনাশ, চাঁপাকে নিয়ে যে ও শুধু সুখী হতে পারে নি তাই নয়, চাঁপাই ওর সবচেয়ে বড় দুঃখের মূল। তবু চাঁপার কাছে ওর দেনা কম নয়। চাঁপার জন্যই আজও ও প্রাণে বেঁচে আছে একথাটাও ত ঠিক!

ওর কাছে সে কীই-বা পেয়েছে?

তার যা শিক্ষাদীক্ষা, সে দিক দিয়ে বিচার করলে চাঁপা এমন কিছু খারাপ ব্যবহার করে নি। কিন্তু তার বদলে স্বামীর কাছ থেকে যেটুকু পাওয়া উচিত ছিল সেটুকু সে পায় নি। কানু কোনদিনই মন থেকে ওকে ভালবাসে নি। নিজে থেকে কোন মিষ্ট ব্যবহার করে নি। মাত্র দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়েছে, সেবা নিয়েছে, শাসন করেছে, বকেছে—এমন কি ওর কথা কোনদিন ভাবে নি পর্যন্ত। যেটুকু ভেবেছে সেটুকু শুধু বিদ্বেষ আর ঘৃণায় আচ্ছন্ন। কোনদিন কোন অবসর-মুহূর্তে সে ওকে বোধহয় কামনাও করে নি। ওর চোখ ছিল বরাবরই উঁচুদিকে। পাশের চাঁপাকে তাই সে দেখতে পায় নি। সেই শাস্তিই বোধহয় ভগবান দিলেন। যে যেমন, তার তেমনি থাকাই উচিত। আত্মজনকে চিনতে না শিখলে মানুষের বোধকরি এমনি দুর্দশাই হয়!

আর চাঁপা!

সে কিছুই পায় নি কানুর কাছ থেকে। কোন কৃতজ্ঞতাই তার থাকবার

কথা নয়। ভালবাসা ত দূরে থাক, একটা মিষ্ট কথার স্মৃতিও তার নেই, যেটাকে অবলম্বন ক'রে সে এই পঙ্গু, অক্ষম স্বামীকে চিরজীবন বহন করবে! অথচ সে তাই করছে, স্বেচ্ছায়। সে ইচ্ছে করলেই চলে যেতে পারত। কানু যখন চিরজীবনের মত পঙ্গু হয়ে এসে পড়ল, সঙ্গে আনতে পারলে না একটি পয়সা, তখন ত অনায়াসেই সে ওকে ত্যাগ করে অন্য পুরুষকে ধরতে পারত। তাকে এখান থেকে চলে যেতেও হ'ত না—অন্য পাড়াতেই বাস করতে পারত, স্বচ্ছন্দে। তার জন্য তাকে কেউ বিশেষ দোষও দিত না। তাদের সমাজে ত নয়ই, কারণ এমন প্রায়ই হচ্ছে। এতে ওরা অভ্যস্ত।

কী লোভ ছিল তার, কী এমন আশা? এখনই বা কি থাকতে পারে? কিছুই না।

সে বকে, রাগ করে, কুবাক্য বলে। যতটা যত্ন করা যেতে পারত, মানে যতটায় কানুর স্বার্থপর মন খুশী হ'তে পারত, হয়ত ততটা সে করে না। কিন্তু সে খেতে দেয়, সে পরতে দেয়। সে ওকে স্নান করিয়ে দেয়, প্রত্যহ তার ময়লা পরিষ্কার করে। সামান্যতম দৈহিক প্রয়োজনেও ত ওর আজ উঠে বাইরে যাওয়ার উপায় নেই!

তবে? কি সাহসে, কি স্পর্ধায় সে চাঁপাকে ছোট ক'রে দেখবে?

আজ চাঁপা যা করছে, আবারও কানু মনে করে, মনকে বাধ্য করে স্বীকার করতে—সে-ও ত ওরই জন্য। চাঁপা একা হ'লে তার বাসনমাজা জলতোলা চাকরি থেকেই, বেশ ভাল ভাবে না হোক, একরকম ক'রে চলে যেতে পারত। কিন্তু এই বাজারে, ঠিকে কাজ ক'রে এত রোজগার হয় না যাতে দুটো জোয়ান লোকের চলে। তবু ভাগ্যে ওদের ছেলেমেয়ে নেই।

হয়ত হ'লে ভাল হত—চাঁপার মেজাজটা একটু নরম থাকত। কিন্তু সে আরও বোঝা হয়ে উঠত, আরও কষ্টকর হ'ত তার দিন চালানো। তার চেয়ে এই ভাল।

ঘড়ি বাজছে না?

হ্যাঁ, ঐ ত দূরের বড় কারখানাটার ঘড়ি বাজছে। কে জানে ক'টা বাজল, এতক্ষণ অত লক্ষ্য করে নি। সে কান পেতে থাকে। একটু পরেই কলেজের ঘড়ি বাজবে। ঐ-ত—

বারোটা বেজে গেল! বারোটা?

চাঁপা ত এখনও এল না! এত রাত ত হয় না তার? তবে? কোন বিপদ-আপদ হ'ল না ত? যুদ্ধ থেমে গেছে কিন্তু গুণ্ডাদের উৎপাত কমে নি।

না কি, না কি—তার ব্যবহারের জ্বালায় চাঁপা এতদিন পরে সত্যি-সত্যিই তাকে ত্যাগ ক'রে গেল? অবিশ্যি গেলেও তাকে দোষ দেবার কিছু নেই কিন্তু—

অজানা একটা আশঙ্কায় ওর মন যেন নিমেষে অবশ, বিহ্বল হয়ে যায়। একেই বোধহয় প্রাণের মায়া বলে। নিজের প্রাণেরই ভয় ওর। কে ওকে দেখবে তাহলে?

কানু দেখতে দেখতে ঘেমে উঠল। হায় রে!

এতটা অসহায়, এতটা পরনির্ভরশীল যে, তার আর শোভা পায় না সেই 'পরে'র বিচার করা। দয়া দয়াই, যে দয়া করেছে তার বিচার করা সাজে না ওর। ভিক্ষার চাল কাঁড়া আর আ-কাঁড়া!

যতদূর সম্ভব স্থির হয়ে কানু শুনতে চেষ্টা করে রাস্তার শব্দ। পল্লী একেবারেই নির্জন হয়ে গেছে। কারুরই কোন সাড়া-শব্দ নেই। ব্যাঙ ডাকছে—ওর ঘরেরই মধ্যে। কী একটা সর-সর করে চলে গেল বিছানার পাশ দিয়ে—খুব ক্ষীণ শব্দ, টিকটিকি নয়, হয় ত বিছেই। কে জানে! রাস্তার কুকুরগুলো কি যেন কাড়াকাড়ি করছে, সে ছাড়া আর কোন শব্দ কানে যায় না।

কি নিস্তব্ধ রাত! ভাবে কানু। ওর ঘরের পাশেই বস্তি শুরু হয়েছে। তবু একটু দূর আছে বৈ কি। কিন্তু নিবারণের নাক-ডাকা এখান থেকেই ও স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছে।

অনেকক্ষণ খাড়া হয়ে বসে আছে, আর থাকা সম্ভব নয়। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ে!

ইস্—কি এটা পিঠের নিচে এমন ক'রে পড়ে? সেই সাঁড়াশিটা।

সাঁড়াশিটা হাতে ক'রে তুলে নিয়ে অন্ধকারেই দেখবার চেষ্টা করে। যুদ্ধ থেমেছে, তবু রাস্তার আলোর মুখোশ খোলা হয়নি সব। ক্ষীণ আলোর আবছা আভাস, আর যেটুকু নক্ষত্রের আলো পাওয়া যায়, তাতে ভালো ক'রে কোনকিছুই দেখা সম্ভব নয়। কিন্তু সে প্রয়োজনও ওর নেই। সাঁড়াশিটার প্রতিটি অণু বোধহয় ওর পরিচিত। একটা অনুভূতিই যথেষ্ট।

এ সাঁড়াশিটা ওরা কেড়ে নেয় নি।

আশ্চর্য!

ওটা নাকি তার মুষ্টি থেকে শিথিল করা যায় নি। সেই জন্যই সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতাল পর্যন্ত গিয়েছিল। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় ডাক্তার বাবুরা দিয়ে দিয়েছেন। না দিলে সে কি করত? কী নিয়ে দিন কাটাত? এ যে ওর প্রতি দিন এবং রাত্রির সঙ্গী! আঃ!...সে হাত বুলোয় সাঁড়াশিটায়—সযত্নে এবং সস্নেহে।

একটা বাজল—পর পর তিনটে ঘড়িতেই।

চাঁপা এখনও এল না! ওর স্ত্রী চাঁপা। ওর অবলম্বন। যদি না আসে ত এমনি অসহায় ভাবেই পড়ে থাকতে হবে ওকে—নোংরা ময়লা মেঝে, অনাহারে। পরে আর ক-দিন করবে?

চাঁপার যে কত দাম তা এর আগে বোধ হয় কোনদিনই এমন ক'রে বোঝে নি কানু।

সে লক্ষ্মী বৌ নয়, সে গুছিয়ে ঘর-কন্না করতে পারে না, সে অপরিষ্কার—তবু তার হৃদয় আছে, আর সে হৃদয়ে হয়ত ওর জন্য ভালবাসাও আছে। নইলে এতটা করতে পারত না। বাবুদের ঘরে, ভদ্রলোকের ঘরেই বা ক-টা ললিতাবৌদি আছে? সেখানেও ত চাঁপার দলই বেশি। তবে ওর কি এমন স্পর্ধা যে চাঁপাকে অবহেলা করে? ঠিক ওর মত ক'রে সব জিনিসের অর্থ হয়ত বুঝতে পারে না, ওর চোখের মধ্য দিয়ে হয়ত দুনিয়াকে দেখে না—কিন্তু সে ত সম্ভবও নয়। যে যার চোখ দিয়ে দেখবে, নিজের মত ক'রে—এইটেই ত স্বাভাবিক।

অকস্মাৎ কানুর মনে হল, এই সাঁড়াশিটাই আজও তাকে চাঁপার দিকে চোখ ফেরাতে দেয় নি, চাঁপার দাম বুঝতে দেয় নি। প্রতি দিনরাত্রি সে সাঁড়াশিটা অনুভব করেছে আর তার অতীত জীবনের কথা ভেবেছে, যে জীবনে শুধু ললিতাবৌদি নেই—বনলতা আছে, অমলা আছে,—পুঁটি আছে। আহা পুঁটি গতমাসেও কাকে দিয়ে এক জোড়া শাড়ী পাঠিয়ে দিয়েছে, সেই কাপড়ই পরছে চাঁপা। পুঁটি সুবিধা পেলেই কিছু না কিছু পাঠায়। আর ভাই-ফোঁটার দিন কখনও ভুল হয় না ওর। কাপড় আর মিষ্টি নিয়ে সে আসবেই। কিন্তু তারও নাকি অবস্থা খারাপ, আয় কমে গেছে একেবারে। যুদ্ধের দরুণ বাড়তি আয়টা কমেছে অথচ ব্যয় ত কমে নি।

কিন্তু কী দরকার সে সব কথা ভেবে? এ জীবনে তার আর তাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক থাকবে না। থাকা সম্ভব নয়। তারা ওর জীবন থেকে, ওর আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে একেবারে বেরিয়ে গেছে। ওর এখন আছে শুধু

চাপা। ওকে ভাত-জল দিতে, ওকে নাওয়াতে ধোওয়াতে, রোজগার ক'রে এনে খাওয়াতে।

ও হয়ত এতদিনে চাঁপার দাম বুঝত, তার কাছে কৃতজ্ঞ থাকত, যদি না এই সাঁড়াশিটা প্রতিনিয়ত তাকে ললিতাবৌদির কথা মনে করিয়ে দিত। ললিতাবৌদির মত স্ত্রী সবাই পায় না, তার জন্ম দুঃখ ক'রে কি হবে? মিছিমিছি হাতের মধ্যে যে আছে তাকে অবহেলা করেছে দূরের দিকে চেয়ে চেয়ে। ন'দা ওকে একটা গল্প বলেছিল মনে আছে, কে একজন আকাশের দিকে চেয়ে রাস্তা চলতে চলতে খানায় পড়ে গিয়েছিল বলে এক পণ্ডিত তাকে উপদেশ দিয়েছিলেন—রাস্তা চলবে যখন তখন রাস্তার দিকে চেয়ো, সে সময় আকাশের দিকে দৃষ্টি কেন?

সত্যিই, মাটিতে ``` থাকতে হবে, মাটি নিয়েই যখন কারবার—তখন সেদিকে চাওয়াই ভাল, সূর্যের দিকে চেয়ে চোখ ক্ষরিয়ে লাভ কি?

কে?

কানুর উৎকর্ণ মন আরও সজাগ হয়ে ওঠে। কার পায়ের শব্দ না?

হে মা কালী, হে ঠাকুর, চাপাকে আনিয়ে দাও। কানুর আর কেউ নেই, কোন আশ্রয় নেই!

হ্যাঁ, পায়ের শব্দ ক্রমে কাছেই আসছে।

খোলা দোরের মধ্যে থেকে বাইরের যে আলো চোখে পড়ে ক্রমে তারই সামনে এসে দাঁড়ায় চাঁপা। চৌকাঠের ফ্রেমে আঁটা ছায়ামূর্তির মত।

'কে গো, তুমি?' কানু বলে ওঠে। অনেকদিন পরে ওর কণ্ঠস্বরে একটা আবেগ-মাখানো উদ্বেগ প্রকাশ পায়!

সংক্ষেপে 'হ্যাঁ' বলে উত্তর দিয়ে চাঁপা ভেতর আসে। কী যেন একটা কোথায় রাখে। তারপর 'লম্প'টা জ্বেলে ওর দিকে পিছন ফিরে তার একমাত্র ভাল শাড়ীখানা ছাড়ে।

ওর দিকে চেয়ে চেয়ে নতুন ক'রে যেন আজ একটা ভালবাসা বোধ করে কানু। সে ভালবাসায় ওর বুক ভরে যায়।

সে আস্তে আস্তে বললে, 'আজ বড্ড রাত করেছ চাঁপা! একটা বেজে গেছে—'

অকস্মাৎ ওর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে, যেন একটা হিংস্র দৃষ্টিতে চেয়ে চাঁপা

বললে, 'হ্যাঁ, গেছে। তা' কি হবে, কি করতে হবে? ধরে ফাঁসি দেবে?...সে ক্ষ্যামতিও যদি তবু থাকত!'

কিন্তু আজ আর রাগে না কানু। এমন কি ওর ঘৃণা-বোধও হয় না। বিদ্বেষ ত নয়ই। সে একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'এত রাত পর্যন্ত কি তিনি জেগে থাকেন?...তা হ'লেও—রাত বিরেতে, একা এতটা আসা, নির্জন পথ—'

এইবার চাঁপা আর চুপ ক'রে থাকতে পারে না! তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে, 'রাতবিরেতে বেরোতে তো হবেই—ভয় করলে চলবে কেন শুনি?'

ওর ঠোঁটের কোণে একটা ব্যঙ্গের ভাব থাকলেও কানু লক্ষ্য করে 'লম্প'র ক্ষীণ আলোতেও—দুটো চোখের পাতা চক্চক্ করছে। আজ ওর মন যে-বিশেষ সুরে বাঁধা ছিল তাতে এই চোখের জলের দৃশ্যটা এমন একটা আঘাত করল যে, গভীর মমতা ও সমবেদনায় কানুর মন যেন উপ্‌চে উঠল।

সে আস্তে আস্তে ডাকলে, 'চাঁপা।'

চাঁপা কিন্তু সে ডাক ওর শুনতে পেলে না। আপন মনেই সে বকে চলেছে, হয়ত ওকে শোনাবার জন্য নয়, প্রতিবেশী বা কোন বিশেষ নিন্দুককে উপলক্ষ ক'রেও নয়— এ যেন অদৃশ্য ওর অদৃষ্ট-দেবতাকে শোনাবার জন্যেই—'কে কী বলবে? বয়ে গেল! বয়েই গেল আমার! আমি গেরাহ্যি করি না কারুর কথা!...লোকের কথা? পোড়া কপাল!'

আর একটু থেমে, আরও চাপা, আরও হিংস্র কণ্ঠে বলে, 'কী করতেই বা ঘরে আসা সকাল সকাল? এই তো দারিদ্দিরের দশা! বলতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়... যতক্ষণ বাইরে থাকি, ততক্ষণই ভাল থাকি। আমি ত মন্দ —কিন্তু তাল সাম্‌লাতে সেই ত আমি! আর কেউ আস্‌বে এমনি ক'রে জ্বলে পুড়ে—!' কথাটা আর শেষ করতে পাবে না।

খাপ্‌ছাড়া খাপ্‌ছাড়া কথা। তীব্র বিষে ভর্তি। অন্য সময় হ'লে কানু, আর কিছু না হোক্—অন্ততঃ একটা বিদ্বেষ, নিজের অসহায় অবস্থার জন্য একটা ক্ষোভ অনুভব করত। কিন্তু আজ ও নিঃসংশয়ে বুঝতে পারলে যে এই অর্থহীন অকারণ প্রলাপের পিছনে কী সুগভীর বেদনা বহন করছে চাঁপা! এমন এর আগেও বুঝেছে এক একদিন, প্রতিজ্ঞা করেছে যে চাঁপাকে আর কোনদিন কিছু বলবে না কিন্তু চাঁপার সামনে ওর সে ভাল ভাল প্রতিজ্ঞা একদিনও থাকে নি। আজই প্রথম চাঁপার এই উগ্র ব্যবহারও তাকে ওর সম্বন্ধে বিদ্বিষ্ট ক'রে তুলতে পারলে না। আর সেইজন্যই আজ ও অনুভব করলে যে একটা বিশেষ কারণে ঘটেছে আজ চাঁপার এই চিত্ত-বিক্ষোভের।

সে নিস্তব্ধ হয়ে ওর দিকে চেয়ে শুয়ে রইল। চাঁপা কাপড় ছেড়ে খানিকটা যেন অকারণে এদিক ওদিক ক'রে বেড়াল, যেন কী সব জরুরী কাজ ওর বাকি আছে, যেন প্রবল অনিচ্ছাতেও ওকে এখনই সব করতে হচ্ছে। দুম্ দুম্ ক'রে এগিয়ে যাচ্ছে, একটা বাসন নেড়ে রাখছে, আবার ওদিকে গিয়ে টান মেরে পাশের আলনাটা থেকে একটা গামছা টেনে মাটিতে ফেল্‌ছে। মিনিট দুই-তিন এই রকম করবার পর উনুনের ধার থেকে একটা কি কাগজের মোড়ক তুলে এনে ধপাস্ ক'রে কানুর সামনে নামিয়ে রাখলে, তারপর এক ঘটি জল গড়িয়ে এনে দিয়ে বললে, 'নাও, ওঠো—দয়া ক'রে গিলে আমায় উদ্ধার করো।'

এতক্ষণে কানু বুঝতে পারল, এইটেই ও কাপড়ের মধ্যে ক'রে নিয়ে এসেছিল। সে কৌতূহলী হয়ে মোড়কটা খুলে দেখল তার মধ্যে খান-পাঁচেক রুটি আর খানিকটা কি তরকারী। এ ওর আশাতীত। রাত্রে ওদের খাওয়ার পাট উঠে গেছে বহুকাল। কোনদিন হাঁড়িতে এক-আধগাল পান্তা থাকলে কিংবা বাসি রুটি থাকলে অর্থাৎ রেশন-মত চাল বা আটা—যেবার যেটা বেশী পাওয়া যায়, সকালে তাই খেয়ে পড়ে থাকে। তারপর চাঁপা সব বাড়ীর কাজ সেরে এসে ওর'কম্মা' ক'রে রাঁধতে বসে যখন তখন বেলা গড়িয়ে আসে। দুপুরের খাওয়াটা খেতে খেতেই তিনটে বাজে। আর রাত্রে কিছু খায় না। শুয়ে থেকে থেকে ক্ষিদেও তেমন হয় না, তাছাড়া কুলোয় না। চাঁপা রাত্রে যেদিন বাইরে যায় সেদিন যে সে নিজে কিছু খেয়ে আসে তা কানু টের পায় কিন্তু তার জন্য কোন অনুযোগ নেই ওর।

তবে আজ ওর সত্যিই ক্ষিদে পেয়েছিল, বোধ হয় এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকার জন্যই। ও একটু ইতস্তত ক'রে বললে, 'তুমি খাবে না?'

'না। আমি খেয়ে এসেছি।'

ওধারে গিয়ে নিবোনো নোংরা উনুনটার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল চাঁপা।

খাওয়া শেষ ক'রে আবারও কানু ডাকলে স্নিগ্ধ কণ্ঠে, 'হ্যাগো, শুন্‌ছ?'

'কী'

'আমার কাছে এসে একটু ব'স না।'

চাঁপারও যেন এতক্ষণে চমক লাগে ওর এই কণ্ঠস্বরে। সে একবার অবাক হয়ে ফিরে তাকায় ওর দিকে। তারপর দরজার আগড়টা টেনে দিয়ে ফু দিয়ে আলোটা নিবিয়ে ওর বিছানায় এসে বসে।

অন্ধকারে হতেড়ে হাতড়ে কানু চাঁপার গায়ে একটা হাত দেয়। অন্ধকারেই বুঝতে পারে চাঁপা শিউরে ওঠে সে স্পর্শে।

চাঁপা!

'কী?' চাঁপার গলা আশ্চর্য রকম শান্ত ও নরম।

'আমাকে তুমি মাপ করো।'

'আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে!' চাঁপা স্বাভাবিক অবস্থা যেন ফিরে পায়, 'অত আদিখ্যেতায় আর দরকার নেই। তোমার মত অত ভাল ভাল কথা আমি বলতেও পারি না, শুনতেও পারি না।'

কানু তবু ওকে কাছে টানে। খুব মৃদুস্বরে বলে, 'আমার কাছে আজ একটু শোও না, লক্ষীটি!'

চাঁপা তক্তপোশের ওপর একাই শোয় আজকাল। কানুর দৈহিক অসুবিধার জন্য তাকে আর ওঠানো নামানো চলে না রোজ রোজ। এটা কানুরই ব্যবস্থা—ওকে আলাদা শোওয়ানো।

সেজন্য চাঁপা বোধ হয় একটু বিস্মিতই হ'ল কিন্তু মুখে কিছু বললে না। বরং নিঃশব্দে গিয়ে নিজের বালিশটা টেনে এনে সত্যিই ওর পাশে শুলো।

সেই আগের দিনের মত পাশাপাশি শোওয়া, ঘনিষ্ট হয়ে। কিন্তু দুজনেই স্তব্ধ, চুপচাপ। বলবার যেন কিছু নেই সেদিনের মত—কেমন করে যেন ওরা পরস্পরের অপরিচিত হয়ে উঠেছে।

একটুখানি চুপ করে থেকে কানু বললে, 'তুমি একটা কাজ করবে?

'কী?' প্রশ্ন করলে চাঁপা।

তবুও যেন কথাটা বলতে পারে না কানু। কোথায় যেন বাধে। কী একটা সুগভীর লজ্জা বোধ করে। অনেকক্ষণ পরে বলে, 'ঐ—ঐ সাঁড়াশিটা কাল নিয়ে গিয়ে বেনে-পুকুরের জলে ফেলে দিতে পারবে? খুব গভীর জলে? যাকে পাঁকে পুঁতে যায়?'

সাঁড়াশিটা? মানে, ঐ সব্বনেশে অপয়া সাঁড়াশিটা?' বিস্ময়ে উঠে বসে চাঁপা।

'হ্যাঁ', মৃদুকণ্ঠে, কান্নার মত করুণ-কণ্ঠে বললে কানু, 'হ্যাঁ! ওটা সত্যিই অপয়া, সেই জন্তেই ওটা ফেলে দিতে চাই।'

চাঁপার মুখ দেখা গেল না অন্ধকারে। সে যে হাত তুলে একটা নমস্কার করল মা রক্ষাকালীকে, তাও কানু দেখতে পেলে না। খানিকটা পরে সে

আবার শুয়ে পড়ে বললে, 'তা বেশ ত, দিও। সুমতি হয়েছে এতদিন পরে? তা ফেলে দেব কেন, কাউকে বিক্রী করে দেব। নোয়ার জিনিসের যা দাম হয়েছে—নিদেন চারগণ্ডা পয়সা ত পাবো। অমন ভারী জিনিসটা—'

কে যেন এক ঘা চাবুক মারল কানুকে। অব্যক্ত যাতনায় ছটফট ক'রে উঠে বলল, 'না না বিক্রী নয়, বিক্রী নয়। তোমার পায়ে পড়ি চাঁপা—বিক্রী ক'রো না কাউকে। অম্নি ফেলে দিও।'

'কেন, কি হয়েছে তাতে? তোমার বাপু সব তাইতে আদিখ্যেতা। অমন ভারীভুরি জিনিস, নোয়ার দামে বিক্রী করলেও কত হয়।'

'তা হোক। ও অপয়া জিনিস যার বাড়ীতে যাবে তার আবার সর্বনাশ করবে ত! তুমি জলে দিও, সত্যি। দেবে ত?'

'জানি নে বাপু! সর্বনাশ কি হবে তাতে আমার কি?'

'তোমার পায়ে পড়ি চাঁপা, এই কথাটা শোন আমার?'

সে সত্যিই চাঁপার পায়ের দিকে হাত বাড়ায়।

সজোরে ওর হাতখানা ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চাঁপা বললে, 'পাগল হয়ে গেলে নাকি! সে মাগী তোমাকে কি ওষুদবিষুদ খাইয়ে মাথাটা একেবারে খারাপ ক'রে দিয়েছে। তুমি আমার পায়ে হাত দিতে যাও কি ব'লে? ঘেন্না পিত্তি একেবারে নেই?'

'কিন্তু তুমি বলো আমার কথা শুনবে?'

'শুনব, শুনব।'

তারপর হঠাৎ কি মনে ক'রে উঠে বসে বললে, 'কৈ দেখি সাঁড়াশিটা!'

চমকে উঠে কানু বললে, 'কেন?'

'কে জানে! সুমতি যখন হয়েছে, দাও ওকে এই রাত্তিরেই পাচার করি।'

'এখনই!'

বিহ্বল হয়ে প্রশ্ন করে কানু। ঝোঁকের মাথায় প্রস্তাবটা করেছিল কিন্তু ব্যাপারটা যে এত দ্রুত ঘটবে তা মনে করে নি, তার জন্য প্রস্তুতও ছিল না। অথচ কি-ই বা বলবে ভেবে পায় না। শুধু অসহায় ভাবে প্রশ্ন করে আর একবার, 'এখনই?'

এতদিনের সঙ্গী ওটা।

এত দীর্ঘদিনের দুঃখ জড়ানো আছে ওর সঙ্গে। এত মধুর, এত বিষাক্ত স্মৃতি সব। এত হতাশা।

বুকটা যেন কে গুঁড়িয়ে মাড়িয়ে দিয়ে যায় ওর।

অন্ধকারে হাত দিয়ে দিয়ে অনুভব ক'রে চাঁপা সাঁড়াশিটা টেনে নিলে, তারপর ক্রুদ্ধ উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ফিরে এল অবশ্য একটুখানি পরেই। অর্থাৎ এই বাইরেই কোথাও সেটা লুকিয়ে রেখে এল। হয়ত বেচেই দেবে সত্যিসত্যি।

যাক্‌গে—

তবু কানু আজ নিশ্চিন্ত। সমস্ত অতীত জীবনকে আজ ও ত্যাগ করলে চিরদিনের মত। ভালই হ'ল। দুই চোখ মুছে নেয় হাতের উল্‌টো পিঠে। যে ছেঁড়া কাপড় সে জড়িয়ে আছে তার খুঁট চোখ অবধি ওঠে না।

চাঁপাও আবার এসে শুয়ে পড়েছিল। বোধহয় তারও মনে মনে একটা প্রবল আলোড়ন চলছিল। একটা বিপুল উত্তেজনা।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে কানু ডাকলে, চাঁপা ঘুমুলে?'

তন্দ্রাজড়িত কণ্ঠে চাঁপা বললে, 'কেন? মালসা দেব?

'না। একটা কথা বলছিলুম।'

ঘুম সত্যিই পেয়েছিল চাঁপার। সারাদিনের পরিশ্রম আর এই দীর্ঘ-রাত জাগা।

'কী বলো।' তেম্‌নি ভাবেই বললে।

একটু ইতস্তত ক'রে কানু বললে, 'আমি বিড়ি পাকাতে জানি, সরঞ্জামও সব আছে। তুমি শিখবে? রাত্রে বসে যদি তৈরী করো, তাহলে—তাহলে আর বোধহয় তোমাকে ওর কাছে, মানে ওর কাজ করতে যেতে হয় না।'

'পোড়া কপাল আমার!' ঝঙ্কার দিয়ে উঠল চাঁপা, 'আমি সমস্ত রাত ধরে বসে বসে বিড়ি পাকাই এখন—খেটেখুটে এসে। তোমার একটু ঘেন্না হ'ল না কথাটা বলতে?'

সে সশব্দে, যেন প্রতিবাদ জানাবার জন্যেই পাশ ফিরে শুলো।

সুরটা আবার কেটে গেল। একটা রূঢ় আঘাতে কানুর মনটা কোন একটা স্বপ্ন থেকে জেগে উঠল যেন।

তফাৎটা চাঁপা বুঝতে পারলে না। কোনদিনই পারবে না। বৃথা বলা ওকে।

উগ্র একটা বিদ্বেষ অনুভব করে—যে লোকটা পাশে শুয়ে আছে তার সম্বন্ধে। বিদ্বেষ আর ঘৃণা।

কিন্তু না। আর না। মনকে শান্ত করতে হবে। চাঁপাই ভাল। চাঁপাকে হারালে ওর চলবে না।

অভ্যস্ত. হাত হাত্‌ড়ে হাত্‌ড়ে সাঁড়াশিটা খোঁজে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ে যায়, ওঃহো—সেটা যে আর নেই। আর থাকবে না কোনদিনই, ও পাট চুকে গেছে। চাঁপা হয়ত বিক্রীই করবে শেষ পর্যন্ত। কে সেটা ব্যবহার করবে কে জানে, কী ভাবে করবে।·· যেটা সে তৈরি করেছিল কেবলমাত্র ললিতাবৌদির জন্য।

থাক্‌ ললিতাবৌদির কথা।

আর একবার মিনতি করবে চাঁপার কাছে? জলে দেবার জন্য?

মৃদু কণ্ঠে ডাকলে, 'চাঁপা, শুন্‌ছ?'

সাড়া এল না। চাঁপা ঘুমিয়েছে। একটু পরেই নাক ডাকবে। আজকাল চাঁপার একটু নাক ডাকে।

কানুর কিন্তু ঘুম এল না কিছুতেই। ঘরের মধ্যে চাপা ভ্যাপ্‌সা গন্ধ, যেন নিঃশ্বাস রোধ হয়ে আসে। বাইরে অবিশ্রান্ত ব্যাঙের ডাক।

জীবনে আর কোন আশা বা অবলম্বন রইল না ওর। না থাক—তার জন্য সে ভাবে না। আর ভাববে না। ভাববার রইলই বা কি? জীবন বলতে যা ছিল—তার সঙ্গে শেষ সম্পর্কটুকুও ত চুকে গেল।

হাত দিয়ে চাঁপাকে ছুঁয়ে দেখে। ঘুমিয়ে পড়েছে বেচারী।

কত রাত হ'ল কে জানে! এখনও ঘুম এল না। থাক্‌গে—একটা রাত না ঘুমোলে কীই বা এসে যাবে! না হয় কাল দুপুরে পড়ে পড়ে ঘুমোবে। ওর কাছে এখন দিন আর রাত্রিতে তফাৎ কি?

কান পেতে শুনলে কলেজের ঘড়িতে তিনটে বাজ্‌ছে।

শেষ